শিব মহিমা

বাংলাবুক.অর্গ

পূর্বা সেনগুপ্ত

শিব মহিমা

পূর্বা সেনগুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রাচী পাবলিকেশন

প্রকাশক ঃ
জয়দীপ রায়চৌধুরী
প্রাচী পাবলিকেশনস্
বাক্সাড়া, হাওড়া-৭১১১১০
দূরভাষ ঃ ২৬৫৮-০০৮৪

প্রথম প্রকাশ ঃ
কলিকাতা পুস্তক মেলা ২০০৫

অক্ষর বিন্যাস ঃ
শৈব্যা বুকস্ লেজার
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মূল্য ঃ ৭০ টাকা

মুদ্রক ঃ
মহালক্ষ্মী অফসেট
১৩/১, শ্রীমানীপাড়া লেন,
কলকাতা-৩৬।

ভূ মি কা

'পশুর' পতি যিনি তিনিই 'পশুপতি'। পৌরাণিক সাহিত্য অনুযায়ী সমস্ত প্রাণীই পশু নামে চিহ্নিত। তাই দেবাদিদেব মহাদেব হলেন সমস্ত জীবের পতি। তাদের নিয়ামক। ভারতীয় ধর্ম সাহিত্যের আঙিনায় শিব এক বিচিত্র দেবচরিত্র। ব্রতের আঙিনা থেকে তন্ত্র সাহিত্য হয়ে অদ্বৈত বেদান্ত পর্যন্ত—সর্বত্রই এই দেবচরিত্রের অনায়াস অবাধ গতি। কেবল তাই নয় শিব হলেন সন্ন্যাসী সমাজের গুরু; সন্ন্যাসীদের আরাধ্য দেবতা। ত্যাগের পরাকাষ্ঠা তাঁর মধ্যে দিয়েই পরিস্ফুট। এদিক দিয়ে দেখলে শিব প্রতিটি আশ্রমের মানুষেরই আরাধ্য দেবতা। সামান্য গৃহী, জাগতিক কামনায় অস্থির। সেও শিব কৃপার কাছে নত। আবার বেদান্তের চরম অনুভূতির আলোকে উজ্জ্বল সন্ন্যাসীর মুখেও শুনি 'শিবোহম্' 'শিবোহম্' ধ্বনি। সাধক তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি কল্পে জপ করে চলেছেন 'শিবগুরু' 'শিবগুরু'।

শিবভাবনার মধ্যে এক মহাসাম্যভাবের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। তাই আর্য এবং অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয় আমরা এই দেবতার মধ্যে দেখতে পাই। ভাবনার ধারায় দেব ও দেবারি দুই পক্ষই সমান গুরুত্বলাভ করে। সংসারের তুচ্ছ মান সম্মানের দ্বন্দ্ব এই দেবতার মধ্যে অনুপস্থিত। তাই অনায়াসে দেবতাদের অনুরোধে তুলে নেন গরল, মহাদেব হন নীলকণ্ঠ। সব মিলিয়ে এই দেবভাবনার কোনো তুলনা নেই। তাই এই গ্রন্থের বিষয়রূপে শিবভাবনা কে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছিল বর্তমান দৈনিক পত্রিকার, উত্তরবঙ্গ সংস্করণের জন্য ধরাবাহিক রচনার মধ্য দিয়ে। যদিও আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা ছিল মহাদেবেরে 'দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গ' খ্যাত তীর্থগুলি তুলে ধরা। কিন্তু শিবভাবনায় স্নাত হয়ে আমাদের এই সীমাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। তাই 'শিব মহিমা খ্যাপনই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থ রচনায় প্রথমেই আমি প্রণাম জানাই আমার বাবা স্বর্গীয় প্রশান্ত কান্তি সেনগুপ্তকে। এই গ্রন্থ রচনার সময়ই তিনি আমাদের ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে গিয়েছেন। তাঁর আশীর্বাদ প্রথমেই ভিক্ষা করি। প্রণাম জানাই আমার মা মিনতি সেনগুপ্তকে। বর্তমান পত্রিকার শ্রীমতি কাকলি চক্রবর্তী ও সাহানা নাগ চৌধুরীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের নানা পরামর্শ আমাকে প্রেরণা দান করেছে। ধন্যবাদ জানাই আমার ভাই প্রীতম সেনগুপ্ত এবং প্রিয়ম সেনগুপ্তকে ও একান্ত প্রিয়জন গৌরী দি (ধর) কে।

গ্রন্থ রচনার সময় 'রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট্ অব কালচারের' লাইব্রেরী ও গবেষণা বিভাগের লাইব্রেরী থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। এছাড়াও 'ন্যাশানাল লাইব্রেরী' থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি। সবশেষে অশেষ ধন্যবাদ জানাই প্রাচী প্রকাশনী-র জয়দীপ রায় চৌধুরীকে। তাঁর প্রচেষ্টা ছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশ অসম্ভব ছিল। ভারতের জাতীয় দেবতা শিবের মহিমা গাথায় প্রণত হই শিবভক্তদের চরণে। এই গ্রন্থের মূল্যায়ন তাদের হাতে।

ইতি বিনীত
পূর্বা সেনগুপ্ত।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উৎসর্গ

পিতা প্রশান্তকান্তি সেনগুপ্ত-র চরণে

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অনাদি কাল থেকে শিব আমাদের আরাধ্য দেবতা। অল্পে তুষ্ট তিনি, তাই তিনি আশুতোষ।

পৌরাণিক সাহিত্যে, মহাকাব্যে মহাদেবকে নিয়ে যে সব কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে, সেইগুলিতে এমন এক দেবতার রূপকল্পনা ভেসে ওঠে, যে দেবতা সকলের আরাধ্য। দেবগণের আরাধ্য, দৈত্যগণের আরাধ্য। দেবগণ বিপদে পড়লে দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হন। আবার অসুরদেরও মনস্কামনা বা তপস্যার লক্ষ্য হলেন দেবাদিদেব।

সমাজে যে অপাংক্তেয়, যাকে সকলে অনাদর করে, তাকেই অঙ্গভূষণ করেছেন এই দেবতা। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, মাথায় জটাভারে শোভিত চন্দ্রকলা, গলায় জড়ানো সকলের ভীতি উৎপাদনকারী সর্পরাজ, তিনি বিভূতি ভূষিতাঙ্গ। তপস্যা অর্থাৎ তাপসহা। কিসের তাপ? জীবনের ক্লেদ কালিমার তাপ সহ্য করে যে শুদ্ধতার দিকে জীবনকে নিয়ে যায়, সেই ধর্মজীবন যাপন করে। তাই অনাদিকাল থেকে মহাদেবের কাছে ভক্ত প্রার্থনা জানায়, 'হর হর মহাদেব'—হে মহাদেব আমাদের কালিমা হরণ করো। হরণ করো কলুষতা। তোমার শিবসুন্দর সত্তায় বিরাজিত করো আমাদের অন্তর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উদাসী শিবের রূপভাবনাকে তুলে ধরেছেন সুন্দর করে। তিনি সাধক রামদাসের কণ্ঠে শুনিয়েছেন দুটি পদ। সাধক বলেছেন,

"হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।
অন্নপূর্ণা মা আমার, লয়েছে বিশ্বের ভার
সুখে আছে সর্বচরাচর।
মোরে তুমি হে ভিখারী, মার কাছ হতে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর।"

ভিখারী শিবের মধ্যে যে দেবব্যক্তিত্ব ফুটে তা সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ এক ব্যক্তিত্ব। তিনি কারোরই পক্ষপাতী নন। তিনি দেবাদিদেব হয়েও দেবতাদের পক্ষে থাকেন না, অসুররাও তাঁর আশ্রয় পায়। তাই পুরাণের পাতায় পাতায় দেখি দেবসাম্রাজ্য জয়ের জন্য দানবকুল শিব আরাধনায় মগ্ন হয়েছেন এবং মহাতপস্যায় বরলাভ করে স্বর্গজয়ে সাফল্য লাভ করেছেন।

আমাদের অষ্টাদশ পুরাণ এক একজন দেবতার স্তুতি বন্দনায় মুখরিত হয়েছে, বিষ্ণু পুরাণের নায়ক বিষ্ণু। দেবীভাগবতে শক্তির আরাধনা ও মাহাত্ম্যের কথা বিবৃত হয়েছে। শিবমাহাত্মাসূচক পুরাণ ছাড়াও প্রায় প্রতিটি পুরাণেই শিবপ্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। কারণ এই দেবতাটি ভিন্ন আমাদের গতি নেই। তিনি অজ্ঞানের পরম গতি, যাঁকে সকলে ফেলে দেয়, তাঁকে তিনি কোলে টেনে নেন। শ্মশানবাসী, বৈরাগী, ভূতপ্রেত তাঁর অনুচর । ভাঙ আর গাজা খেয়ে তাঁর জীবন কাটে। কিন্তু এই দেবতাই দিতে পারেন জীবনে শান্তির চাবিকাঠি। যা স্থির, যা শুভ্র, যা শান্ত, যা অচঞ্চল সমাহিত তাই শিব। ভারতের উত্তর দিকে যে তুষার ধবল হিমালয় পর্বতমালা রয়েছে, শিবের বাসভূমি রূপে এই পর্বতই প্রাধান্য লাভ করেছে। এছাড়াও পশ্চিম ভারতের নর্মদা নদীর তীরে তীরে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিবলিঙ্গের আরাধনা। দেবী নর্মদা হলেন শিবকন্যা। শঙ্কর সর্বদাই তাঁর কন্যার সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন। এর ফলে নর্মদা একটি শৈবতীর্থরূপে বন্দিত।

নর্মদার তীর ছাড়াও সমগ্র ভারতে অজস্র শিব বন্দনার কেন্দ্র রয়েছে। এঁদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ। একান্নপীঠ যেমন শক্তি সাধনার এক একটি কেন্দ্রভূমি। দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গ ঠিক তেমনি শৈবসাধনার কেন্দ্রভূমি। ভারতবর্ষে ধর্মের স্রোত চিরবহমান। এক একটি ধর্মভাবনা ঢেউ-এর মতো সামাজের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তারপর নতুন এক ধর্মভাবনার স্রোতে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে পুরাতনের দিকে। ইতিহাস আর সমাজভাবনা থেকে ধর্মভাবনা কখনই পৃথক নয়। প্রাচীন ভারতে আর্য অনার্যদের দ্বন্দ্ব, যেখানে বেদের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে একত্বের বাণী। সেই একত্ব কাদের মধ্যে? ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ইত্যাদি দেবকূলের মধ্যে এক চিরন্তন সত্যকে কল্পনাকে করা হয়েছে।

ইন্দ্র, বরুণ, ইত্যাদি দেবতাদের মতোই যুগের সঙ্গে সঙ্গে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবদের মধ্যেও ছিল দ্বন্দ্বের সম্পর্ক। যে রামের আরাধনা করে সে শ্যামের আরাধনায় মগ্ন হতে পারে না। এই ক্ষেত্রেও মহাসাধকেরা একত্বের বাণীই শুনিয়েছেন। বর্তমান সমাজে হিন্দুধর্মের মধ্যে বিভাজনের থেকেও বিভিন্ন ধর্মভাবনার মধ্যে বিভাজন বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। এখন আমরা বিভিন্ন ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলি। কিন্তু এর আগের স্তরে ভারতবর্ষে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবদের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্বের সম্পর্ক ছিল; শৈবতীর্থ, শৈবভাব ও শৈব সাধকেরা জনগণের মধ্যে ধর্মভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই শিব হলেন সকলের দেবতা।

BanglaBook.org

দুই

"শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্ধমৌলে
মহাশোন শূলিন জটাজুটধারিন্।
তমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ।।"
বেদসারশিবস্তোত্রম।

হে উমাপতি, হে শুম্ভ, হে অর্ধচন্দ্রমৌলি, হে মহেশ্বর, হে শূলি, হে জটাজুটধারি; হে পূর্ণস্বরূপ, হে প্রভু, তুমি প্রসন্ন হও।

বেদসারশিবস্তোত্রে বর্ণিত দেবাদিদেব মহাদেবের যে.রূপকল্পনা আমাদের চোখে ফুটে ওঠে তা আমাদের জাতীয় দেবতা শিবের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র। তিনি একাধারে গিরিরাজ কন্যা উমার পতি শূলধারী, মস্তকে অর্ধচন্দ্র শোভিত। এই উদাসীন শিবের রূপই অরূপে মিশে যায় যখন তিনিই হয়ে ওঠেন পূর্ণস্বরূপ, জগদ্ব্যাপী এক মঙ্গলময় সত্তা।

পণ্ডিতদের মতে গিরিরাজ হিমালয়ের শুভ্রতা ও ভারতের বৈরাগ্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক আদর্শের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে শিবচরিত্র। তিনি শ্মশানচারী, অন্ন বস্ত্রের সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন, শান্ত, ধীর, গম্ভীর, সুন্দর। শিব সম্বন্ধে পণ্ডিতদের যাই মত থাকুক না কেন শিবের রুদ্ররূপ ভারতীয় ভাবনায় বহু প্রাচীন।

বৈদিক যুগে রুদ্র একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। যদিও রুদ্র পরবর্তীকালে দেবাদিদেব মহাদেবের রূপ লাভ করে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন, তবুও বৈদিক যুগে এই দেবতার একটি পৃথক অস্তিত্ব ছিল। পুরাণকারগণ মহাদেবের নটরাজ মূর্তির মধ্যে তাঁর ছায়া রেখে গিয়েছেন। রুদ্র হলেন ধ্বংসের দেবতা, ইনি পশুর মতো হিংস্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে রুদ্রের ভীষণতা এমনই যার ফলে তাঁর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা বিপজ্জনক।

উপনিষদ অনুসারে রুদ্র হলেন প্রথম। তাঁর পূর্বে কেউ ছিল না। তিনি পৃথিবী শাসন করেন, তাঁর কথায় ব্রহ্মাণ্ড চালিত হয় আবার প্রলয়ের মাধ্যমে তিনি ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করেন। রুদ্রের আদি মধ্য ও অন্ত নেই। ঋকবেদ অনুসারে রুদ্রের গায়ের রঙ পিঙ্গল, তার হাতে ধরা পিনাক অর্থাৎ ধনুর্বাণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে রুদ্র যুবা, তাঁর মুখকান্তি সুন্দর উজ্জ্বল সূর্যের মতো শোভা তাঁর, তিনি নানা অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে রথে পরিভ্রমণ করেন। ঋক্‌বেদের সূক্তে বলা হয়েছে—দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র ও বভ্রুবর্ণ রুদ্র দীপ্ত হিরন্ময় অলঙ্কারে শোভিত হচ্ছেন। রুদ্র সমস্ত ভুবনের অধিপতি।

BanglaBook.org

—হে স্তোতা! প্রখ্যাত রথস্থিত যুবা, পশুর মতো ভয়ঙ্কর ও শত্রুদের বিনাশকারী উগ্ররুদ্রকে স্তব কর। আমরা স্তব করলে তুমি আমাদের সুখী কর।

—হে রুদ্র তুমি যে হরিদ্বর্ণ হিরন্ময় ময়ূরপুচ্ছ শোভিত ধনুধারণ কর তা শত সহস্র প্রাণীর ধ্বংসকারক। রুদ্রের বাণ সর্বত্র অপ্রতিহত গতিতে বিচরণ করে। সেইহেতু এই দৈবহনন শক্তিসম্পন্ন বাণকে নমস্কার।

—হে সোম ও রুদ্র। তোমাদের দীপ্ত ধনু আছে এবং তীক্ষ্ণ শর আছে। তোমরা সুন্দর মুখ প্রদান করে থাক।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে রুদ্র কেবল ধ্বংসের দেবতা নন, তিনি ঔষধেরও দেবতা। রুদ্র আরোগ্য ও ঔষধ প্রদান করে। আবার আকাশ থেকে নানা রোগাদি সৃষ্টি করে পৃথিবীতে বর্ষণ করে। ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে হে রুদ্র তুমি আমাদের পুত্রগণকে ওষধিদ্বারা পরিতুষ্ট কর। আমি শুনেছি তুমি ভিষকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

—হে রুদ্র তোমার সেই সুখপ্রদ হস্ত কোথায়। যে হস্তে তুমি ভৈষজ প্রস্তুত করে সকলকে সুখী কর।

—হে রুদ্র, তুমি ভেষজ। আমাদের গো, অশ্ব ও পুরুষকে ভেষজ প্রদান কর।

ঋক্‌বেদে রুদ্রের বর্ণনায় তাঁকে অত্যন্ত উগ্র ও বলশালীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। রুদ্রের কণ্ঠ নীল, দেহ রক্তবর্ণের, তিনি এক হাজার তীর বহন করেন। অথর্ব বেদেও আমরা রুদ্রের কথা পাই। এই বেদে রুদ্র পশুদের রক্ষাকর্তা। কিন্তু তাঁর স্বভাব রুক্ষ। ঋক্‌বেদে রুদ্রের দুটি পরস্পর বিরোধী গুণের কথা বলা হয়েছে। রুদ্র মানুষদের হিংসা করেন, বজ্র দিয়ে তিনি মানুষ ও পশু বধ করেন আবার তিনি অল্পেই তুষ্ট হন ও কল্যাণ প্রদান করেন। তাঁর এই কল্যাণপ্রদ রূপটি নিয়েই গড়ে উঠেছে শিবের ধারণা।

বিষ্ণু পুরাণের মধ্যে রুদ্রের উৎপত্তি ও নামকরণের কাহিনী পাওয়া যায়। ব্রহ্মা যখন প্রজা সৃষ্টি করছিলেন তখন তাঁর কোলে নীললোহিত এক পুত্রের আবির্ভাব হল। পুত্রটি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মা ক্রন্দনরত পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, পুত্র, তুমি কীসের জন্য রোদন করছ। রুদ্র প্রজাপতিকে বললেন, পিতা আমাকে একটা নাম প্রদান করুন। বললেন, তুমি রোদন করতে করতে জন্মগ্রহণ করেছ বলে তোমার নাম হল রুদ্র। পুত্র এখন তুমি শান্ত হও। রুদ্র নাম প্রদানের পরও রুদ্র সাতবার ক্রন্দন করলেন। প্রতিবার ব্রহ্মা তাঁকে একটি করে নাম প্রদান করতে লাগলেন। রুদ্রের অপর সাতটি নাম হল ভব, শর্ব, পশুপতি, ঔগ্র, মহাদেব, ঈশান ও অশনি। ভব অর্থে জল, শর্ব অর্থে

BanglaBook.org

অগ্নি, পশুপতি অর্থে বায়ু, ঔগ্র অর্থে ওষধি ও বনস্পতি। মহাদেব অর্থে সূর্য, ঈশান অর্থে অন্ন ও অশনি হলেন ইন্দ্র।

সৌরপুরাণ অনুযায়ী ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির জন্য পঞ্চ পুত্রের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এই পঞ্চ পুত্রের মধ্যে থেকে কোনও প্রজা সৃষ্টি হল না। এঁরা প্রত্যেকেই তপস্বী হওয়ায় ব্রহ্মার মধ্যে ক্রোধের সৃষ্টি হল। সেই ক্রোধ থেকেই ব্রহ্মার ললাটজাত রুদ্রের উৎপত্তি। কোটি সূর্যের মতো তেজসম্পন্ন রুদ্র ব্রহ্মার ললাট থেকে আবির্ভাবের সময় ব্রহ্মাকে রোদন করিয়েছিলেন বলে কুমারের নাম হল রুদ্র।

শিবপুরাণে শিবের থেকেই রুদ্রের উৎপত্তি কল্পনা করা হয়েছে। রুদ্রের ধারণা ক্রমে ক্রমে শিবমূর্তিতে সংযোজিত হয়েছে এই তথ্যকে অস্বীকার করে বলা হয়েছে, শিব ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, হে ব্রহ্মণ! তোমার দেহ থেকে আমারই মতো রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ পুরুষ জন্মগ্রহণ করবে। আমার অংশ থেকে জন্মগ্রহণ করায় আমার থেকে তাঁর শক্তি পৃথক হবে না, আমি আর তিনি এক। তাই আমাদের পূজাবিধানেও কোন পার্থক্য থাকবে না।

বিষ্ণু পুরাণ অনুযায়ী ব্রহ্মার ভ্রূকুটি কুটিল ললাট থেকে রুদ্রের জন্ম হয়, রুদ্রের দেহ হয় অর্ধনারীশ্বর। ব্রহ্মা রুদ্রকে দুটি ভাগে বিভক্ত হতে বললে রুদ্র স্ত্রী ও পুরুষে ভাগ হয়ে যান। পুরুষটি শান্তরূপে ও অশান্তরূপে এগারোটি ভাগে বিভক্ত হন এবং স্ত্রীটি বহু ভাগে বিভক্ত হন।

শিবপুরাণে আটটির পরিবর্তে একাদশ রুদ্রের কথা বলা হয়েছে। এই পুরাণ অনুযায়ী প্রজা সৃষ্টির জন্য কঠোর তপস্যায় রত ব্রহ্মার মুখ থেকে মহাদেব রুদ্র রূপে নির্গত হয়েছিলেন। প্রকাশিত হয়েই তিনি নিজেকে একাদশ ভাগে বিভক্ত করলেন। একাদশ রুদ্রকে দেবাদিদেব আহ্বান করে বললেন, বৎসগণ সমস্ত লোকের মঙ্গলের জন্য সমস্ত লোকের প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণের জন্য তোমরা সৃষ্টি হয়েছ। সেই জন্য তোমার প্রজাদের মঙ্গল কর। মহাদেবের আদেশ শুনে রুদ্রগণ রোদন করতে করতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই কারণেই তাদের নাম হল রুদ্র।

রুদ্র দেবতার পূজা আজ প্রচলিত নেই। রুদ্র হারিয়ে গিয়েছেন মহেশ্বর শিবের মধ্যে। তবু বৈদিক যুগে আদি দেবতারূপে আমরা আজও তাঁকে স্মরণ করি। আদিম মানুষের কাছে প্রকৃতির উদ্দামতা রুদ্ররূপে প্রকাশিত হয়েছিল। আজ আমরা প্রকৃতির মঙ্গলরূপ দেখেছি, তার উদ্দামতাকে সঙ্কুচিত করতে কিছুটা সক্ষম। তাই রুদ্র হয়েছেন শিব।

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর পাহি মাং—জটায় দ্বিতীয়বার চাঁদ, বাঘাম্বর পরিহিত দেবাদিদেব মহাদেবকে অন্য দেবতার রূপকল্পনা থেকে সহজেই পৃথক

BanglaBook.org

করা যায়। শিব ভারতের জাতীয় দেবতা। ত্যাগ ও বৈরাগ্য, সততা ও আত্মভোলা আত্মতুষ্ট যে দেব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে ভারত। তাই ভারতবর্ষের অন্তঃসত্ত্বার প্রাণবস্তু। 'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে,—জগতে থেকে জগতাতীতের প্রতি আহ্বান। আত্মভোলা অর্থে কি ন্যায় অন্যায়ের প্রতি উদাসীন এক ক্লীব ব্যক্তিত্ব, সে গঠনে অংশগ্রহণ করেনা। বীর্যের অস্তিত্বমাত্র যাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয় না। তেজ ও দীপ্তি দেখে সে ডরায়? না শিবভাবনা সেই ধারণা সঞ্জাত নয়, আত্মভোলা শিবের রূপচিত্রের আরেকটি অংশ হল তাঁর নটরাজ মূর্তি। নিজ পত্নীর দেহত্যাগে রুদ্ররূপ ধারণ করে চঞ্চল তিনি। তাণ্ডবে ত্রিভুবন কাঁপিয়ে তুলেছেন।

ভারতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব—এই ত্রিদেবতার আরাধনা করেছে। বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত আছে এই তিন দেবতার মাহাত্ম্য কাহিনি। দেবাদিদেব মহাদেবের কথা প্রায় পুরাণেই অল্পবিস্তর থাকলেও শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গপুরাণে শিবই হয়ে উঠছেন প্রধান চরিত্র। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মধ্যে কে বড়? দেব সমাজে কার প্রাধান্য বেশি, দেবামাহাত্ম্যে কে বেশি পূজনীয়। স্কন্দপুরাণের মধ্যে এই বিতর্ক নিয়ে একটি বহুল প্রচলিত কাহিনীর দেখা পাওয়া যায়। সৃষ্টির আদিতে স্রষ্টা বড় না পালক বড় এই নিয়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই জগৎ সৃষ্টি করেন ব্রহ্মা আর পালন করেন বিষ্ণু। জগতে এই দুজনের মধ্যে কে বেশী প্রয়োজনীয়?—এই প্রশ্ন নিয়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হল। দ্বন্দ্ব থেকে সৃষ্টি হল যুদ্ধের। যুদ্ধে ব্রহ্মা ছিলেন উপরে বিষ্ণু নীচে। বহুদিন ধরে যুদ্ধ হয়ে চলল। কারোরই হার জিত হয় না। এদিকে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দুজনেই যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় জগত সৃষ্টি ও রক্ষার কাজ ব্যহত হল। সৃষ্টি ধ্বংস হয় হয়। ঠিক এই সময় ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে বিরাট এক জ্যোতির লিঙ্গ আবির্ভূত হল। জ্যোতি লিঙ্গটির আদি বা অন্ত দেখা যায় না। মহাদেব দৈববাণী করে বললেন, তোমরা যুদ্ধ বন্ধ কর। তোমাদের মধ্যে যে এই জ্যোতির স্তম্ভটির আদি ও অন্ত নির্ণয় করতে পারবে সেই অপরের থেকে বড় বলে প্রমাণিত হবে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দুজনেই বেরিয়ে পড়লেন। একজন গেলেন উৎসমুখে অপরজন লিঙ্গের শেষ দেখতে চললেন—কিন্তু বহু চেষ্টা করেও দুজনে সেই জ্যোতির্লিঙ্গের উৎস ও পরিণতি খুঁজে পেলেন না। ফিরে এসে দুজনেই সেই লিঙ্গের আরাধনা করলেন, তীব্র তপস্যার পরে সেই জ্যোতির মধ্যে আবির্ভূত হলেন শ্বেতশুভ্র দেবাদিদেব। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বুঝলেন, বৃথাই তাঁরা নিজেদের অহং নিয়ে মত্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন শিবশংকর। তাই তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে দর্শন দিয়ে মহাদেব বললেন, হে দেবতাদ্বয় আমার এই জ্যোর্তিময় রূপ সাধারণ মানুষের পক্ষে সহ্য

BanglaBook.org

করা সম্ভব নয়। তাঁরা জ্যোর্তিলিঙ্গের স্থূল রূপকে পূজা করলেই মৃন্ময় বা প্রস্তরলিঙ্গের পূজা করলেই আমি সন্তুষ্টি লাভ করব। —এই থেকে লিঙ্গ পূজার সূচনা হল।

স্কন্দপুরাণের এই কাহিনীটি ছাড়াও লিঙ্গপূজার উৎপত্তির কারণ রূপে পৌরাণিক সাহিত্যে আরও কয়েকটি কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। এদের কোনোটির সঙ্গে কোনোটিরই সামঞ্জস্য নেই। বৈদিক যুগে লিঙ্গপূজার কোন অস্তিত্ব ছিল না। বৈদিক যুগের রুদ্র ক্রমে পরিণত হয়েছেন আত্মভোলা শিবে। তারপর উৎপত্তি হয়েছে লিঙ্গপূজার। কে এই মহাদেব? যিনি মহান দেবতা, তিনিই সকল দেবের শিরোমণি মহাদেব। আত্মতুষ্ট, আত্মভোলা। ষাঁড়ের পিঠে চড়া, মাথায় জটাধারী, সাপ ভূত নিয়ে শালপ্রাংশু শ্মশানবাসী এই উদাসীন দেবতা একদিকে কল্যাণসুন্দর, অপরদিকে রুদ্র। একদিকে আশুতোষ, অপরদিকে তাণ্ডব নৃত্যে ত্রিভুবন কাঁপিয়ে ছন্দময় নটরাজ।

হর হর মহাদেব। হে দেবাদিদেব, আমাদের মুক্ত কর, মুক্ত কর। শিবের কাছে এই আমাদের প্রার্থনা। হিমালয়ের সঙ্গে শিবের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দেবাদিদেব শিব আমাদের ঘরের দেবতা। এই দেবতার জীবনচর্চা ও রূপকল্পনায় ভারতের ছোট্ট ছেলেমেয়েরাও বলতে শেখে, পিতা আমাদের শিব, মাতা হলেন গৌরী। আর ত্রিভুবন আমাদের গৃহ।

ভগিনী নিবেদিতা সুন্দরভাবে শিব রূপকল্পনাকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, 'শিবের কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা নিজের অজান্তেই চলে যাই সেই মহান, বৈদিক যুগে। যখন এ দেশে আর্যদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেই যুগ ছিল যজ্ঞের যুগ। তখন অরণ্যের গভীরে সকলে একত্রিত হতেন, আগুনে অর্ঘ্য সমর্পণ করতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত, কেটে যেত দিনের পর দিন। তারপর যখন সেই পবিত্র যজ্ঞাদি নিতে যেত সেই যজ্ঞকুণ্ড থেকে মানুষ তুলে নিত সেই ছাই। গুহায় অরণ্যে ধ্যান করতে করতে চুলকে তারা করেছিল জটায় পরিণত। কারণ সে অন্বেষণ করেছিল বিরাট আনন্দের। সেই আশ্রম জীবন, সেই অরণ্য জীবনের প্রতীক হয়ে উঠে এলেন যে দেবতা তিনি শিব, তিনিই সুন্দর, ভস্ম-বিভূষিত এক সন্ন্যাসী, যাঁর মাথায় অনাদৃত চুলের জটা। যজ্ঞের কাঠবহনের জন্য যে বৃদ্ধ ষাঁড়গুলি থাকত তাদের মধ্যে সবথেকে বৃদ্ধটিই তাঁর বাহন। স্থির নিশ্চল। পাহাড়ের গায়ে যেমন বাঁকা চাঁদ, ঠিক শিবের ললাটে সেই বাঁকা চাঁদের শোভা। জটাজাল দিয়ে তিনি ধরে রেখেছেন পবিত্রতা স্বরূপিণী গঙ্গাকে। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, 'হিমালয়ের একেবারে মাথায় রয়েছে বিরাট তুষার পর্বত। সেখানে সেই স্থির, শীতল উচ্চতায় পাতা আছে শিবের সিংহাসন। নীরবে—না,

BanglaBook.org

নীরবতায় মগ্ন হয়ে চিরধ্যানে লীন হয়ে তিনি সেখানে বিরাজ করছেন। যখন প্রতিপদের চাঁদ পর্বত শিখরে মহাদেবের ললাটের উপরে দেখা দেয়, তখন উপাসকদের মনে হয়, ওই চাঁদের আলো যেন তাঁর চতুর্দিকে উদ্ভাসিত না করে তাঁর ভেতর থেকেই বেরোচ্ছে, কারণ তিনি জ্যোতির্ময়, তাঁর ছায়া পড়ে না।

ভারতবর্ষ চিরকালই পর্বত নদী, তারা প্রভৃতিকে প্রাণময় বস্তু বলে ভেবেছে। সব কিছুতেই একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনা করে নিয়েছে। আর্যদের আদি বাসভূমিতে দেবতা ছিলেন ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ। ভারতে আসবার পর সেই প্রাচীন দেবভাবনার সঙ্গে আরেকটি দেবভাবনার সৃষ্টি হল। তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। নতুন দেশের সুন্দর দৃশ্য তাঁদের কল্পনাকে রাঙিয়ে তুলল। তুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী গিরি শৃঙ্গগুলি সহজেই আর্যদের মন কেড়ে নিল। সাংসারিক কোলাহলের মধ্যে তাঁরা যেন নিঃস্তব্ধভাবে বিরাজমান। তাঁদের শৈত্য আর উচ্চতার কথা ভাবলে ভয় লাগে, তবু অপার সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্যের সীমা নেই, কার সঙ্গে এই সৌন্দর্যের তুলনা হতে পারে? অবশ্যই যোগী ঋষিদের সঙ্গে। ভস্মে আচ্ছাদিত যাঁদের শুভ্রতনু—সমাধিতে নিমগ্ন যাঁরা, নির্বাক, নিস্তব্ধ, তাঁদের দেখতে শিবের মতো, সৃষ্টি হল শিবের ধারণা। শিবের ধারণা। শিবের কল্পনা করতে গিয়ে তাঁদের মনে কখনও হোমশিখা, কখনও শুভ্র গিরিচূড়া, কখনও ভস্মে আচ্ছাদিত যোগীর ছবি স্থান করে নিল। এই তিনটি মিলেই গড়ে উঠল শিবের ধারণা।

পুরাণের পাতায় পাতায় শিবের এই উদাসীন রূপটি গাঁথা হয়ে রয়েছে। তাঁর শুভ্র তণু লক্ষ করলে দেখা যাবে গলার কাছটিতে সামান্য নীলরেখা। তিনি নীলকণ্ঠ। মহাদেবের নীলকণ্ঠ হওয়ার কাহিনী চমকপ্রদ। একবার দেব ও অসুরেরা অমৃত লাভের জন্য সমুদ্রমন্থন করবেন বলে ঠিক করলেন। মন্থিত সমুদ্র থেকে উঠে এল নানা ভাল ভাল জিনিস। উঠলেন, উচ্চৈঃশ্রবা, দেবী লক্ষ্মী, অবশেষে অমৃতকুম্ভ। কিন্তু মন্থনের ফলে ভালর সঙ্গে মন্দও উঠে এল। অমৃতের সঙ্গে উঠে এল তীব্র হলাহল, কারণ মন্দ ব্যতীত ভালর অস্তিত্ব স্বীকার করেনি ভারতে—ধ্বংস ব্যতীত গঠনের কোনও ভূমিকাই নেই এই দর্শনে। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও হয়েছে পূজিত। কিন্তু শুভের জন্যই তো লালায়িত আমরা। তাই দেবতারা অমৃতের ভাগ নিলেন, নিলেন না তীব্র কালকূট বিষের জ্বালা। কিন্তু বিষকে ধারণ করতে হবে, নইলে যে বিশ্ব সংসার ধ্বংস হয়, হয়। এখন তিনি ছাড়া বাঁচবার কোনও পথ নেই। এক মুহূর্তেই ধ্যানাসন ত্যাগ করে নন্দী ভৃঙ্গীকে সাথী করে চললেন ভোলানাথ বিষপান করতে। শুভক্ষণে আমাকে ডাকোনি কেন? এই প্রশ্ন তাঁর কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু না, কারোর কাছে কিছু পাওয়ার অপেক্ষা করেন না তিনি। তাই অনুযোগের সূক্ষ্ম রেখাও তাঁর মুখে ফুটে উঠল না।

BanglaBook.org

তীব্র কালকুটকে হাতের মধ্যে ধারণ করে শান্ত সুন্দর তা গলায় ঢেলে দিলেন। যে বিষের জ্বালায় ত্রিভুবন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই বিষের তীব্রতা মহেশ্বরের কোনও ক্ষতি করতে পারল না। কেবল এই বিষের তীব্র দহন তাঁর সুন্দর শঙ্খ শুভ্র গলায় এঁকে দিল নীলরেখা। পার্বতীনাথ হলেন নীলকণ্ঠ।

উদাসীন মহাদেবের বেপরোয়া প্রেমিক রূপটিও আঁকা হয়েছে পুরাণে। দক্ষযজ্ঞ ও সতীর কাহিনী কে না জানে? পিতার অমতে সতী বিবাহ করলেন দেবাদিদেবকে। ক্রুদ্ধ পিতা যজ্ঞস্থলে সকলের সম্মুখে অপমান করলেন সতীকে। পতিনিন্দা শুনে যজ্ঞস্থলেই দেহত্যাগ করলেন সতী। প্রিয়ার মৃত্যুতে উদাসীন শিবই হয়ে উঠলেন রূদ্ররূপী নটরাজ।

শিব সম্বন্ধে সব থেকে বিচিত্র কল্পনা হল তাঁর বিবাহ। ভিখারি উদাসীন শঙ্করের পাশে শোভা পান গিরিরাজ নন্দিনী পার্বতী। শিবের কপালে চাঁদের টুকরোর মতোই শুভ্র উজ্জ্বল তিনি। পার্বতী শিব বিহনে বাঁচেন না, আবার শঙ্করের অবস্থাও তথৈবচ। তাই তাঁর দুয়ে মিলে সৃষ্টি করেন অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। অর্ধ মহাদেব, অর্ধ পার্বতী। ভিখারীর প্রতি রাজনন্দিনীর গভীর নির্ভরতার মতো রোমাণ্টিক কল্পনা ভারতবর্ষ কোন প্রাচীন কালে করেছে। কেবল ভিখারি নন শঙ্কর, কামদেবকে তিনি ভস্ম করে হয়েছেন শান্ত। তাঁর শান্ত স্নেহে বক্ষলগ্না পার্বতী প্রস্ফুটিত লতার মতোই চিরসুন্দর।

এই সুন্দরের দেবতার জন্য আমরা বছরের একটি দিনকে নির্দিষ্ট করেছি। সেই তিথিটি হল শিব চতুর্দশী। আমাদের পরিচিত শিবরাত্রি। সাধারণের ধারণা শিবরাত্রির দিন শিবপূজা করলে ভাল স্বামী লাভ করা যায়। তাই শিব চতুর্দশীর দিন দলে দলে মেয়েরা বেলপাতা ফুল নিয়ে শিবের মাথায় জল ঢালে। লোককথায় শিবরাত্রির মাহাত্ম্য এইভাবে ব্যাখ্যাত হলেও শাস্ত্রীয় ক্ষেত্রে শিবরাত্রির তাৎপর্য একেবারে ভিন্ন। শিব অতি প্রাচীন দেবতা, আদি অন্তহীন আকাশের মতোই তিনি বিশাল, তিনি রুদ্র ধ্বংসের দেবতা, তিনি বৈরাগ্যের দেবতা। তাই তাঁকে আরাধনা করলে আর জন্মমৃত্যুর কষ্ট ভোগ করতে হয় না। মানুষ মোক্ষলাভ করে। তাই শিব চতুর্দশী সন্ন্যাসী ও ত্যাগমুখী মানুষের একান্ত প্রিয় তিথি।

দেবতারূপে দেববাদিদেব মহাদেব বিভিন্নভাবে আমাদের ধর্মভবনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছেন। প্রতিটি যাগ-যজ্ঞ, আচার অনুষ্ঠানের আগে আমরা যে পঞ্চদেবতার আরাধনা করি তাঁর মধ্যে শিব অন্যতম। পুরাণে শিব কাহিনি তার থেকে পৃথক। কারণ তন্ত্রে শিব তাঁরই শক্তি পার্বতীর কাছে তুলে ধরছেন এক নতুন ও গুহ্য ধর্মপদ্ধতি। যা পঞ্চম'কার রূপে খ্যাত। আবার বাংলার

BanglaBook.org

লোকসাহিত্যে দেবাদিদেব আত্মভোলা জামাতারূপে বন্দিত। এখানেও তাঁর উদাসী রূপের মধ্যে যে পৌরুষ ব্যক্ত হয়েছে তা লোকজীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু এই শিব ভাবনার উৎপত্তি হল কোথা থেকে। মানবসভ্যতার কোন ক্ষণে দেবাদিদেব নেমে এলেন ধরার ধূলিমলিন মানুষের আরাধ্য দেবতা হয়ে!

নৃতত্ত্ব ও বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে মহেঞ্জোদড়োতে তিন মাথাওয়ালা এক দেবতার চিহ্ন দেওয়া মোহর পাওয়া গিয়েছিল। এই তিন মাথাযুক্ত দেবতাই শিব ভাবনার গোড়ার কথা। মহেঞ্জোদড়োর সীলমোহরের ছবিতে সেই 'আদি' শিব' দেবতা কূর্মাসনের ভঙ্গিমায় উপবিষ্ট। তাঁর দুই হাতে অনেকগুলি বালা বা কঙ্কনজাতীয় অলঙ্কার, গলায় কয়েকটি হার। তিনমাথার উপরে মহিষের জোড়া শিং—বসানো মুকুট। এই দেবতার পরিধানে কিছু নেই এবং পুরুষাঙ্গটি উর্দ্ধমুখ। এই দেবতাকে বেষ্টন করে রয়েছে, একটি গণ্ডার, মহিষ, বাঘ, হাতী এবং মানুষ। আর তার আসনের তলায় রয়েছে দুটি ভেড়া হরপ্পা সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ স্যার জন মার্শাল এই রূপটিকে শিবের আদি 'পশুপতি' রূপ রূপে চিহ্নিত করেছেন। কারণ তিনি পশুদের নিয়ে বিরাজ করছেন।

শিব প্রসঙ্গে এক আলোচক তাঁর আলোচনায় বলেছেন, 'পরবর্তীকালের 'শিবাষ্টকম্' স্তোত্রে শিবকে বলা হয়েছে 'করিচমর্গ', 'কৃত্তিপট', 'আজিবিষাণধর' 'বৃষরাজ-নিকেতন'। 'করি' এবং 'কৃত্তি' শব্দের অর্থ যথাক্রমে হস্তী ও ব্যাঘ্রচর্ম; 'আজিবিষাণ' হল গণ্ডার-শৃঙ্গ এবং 'বৃষরাজ-নিকেতন' অর্থে 'মহাবৃষ-দেশবাসী'। মহাবৃষ ছিল সৌবীর সিন্ধু এবং আরট্ট ভূমির মধ্যবর্তী দেশ অর্থাৎ এখানকার পাঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল। স্পষ্টতই সিন্ধুসভ্যতা বিকশিত হয়েছিল যে ভূখণ্ডে, সেখানকার দেবতা বলেই গণ্য করা হয়েছে শিবকে।" (পূজা-পার্বণের উৎসকথা, পৃ.-১৩০)।

ত্রিমস্তক যুক্ত দেবতারূপে আমরা সাধারণত ব্রহ্মার কথা ভেবে থাকি। কিন্তু শিবের ক্ষেত্রেও এই একই ভাবনার দেখা পাওয়া যায়। সেই কারণেই তাঁকে 'ত্রিশীর্ষ' 'ত্রিবক্ত্র' ইত্যাদি শব্দে বন্দনা করা হয়েছে। মহেঞ্জোদড়োর সেই আদি সভ্যতায় শিব কোন নামে চিহ্নিত হতেন?—একথা সঠিকভাবে আজও জানা যায় না। কারণ সিন্ধুসভ্যতার লিপিমালা আজও পাঠোদ্ধার করা সম্ভবপর হয়নি। তাই তাঁদের 'পশুপতি শিব' সঠিক কোন পরিচয়ে পূজা লাভ করতেন তা আমরা জানতে পারি না।

শিবকে সর্বদাই প্রাচীন ভারতীয় অনার্য জনগোষ্ঠীর দেবতা রূপে বন্দনা করা হয়েছে। ইতিহাস অনুসারে আর্যগণ যখন ভারতভূমিতে এসেছিলেন তখন অনার্য বা আদি ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সঙ্গে একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। শিব ও দক্ষের

BanglaBook.org

কাহিনি সেই দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন। যজ্ঞের কোনোও প্রয়োজন নেই এই দেবতার। বাস তাঁর শ্মশানভূমি, সহচর সর্পকূল আর অঙ্গের শোভা হল সর্প। এই বনচারী বাঘছাল পরিহিত দেবতার সঙ্গে দক্ষ নিজ কন্যা সতীর বিবাহকে মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি বারংবার অপমানিত করার চেষ্টা করেছেন জামাতাকে। বিরাট যজ্ঞে সমস্ত দেবকূল নিমন্ত্রিত হলেও শিবের কোনোও নিমন্ত্রণ নেই। এই যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোনো বাসনাও নেই নিরাসক্ত মহাদেবের। তিনি নিস্পৃহ, নিরাসক্ত। মহাদেবের পাশে অন্যান্য দেবতাদের বড় বেশি বাহুল্যযুক্ত মনে হয়। রত্নখচিত অলঙ্কার ও মুকুটের শোভার পাশে জটাধারী চন্দ্রমৌলী শিব বড়ই উদাসীন। না আছে তাঁর কোনোও দৈব অস্ত্র, না আছে কোনোও ভূষণ। কেবল ত্রিশূল আর বাঘছালেই তিনি দেবতাদের রাজা হয়ে উঠেছেন।

গবেষকের মতে শিবের আদি ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো এই দুটি নগরের ইতিহাস। এই গবেষণায় বলা হয়েছে, 'মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পা এই শহরদুটির নামের তাৎপর্য কি? এখন না হয় 'মহেঞ্জোদড়ো' অর্থে সিন্ধি ভাষায় 'মৃতের পুরী'—কিন্তু যখন সে নগরী পাঁচ হাজার বছর এবং তারও আগে জীবন্তের পুরী ছিল তখনও কি ওই অর্থ ছিল? অবশ্যই সম্ভবপর নয় সেটি। তাহলে কি এমন ধরে নেওয়া অসঙ্গত হবে যে...সিন্ধু জনকোষগুলি মহেঞ্জোদড়োকে যে নামে উল্লেখ করত আর্যদের ভাষায় সেটি অনূদিত হয়ে এবং কালপরম্পরায় প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে আধুনিক সিন্ধি ভাষায় মহেঞ্জোদড়োতে পরিণত হয়েছে? মহেন্দ্র (শিব)-দৃঢ় (দুর্গপুরী) মহেঞ্জদড়ো, এই ভাষাগত বিবর্তন খুবই স্বাভাবিক। স্মরণযোগ্য ঋগ্বেদের ইন্দ্র হলেন 'পুরন্দর' এবং 'দৃঢ়হা' অর্থাৎ নগর এবং দুর্গ ধ্বংসকারী। হরপ্পা নামটিও এভাবে বিশ্লেষণ করা আদৌ অসম্ভব নয়। 'হর' বা শিব শব্দের উত্তরপদ হিসেবে 'আপ্পা' থেকে গেছে; সিন্ধুজনপদবাসীরা এই শহরকেও সম্ভবত শিব (তদানীন্তন ভাষায় তাঁরা তাঁকে যা বলতেন সেইরূপে) নামাঙ্কিত করেছিলেন। 'আপ্পা'-বাচক দ্রাবিড় প্রত্যয় আমাদের অপরিচিত নয়, সম্ভবত আদি-দ্রাবিড় ভাষাতেও তা বিদ্যমান ছিল এবং সেটিই এখনও টিকে আছে। ইরাবতীর নিকটবর্তী হরপ্পাকে যজ্ঞবতীর তীরস্থ 'হরিয়ূপীয়া' রূপে ঋগ্বেদে অবশ্য একবার উল্লেখ করাও হয়েছে।'

বর্তমানে আমরা দেবাদিদেব মহাদেবের মাথায় চন্দ্রকলা শোভিত থাকতে দেখি। তাই তিনি 'চন্দ্রশেখর' নামে বন্দিত হন চন্দ্রকে জটায় স্থান কেন দেওয়া হয়েছিল—এ নিয়ে পৌরাণিক কাহিনি বর্তমান। কিন্তু গবেষকদের মতে পশুপতি শিবের মস্তকে মহিষশৃঙ্গের মুকুটই বিবর্তিত হয়ে চন্দ্রকলায় রূপান্তরিত হয়েছে। গবেষকদের মতে, 'যাঁদেরকে ঋগ্বেদে 'বিষাণিন' 'বৃষশিপ্র' মহাভারতে 'শৃঙ্গিন'

BanglaBook.org

বিষ্ণুপুরাণে 'শৃঙ্গল' ইত্যাদি রূপে অভিহিত করা হয়েছে, তাঁদের কল্পিত দেবতার মাথাতেও বৃষ মা মহিষশৃঙ্গ সমন্বিত মুকুট বা শিরোভূষণ থাকবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। উত্তরকালে শিবের প্রতিমূর্তির মাথায় যে বঙ্কিম চন্দ্রকলা দেখা যেতে আরম্ভ করল, সেটা সম্ভবত ওই শৃঙ্গমুকুটেরই রৈখিক বিবর্তন। আদি শিবের পশু প্রতীক হিসেবেই হয়ত মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা। লোথাল, চনহুদড়োর বিখ্যাত 'সিন্ধু-ষণ্ড' অঙ্কিত মুর্তিসহ মোহরগুলি প্রচলিত ছিল। শিবের বাহন হিসেবে উত্তরকালের হিন্দুধর্মে এসে তারই আসর জাঁকিয়েছে। ত্বষ্টা-তথা-বৃত্র-তথা-শিবের শত্রু ইন্দ্র এই বৃষ ও মহিষকুলকে ভোজন করে নিঃশেষ করতে চাইলেও (বৈদিক শ্লোকের সাক্ষ্যনুযায়ী) পরিণামে তিনি নিজেই গ্রস্ত হয়ে গেছেন বৃষপতি মহেন্দ্রের (শিবের) দ্বারা পরাভূত! প্রাগার্য দেবতা অপহৃতা সিন্ধু-জনপদবালাদের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে·রেখে কালক্রমে প্রধানত হিন্দুদেবতা শিব মহেশ্বর, মহিষ-ঈশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, বৈদিক রুদ্র দেবতা তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।" (ঐ পৃ. ১৩৫-৬)

বৈদিক সাহিত্যে বৃত্র আর ইন্দ্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের দেখা পাওয়া যায়, সেই দ্বন্দ্বের নায়ক বৃত্রই পরবর্তীকালে শিবরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বৈদিকরুদ্র দেবতার সংমিশ্রণ হয়েছে তাঁর সঙ্গে। এইভাবে শিব ঠাকুরের রূপকল্পনা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে। শিবের রূপকল্পনার অস্তিত্ব যেমন হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার মধ্যে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনভাবেই শিবলিঙ্গের আরাধনার সূচনাও সেই সভ্যতার মধ্য থেকেই হয়েছে বলে মনে করা হয়। যদিও পরবর্তীকালে লিঙ্গ পুরাণের মাধ্যমে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার দ্বন্দ্বের কাহিনি জ্যোতির্লিঙ্গের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে তবু মহেঞ্জোদড়োর উর্দ্ধলিঙ্গ তিন মাথাওয়ালা দেবতাই যে লিঙ্গ আরাধনার মূল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আদিম মানুষের কাছে সৃষ্টিই ছিল এক রহস্য, তাই মাতৃযোনি ও পিতৃযোনির একত্র সহাবস্থান সহ লিঙ্গপূজার প্রচলন হয়েছে। শিব হয়েছেন 'শিশ্নদেবাঃ'। শিব ও পার্বতীর এই ধরনের অবস্থান প্রসঙ্গে লিঙ্গপুরাণে যে কাহিনিটি ব্যক্ত করা হয়েছে, তা হল, কামরতা শিব বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করতে চাইলে বিষ্ণু তাঁর লিঙ্গচ্ছেদ করেন। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র কর্তৃক ছিন্ন শিবলিঙ্গ বৃহৎ আকার ধারণ করতে করতে যখন চারদিক পরিব্যপ্ত হয়ে যায় তখন স্বয়ং গৌরী তা ধারণ করে জগৎকে রক্ষা করেন। এজন্যই শিবলিঙ্গের সঙ্গে গৌরী-পট্ট অবশ্যই পূজিত হয়।

সভ্যতার আদিকালে মাতৃযোনি পিতৃযোনির পূজা পরবর্তিকালের সভ্যমানুষেরা চেতনায় ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। লিঙ্গঅর্চনা কেবল ফার্টিলিটি

BanglaBook.org

কাল্ট এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এর সঙ্গে ধর্মীয় তত্ত্বেরও বিবর্তন হয়েছে। শিব এখন সন্ন্যাসীদের গুরু, মাতৃযোনি ও পিতৃযোনির একত্র পূজার অর্থ সংসার চক্র থেকে মুক্তিলাভ। লিঙ্গপূজার মধ্য দিয়ে এই প্রার্থনা করা হয়! আর যেন মাতৃযোনি পিতৃযোনির মধ্য দিয়ে জন্ম না হয়! আবার বাংলার লোক সমাজে উদাসী শিবের মতো বর প্রাপ্তিই নাকি শিবপূজার কারণ! কিন্তু শিব মাহাত্মকে এত সীমিত করা। শাক্তদের মতো শৈব ধারা গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে কত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। শৈবতীর্থের পথে পথে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে সাধকের। বৈচিত্রে ভরা আমাদের ভারতবর্ষে তুষারধবল হিমালয় চিরকাল ধ্যানী তপস্বীর আলয় রূপে চিহ্নিত হয়েছে। শিবের বাসও এই হিমালয়ের কৈলাসে। সেখানে তিনি পার্বতী ও অন্যান্য অনুচরসহ বাস করেন। ভারতের শৈবতীর্থগুলির পথ ধরেই ঘটবে শিব মহিমার সঙ্গে পরিচয়।

তিন

শিবপূজার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে ইতিহাসও। যদি তার সত্যতা প্রমাণ করার কোন নির্দিষ্ট উপায় নেই। তবু একটি মতে প্রাচীন ভারতে যে আর্যরা এসেছিলেন তাদের একটি শাখা হিমালয়ের গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসবাস শুরু করেন। প্রজাপতি দক্ষ ছিলেন এঁদের নেতা। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রজাপালন করতেন বলেই, তাঁর নাম প্রজাপতি দক্ষ। প্রজাপতি দক্ষ যাগ যজ্ঞাদিতে ছিলেন নিপুণ। আর্য সমাজের নেতা রূপে তাঁর মনের মধ্যে একটি অহঙ্কারের ভাব ছিল। তিনি বিভিন্ন যাগযজ্ঞের আয়োজন করে দেবতাদের আহ্বান করতেন। হিমালয়ের গাঙ্গেয় উপত্যকায় দক্ষ প্রজাপালন করলেও, হিমালয়ে আর গভীরে ইলাবৃত্ত নামে যে অঞ্চল ছিল তার রাজা ছিলেন ইন্দ্র। দক্ষ ইন্দ্রকেও যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করতেন। এই ইলাবৃত্তের অধিবাসীরাই নাকি ভারতীয়দের চোখে ছিলেন দেবতা। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে এই দেবতাদের স্মরণ করেই বলা হচ্ছে, 'হে দেবগণ, আমরা তোমাদেরই স্বজাতি। এখন আমরা দূরে এসেছি বলে আমাদের হিংসা কোরো না। আমরা সব সময়ই সেই মহান পিতৃভূমির কথা স্মরণ করি।'

হিমালয়ের গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্যদের দিনগুলি ভালই কাটছিল, যাগ-যজ্ঞের ধূমে আচ্ছাদিত হত তাঁদের গৃহপ্রাঙ্গণ। ঠিক এসময়ই হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতের কৈলাস থেকে এক মহাযোগী নেমে এলেন। উদাসীন এই যোগী, নিস্পৃহ, নিরাসক্ত। তাঁর আত্মমগ্নতা দেখে সকলেই অনুধাবন করলেন আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তিনি। তাঁর এই আত্মজ্ঞান তিনি এমনভাবে বিতরণ করতে

BanglaBook.org

লাগলেন যার ফলে সকলেই ধর্মভাবনাকে সুন্দরভাবে অনুসরণ করতে পারল। সুতরাং দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন এই ব্যক্তি। ইনিই আমাদের দেবাদিদেব মহাদেব।

শিবশম্ভুর এই জনপ্রিয়তাকে ঠিক ভালমনে গ্রহণ করতে পারেননি প্রজাপতি দক্ষ। তাই যাগযজ্ঞের ভাগ তাঁকে ঠিক মতো দিতে চাইলেন না তিনি। তাই দক্ষের ষোলটি মেয়ের সব শেষটি যখন শিবের গলায় মালা দিলেন তখন স্বাভাবিক ভাবেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন প্রজাপতি দক্ষ।

তবে কি দেবাদিদেব মহাদেবের ভিন্ন দেশ থেকে এসেছিল? আমাদের প্রাণের প্রিয় শিব ঠাকুর কি বহিরাগত? তা নয়, পুরাণের মধ্যে, তন্ত্রের মাধ্যমে যে শিবতত্ত্ব আমাদের ধর্মভাবনার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে, তার প্রতিটিই ভারতবাসীর নিজস্ব মননের ফসল। পুরাণ তাই মহেশ্বর বা মহান এই ঈশ্বরকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানা কাহিনি। কখনও তিনি আত্মমগ্ন যোগী, বড় বেশি তপস্যাপ্রবণ। তাঁর সংযমী জীবন, ব্রহ্মার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে কোনও সময়। আবার কোনও সময় তিনি বিভিন্ন লীলায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাই শিবলিঙ্গ পূজা নিয়ে বিভিন্ন পুরাণে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন কাহিনি। এর মধ্যে স্কন্দপুরাণের কাহিনিটি আমরা উল্লেখ করেছি। কূর্মপুরাণেও বর্ণিত হয়েছে আরেকটি চমক্প্রদ কাহিনি।

হিমালয়ের কন্দরে দেবদারু বন নামে এক প্রসিদ্ধ তীর্থ ক্ষেত্র ছিল। এই তীর্থে বহু মুনিঋষি তপস্যা করতেন। তাঁদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁদের দেখা দিয়ে বললেন, 'এই রমণীয় তীর্থে সর্বদা তোমরা আমার ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকবে, এই তীর্থে আমার আরাধনা করলেই তোমাদের সিদ্ধিলাভ হবে। ইহলোকে যে সব ধর্মপরায়ণ মানুষ আমার অর্চনা করবে আমি তাঁদের 'অবিনশ্বর গণপতি' পদদান করব। এই তীর্থে মৃত্যু হলে তোমাদের আর পুনর্জন্ম হবে না। হে সন্ন্যাসীগণ, তোমরা সর্বদা জানবে এই স্থানে আমি এবং নারায়ণ একত্রে বিচরণ করব। এই স্থানে শ্রাদ্ধ, দান, তপস্যা, হোম, পিণ্ডদান, ধ্যান, জপ ব্রত করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। এই বনে যেহেতু নারায়ণ ও আমি একত্রে বাস করি সুতরাং এই তীর্থ সব তীর্থসার। এই তীর্থকে স্মরণ করলেই সমস্ত পাপের নাশ হয়।'

মহাদেবের নির্দেশ শুনে হাজার হাজার মুনিঋষিরা তাঁদের স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। দেবাদিদেব দেখলেন, এ অদ্ভুত কাণ্ড। ঋষিরা পুণ্যের লোভে দেবদারু বনে তপস্যার জন্যে উপস্থিত হচ্ছেন বটে, কিন্তু তাঁদের সংসার কামনা, তাঁদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে বাধা সৃষ্টি করেছে। তার ফলে তাঁদের মধ্যে তপস্যার তেজ কমে যাচ্ছে। তাঁরা নানারকম কামনায় নানা যজ্ঞ করতে লাগলেন।

BanglaBook.org

তখন কামনাময় চিত্ত পূর্ণ মুনিদের দোষ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য ভগবান মহাদেব দেবদারু বনে উপস্থিত হলেন। মহাদেব একা গেলেন না, সঙ্গে গেলেন স্বয়ং বিষ্ণু। কারণ, দেবদারু বনে হরি এবং হর একত্রে বিরাজ করছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নিষ্কাম কর্মের প্রশংসা করে মুনিদের মধ্যে সকাম কর্মের প্রতি অনিহা সৃষ্টি করা। মহাদেব দেবদারু বনে উনিশ বছরের বালক রূপে নেমে এলেন, গতি লীলায় অলস বাহু দুটি জানু পর্যন্ত লম্বিত, স্থূল দেহ, চোখ দুটি সুন্দর, গায়ের বর্ণ সোনার মতো মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের মতো। দিগম্বর মহাদেব গতিলীলায় তাঁর অলস বাহু দুটি আন্দোলিত করছেন, স্থূল দেহে মৃদু মন্দ হাসি। মহাদেব পুরুষরূপ ধারণ করলেও নারায়ণ ধরলেন নারীরূপ, শ্রীহরি যে মনোহর স্ত্রীমূর্তি ধারণ করেছিলেন সেই মূর্তি লীলা চঞ্চল, শ্যামল ও সুপ্রসন্ন। পীন পয়োধরা। সুন্দর চক্ষু শ্রীহরির গতি ভঙ্গিটি রাজহংসের মতো সুন্দর। নূপুরে ঝঙ্কার তুলে হরের সহচরী রূপে উপস্থিত হলেন দেবদারু বনে।

হর ধরেছেন মনোহর পুরুষবেশ আর নারায়ণ হয়েছেন সুরূপা নারী। এই দুইরূপে দুইজন দেবদারু বনের ঋষি ও ঋষি পত্নীদের মুগ্ধ করলেন। দেবদারু বনের নারীরা মহাদেবকে দেখে মুগ্ধ, নিজেদের স্বামী, পুত্র কন্যার আকর্ষণ ভুলে তাঁরা সেই অচেনা সুন্দর মায়াবী পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এই ঋষিপত্নীদের পতিব্রতা রূপে খ্যাতি ছিল, কিন্তু তাঁরা মহাদেবের ওই রূপ দেখে কামর্জ্জর হল এবং তাঁদের অঙ্গ থেকে বস্ত্র ও আভরণ খুলে পড়ে যেতে লাগল। এদিকে জিতেন্দ্রিয় ঋষিপুত্রদেরও মোহিত করলেন হরি। তাঁরাও কামার্ত হয়ে স্ত্রীবেশরূপী হরির পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। দেবদারু বনের ঋষিদের মনে হল, হরি এবং হর নিশ্চয়ই পতিপত্নীর সম্বন্ধে আবদ্ধ। ঋষিপত্নীরা মহাদেবকে ঘিরে নাচগান করতে লাগলেন। মায়াবী মুরারী বাসুদেব তখন স্ত্রীসঙ্ঘের ও মুনিকুমারদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে অজেয় মনে উপভোগ ও প্রবৃত্তির জন্ম দিতে লাগলেন। মায়া মোহিত হওয়ায় তারা ওই উপভোগ যেন সম্পূর্ণভাবে অনুভব করতে পারলেন। কিন্তু এই অবস্থা বেশিক্ষণ ফলবতী হল না কারণ ঋষিরা তপস্যার প্রভাবে নিজেদের কিছুক্ষণের মধ্যেই সচেতন করতে পারলেন, যদিও তাঁদের মন থেকে মোহ অপসারিত হল না। সচেতন হয়েই তাঁদের দৃষ্টি গেল দিগম্বর শিবের উপর। এই দিগম্বর কে? আমাদের পতিব্রতা স্ত্রীদের ক্রমাগত আকর্ষণ করছে। তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে নানা কটুকাটব্য বর্ষণ করতে লাগলেন শিবের উদ্দেশে। কিন্তু তাতে দেবাদিদেবের কোন বিকার হল না, সূর্য যখন উদিত হন তখন নক্ষত্রদের প্রভা মলিন হয়ে যায়! শিবশম্ভু সেই সূর্যসদৃশ। ঋষিদের অভিশাপ তাঁর কিছুই করতে পারল না। অবশেষে ঋষিরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে

BanglaBook.org

যুবক তোমার পরিচয় কী? তুমি কে?" শিব উত্তর দিলেন, "হে ঋষিগণ, আমি আপনাদের মতোই তপস্বী। তপস্যা করবার অভিপ্রায়ে এই পবিত্রস্থানে উপস্থিত হয়েছি। আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার স্ত্রী।" দেবাদিদেবের এই কথা শুনে ভৃগু প্রমুখ মহর্ষিরা তাঁকে বললেন, দেখো, তুমি দিগম্বর। তপস্যার জন্য বস্ত্র পরিধান করা যেতে পারে। এবং স্ত্রীকে নিয়ে তপস্যা করা যাবে না! ঋষিদের কথায় শিব বিস্ময়ের ভান করে বললেন, 'আপনারা সকলে নিজের স্ত্রীর ভরণ পোষণের জন্য সর্বদাই ব্যস্ত, তাহলে এরকম ধর্মজ্ঞ ও শান্তচিত্ত হয়েও কী করে বলছেন যে তপস্যার জন্য স্ত্রীত্যাগ আবশ্যিক।" ঋষিরা উত্তর দিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে বলা আছে, ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে স্বামী ত্যাগ করবেন, তোমার এই স্ত্রী ব্যভিচার করছে। তাই তাকে তুমি ত্যাগ করবে।' দেবাদিদেব উত্তর দিলেন, 'হে ঋষিগণ, আমার এই স্ত্রী কখনও অন্যপুরুষকে কামনা করে না। আমি এঁকে তাই ত্যাগ করতে অক্ষম।' শিবের কথা শেষ হওয়া মাত্র সংযমী ঋষিরা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন এবং দিগম্বর সুন্দর যোগী শিবশম্ভুকে নানাভাবে আক্রমণ করতে লাগলেন। ঋষিদের দেওয়া আঘাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না শিব, তিনি ধীর গতিতে দেবদারু বন পরিক্রমা করতে লাগলেন। পাশে মনোহারী স্ত্রীরূপী জনার্দন।

এই দেবদারু বনেই বশিষ্ঠ এবং তাঁর পতিব্রতা স্ত্রী অরুন্ধতী তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। দেবাদিদেব ও নারায়ণ ঘুরতে ঘুরতে তাঁদের আশ্রমে প্রবেশ করলে। ঋষি বশিষ্ঠ দেবাদিদেবের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে না পারলেও তাঁকে আহত দেখে আশ্রমে নিয়ে বসালেন। শরীরের লক্ষ্মণ স্বরূপ বুঝলেন—এ নিশ্চয়ই কোনও যোগী। ব্রাহ্মণদের আঘাতে যোগীর শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়েছে দেখে, ক্ষতের উপর যত্ন সহকারে ওষুধ লেপন করলেন। তারপর তাঁকে ভিক্ষাদানে তুষ্ট করে বললেন, 'হে দেব, আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? আপনার আচার কী? ভগবান তখন উত্তর দিলেন আমি এক সিদ্ধ যোগী। ব্রহ্মময় এই যে বিশুদ্ধ মণ্ডল সর্বদা প্রকাশিত হচ্ছে, ইনিই আমার দেবতা।' এই কথা বলে দেবাদিদেব আশ্রমের বাইরে আসতেই ঋষিরা আবার তাঁকে প্রহার করতে লাগলেন। তাঁরা চীৎকার করে বলতে লাগলেন, 'রে দুর্মতি, তুমি এই মহালিঙ্গ উপড়ে ফেল।' মহাযোগী শঙ্কর তখন তাঁদের বললেন, যদি আমার এই লিঙ্গের উপর তোমাদের এত রাগ, তবে তা উৎপাটনই করি।" এই বলে ভগবান শঙ্কর নিজ লিঙ্গ উৎপাটন করলেন। মহাদেব লিঙ্গ উৎপাটনের পরমুহূর্তে অদৃশ্য হলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল প্রচণ্ড প্রকৃতিক তাণ্ডব। পৃথিবী কাঁপতে লাগল, চন্দ্র-সূর্যের প্রভা হল মলিন। এমন সময় অত্রিমুনির স্ত্রী পতিব্রতা অনসূয়া স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্ন দেখে তিনি ভীত হয়ে ঋষিদের জানালেন, "আমরা এইমাত্র যাঁকে দেখেছি তিনি নিশ্চয়ই ভগবান

BanglaBook.org

মহেশ্বর। লীলার ছলে তিনি আমাদের কোনও শিক্ষা দান করতে এসেছিলেন।'

অনসূয়ার কথায় ভয় পেলেন ঋষিরা। তাঁরা দ্রুত চললেন কমলযোনি ব্রহ্মার কাছে বৃদ্ধ পিতামহ ব্রহ্মা নিশ্চয়ই সুপরামর্শ দেবেন। সমস্ত ঘটনা শুনে ব্রহ্মা বললেন, 'হে ঋষিগণ, দেবদারু বনের মতো পবিত্রস্থানে তপস্যা করেও তোমরা হরি ও হরের লীলাকে বুঝলে না। তোমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তাঁরা দেবদারু বনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তোমরা তাঁদের অসম্মান করেছো। এখন তোমরা শঙ্করকে তপস্যায় তুষ্ট করো।"

ব্রহ্মার কথা মতো দেবদারু বনের ঋষিরা দেবাদিদেবের তপস্যায় মগ্ন হলেন। বহুকাল তপস্যা করার পর দেবাদিদেব তুষ্ট হয়ে তাঁদের দর্শন দিলেন এবং বললেন, 'হে ঋষিগণ, স্ত্রীদের নিয়ে তপস্যা করার ফলে তোমাদের সাধনা কামানুযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যাগযজ্ঞের দিকে বেশি মনোযোগী হয়েছো। ফলে জ্ঞানমার্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে সকাম কর্ম গ্রহণ করেছে। এই সকাম কর্ম তোমরা ত্যাগ করো। এই দেবদারু বনে আমি আমার মহালিঙ্গকে উৎপাটিত করেছি। এই স্থানে তোমরা শিবলিঙ্গ পূজা করলে যথার্থ ফললাভ করবে।' এই বলে শিব অদৃশ্য হলেন। আর সেই থেকে শিবলিঙ্গের আরাধনা শুরু হল।

চার

মহাদেবের অপর নাম শঙ্কর। যিনি সকলের 'শং' অর্থাৎ মঙ্গল বিধান করেন তিনিই শঙ্কর। লিঙ্গ পুরাণের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে রুদ্ররূপী শিব কিভাবে মঙ্গল বিধায়ক শঙ্করে রূপান্তরিত হলেন। ব্রহ্মা মহাদেবকে প্রজা সৃষ্টির জন্য অনুরোধ করায় মহাদেব নীললোহিত রূপে সতীকে ধ্যানে স্মরণ করেই সর্বলোকে মন থেকে আত্মতুল্য বহু রুদ্র সৃজন করলেন। নীললোহিতের সৃষ্ট রুদ্রগণ চতুর্দ্দশ ভুবন আচ্ছাদিত করল। রুদ্র কর্তৃক সৃষ্ট রুদ্রগণ হল অমর, তাদের জন্ম হল কিন্তু মৃত্যু হল না। পিতামহ ব্রহ্মা দেখলেন জগৎ পরিপালনের জন্য মরণশীল জীব সৃষ্টির প্রয়োজন। তিনি রুদ্ররূপী শিবের কাছে প্রণিপাত হয়ে বললেন, হে দেব, অমর প্রজা সৃজন করা উচিত হচ্ছে না। প্রভু, আপনি মৃত্যুযুক্ত প্রজাসৃষ্টি করুন।' ব্রহ্মার অনুরোধ শুনে মহাদেব বললেন, "হে পিতামহ, আমার নিয়ম মরণশীল নয়। মরণশীল জীবের ইচ্ছা করলে তুমিই ইচ্ছামত জড়া মরণযুক্ত প্রজা সৃজন কর। চতুরানন ব্রহ্মা, শঙ্করের আজ্ঞা পেয়ে তারা মরণ সংযুক্ত সমুদয় চরাচর জগৎ সৃষ্টি করলেন। চতুরানন ব্রহ্মাকে প্রজাসৃষ্টি করতে দেখে রুদ্রদেব সৃষ্টি বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকলেন। এইজন্য আত্মস্বরূপী মহাত্মা শম্ভু শঙ্কর স্থাণুনামে অভিহিত

BanglaBook.org

হন। যেহেতু পরামাত্মা রুদ্র, কৃপা করে অনায়াসে সর্বভূতের 'শং' সম্পাদন করেন এইজন্য তিনি শঙ্কর। শঙ্কররূপী শিব যোগবিদ্যার মাধ্যমে সংসারবিরাগীদের 'শং' বা মুক্তি দান করেন। সমস্ত জীবই ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য শঙ্করের প্রসাদেই লাভ করে। যাঁরা শঙ্করের আশ্রিত, তারা সকলে অবশ্যই মুক্ত হবে সন্দেহ নেই। শঙ্করের প্রতি শরণাগতি জীব, আশ্রিত জীব, তাঁরা পাপিষ্ঠ হলেও ভয়াবহ নরকে গমন করে না। শঙ্করাশ্রীত শাশ্বত পাদ প্রাপ্ত হন। লিঙ্গপুরাণ অনুসারে শঙ্কর সর্বভূতের আশ্রয়, অব্যয়, জগতের পতি। তিনি পরমাত্মা, পুরুষ পুরুহূত, পুরুষ্টত। শিব, তমোগুণযুগে কালাগ্নি রুদ্র নামে রতোত্তর্ণ যুগে হিরণ্যগতি নামে, শতগুণ যুগে সর্বত্রগামী বিষ্ণুনামে এবং গুণাতীতভাবে মহেশ্বর নামে কীর্ত্তিত।

মহাদেবের এক এক রূপের ধ্যান, দেহের বিভিন্ন অংশের জন্য নির্দিষ্ট। কোটি বজ্রপ্রভা মণ্ডিত স্থানে, পদ্মরাগমণির মতো কান্তিময় শীতল স্থানে, নীল ও লোহিতের বর্ণময় প্রদেশ রূপে যোগী পুরুষের ধ্যান অভ্যাস করবে। মহেশ্বরকে হৃদয়ে ধ্যান করবে। নাভিপদ্মে সদাশিবকে ললাটে চন্দ্রচূড়কে ধ্যান করবে, ভ্রূমধ্যে স্বয়ং শঙ্করের ধ্যান, দিব্য ও শাশ্বত স্থানে শিবধ্যানে করতে হয়। যিনি কারও স্বরূপ নন, যাঁকে কেউ নির্দেশ করতে পারে না, যে পুরুষ বিনাশ ও উৎপত্তি বর্জিত। যিনি কৈবল্য, নির্বাণ ও অনুপম নিশ্রেয়স স্বরূপ। যিনি অমৃত যাঁর কোনকালে ক্ষরণ হয় না। যোগীগণ যাঁকে মহানন্দ, পরানন্দ, যোগানন্দ ও অন্যময় বলে নির্দেশ করেন, সেই জ্ঞানময়, নির্মল, নিষ্কল, শান্ত অন্যরূপী পরম ব্রহ্ম স্বরূপ শিবকে হৃৎপদ্মে বা মনে মনে চিন্তা করবে।

পুরাকালে বারাণসীতে দেবী উমা মহেশ্বরকে প্রশ্ন করলেন, "হে মহাদেব! কি উপায়ে লোক তোমাকে বশ করতে পারে, কি উপায়ে তুমি পূজনীয় হও, তপস্যা, বিদ্যা বা যোগ এই গুলোর মাধ্যমে তুমি কি দর্শন দান কর, আজ প্রভু তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।" পার্বতীর প্রশ্ন শুনে বালেন্দু তিলকধারী শিব পূর্ণচন্দ্রবদনা দেবীকে বললেন, হে দেবি! হে আমার হৃদয় বিলাসীনী। আজ তুমি আমাকে যে বিষয়ে প্রশ্ন করলে সেই প্রশ্ন পিতামহ ব্রহ্মাও বহু আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। হে শুভে! লোক পিতামহ ব্রহ্মা, শ্বেতকল্পে শ্বেতবর্ণ সদ্যোজাত পরমব্রহ্মরূপী আমাকে দর্শন করে, পীতকল্পে পীতবর্ণ তৎ পুরুষরূপী আমাকে দর্শন করে অঘোর কল্পে কৃষ্ণবর্ণ ঈশ্বর দর্শন করে আমার স্তব বন্দনা গান করলেন। তিনি বললেন, 'হে বামদেব, হে সদ্যোজাত মহেশ্বর! হে অঘোর, হে মহেশ্বর, আজ আমি তোমাকে দর্শন করে ধন্য হলাম। হে মহাদেব, এই পূণ্য লগ্নে আপনি আমাকে বলুন, কি উপায়ে আপনি বশ্য ও ধ্যেয় হবেন আপনি ভিন্ন আমার জিজ্ঞাসার উত্তর আর কারো পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়।'—ব্রহ্মার এই প্রশ্ন

BanglaBook.org

ও স্তব শুনে আমি তাঁকে বললাম, হে বারিতসম্ভব (অর্থাৎ জল থেকে যিনি উৎপন্ন) আমি অপনার প্রশ্নের উত্তরে আপনাকে জানাচ্ছি যাঁর শ্রদ্ধা আছে তিনিই আমাকে বশ করতে পারবেন। ভগবান বিষ্ণু জলে অবস্থান করে আমার ধ্যান করেন, আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ পঞ্চমন্ত্রের মাধ্যমে আমাকে পূজা করে। হে, জগতগুরু, আমার প্রতি তোমার ভক্তি আছে বলেই আজ তুমি আমাকে দর্শন করলে।'—হে গিরিসুতে, স্বয়ং ব্রহ্মাকে আমি আমাকে বশ করার উপায় বর্ণনা করেছিলাম। সুতরাং তুমি জানবে, যাঁর শ্রদ্ধা আছে, তিনিই আমাকে বশ ও দর্শন করার যোগ্যা হন। ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধা সহকারে সর্বদা লিঙ্গরূপী আমাকে পূজা করেন। শ্রদ্ধাই পরম সূক্ষ্ম ধর্ম, শ্রদ্ধাই জ্ঞান, তপ ও হবনীয় দ্রব্য, শ্রদ্ধাই স্বর্গ ও মোক্ষ। তাই আমি তাঁর কাছেই উপস্থিত হই যে শ্রদ্ধা সহকারে আমার পূজা করে।'

বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে শিব পার্বতীর যে কাহিনি ব্যক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে আমরা যেমন পার্বতীকে শিব পত্নীরূপে দেখি ঠিক তেমনই বিভিন্ন কাহিনির মধ্য দিয়ে পার্বতী বা কৈলাস নন্দিনী উমা শিব ভক্তরূপে প্রকটিত। একান্ত অনুগত ভক্তের মতো তিনি নানা অধ্যাত্মবিষয়ের উপর প্রশ্ন করে চলেছেন। শিব গুরু রূপে তাঁর উত্তরদাতা। এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে গুরুগীতা। যে পর্যায়ে পার্বতী শিবের কাছে গুরুতত্ত্ব গ্রহণে উৎসুক। শিবের মুখে উচ্চারিত গুরু-মহিমা নিয়েই গুরুগীতা। পণ্ডিতদের মতে ভারতবর্ষে ধর্মক্ষেত্রে তন্ত্র সাধনার প্রভাবের ফলে শিব ও পার্বতীর এইরকম গুরু শিষ্যরূপটি ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ তন্ত্রের আধিক্যকালে তার কিন্তু কিছু ভাব পুরাণের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে।

লিঙ্গপুরাণ উক্ত বর্ণনা থেকে শিব লাভ করার একটি মাত্র পথকে নির্দেশ করা হয়েছে, তা হল শ্রদ্ধা। কিন্তু এর সঙ্গেই লিঙ্গ পুরাণের মধ্যে একটি সৃষ্টি চিত্রকেও তুলে ধরা হয়েছে, তা হল শ্রদ্ধা। রঙের সঙ্গে অধ্যাত্মদর্শনের যেন নিবিড় সম্পর্ক। রক্তরঙ লাল রজগুণের প্রতীক, সাদা সত্ত্বগুণের। শিব মহিমার বর্ণনায় দেখি ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হয়ে শিব এক এক কল্পে এক একরূপে ব্রহ্মাপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথমে ব্রহ্মা পুত্রকামনা করলে রক্তভূষণ নামে এক মহাতেজা কুমার আবির্ভূত হল। যাঁর কণ্ঠে রক্তমাল্য উত্তরীয় রক্তবস্ত্র নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ। অতিশয় প্রভাবশালী জগৎসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা, রক্তবাসা এই কুমারের রূপ অনুযায়ী চলমান কল্পটির নাম দিলেন রক্ত কল্প। সেই বামদেব কুমার ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বললেন, হে পিতামহ! যেহেতু তুমি পুত্রকামনায় আমার ধ্যান করেছ, সেই হেতু তুমি আমার দর্শন লাভ করলে। প্রতিকল্পে অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমার ধ্যান করবে।

BanglaBook.org

রক্তবর্ণ এই কুমার থেকে ব্রহ্মার অনুরোধে আরও চার কুমারের সৃষ্টি হল, এঁদের নাম বিরজু, বিবাহু, বিশোক ও বিশ্বভাবন। এঁরা প্রত্যেকেই অধ্যবসায়ী, এঁদের পরিধানে রক্তবস্ত্র গলায় রক্তমাল্য, গাত্রে রক্তকুঙ্কুম ও রক্তভস্মের অনুলেপন। সহস্র বছর ধরে এঁরা জগতে মন্ত্র চিন্তা পরায়ণ অর্থাৎ শিবভক্তদের অনুগ্রহ করে শিষ্টদের হিতের জন্য তাঁদের অখিল ধর্মের উপদেশ দিয়ে ব্রহ্মার প্রীতিকর হয়েছিলেন। তারপরে তাঁরা আবার অব্যয় রুদ্র মহাদেবের মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন।

রক্তকল্পের পরবর্তী কল্প হল পীতবাসা। সে কল্পে মহাভাগ ব্রহ্মা পীতবাসা হয়েছিলেন। এবং দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে পুত্র ভিক্ষা চাইলেন। ব্রহ্মা সন্তান কামনা করলে, "ধ্যানশীল পুত্রকামী ব্রহ্মার পীতবস্ত্রধারক মহাতেজা কুমার জন্মগ্রহণ করল। তাঁর অঙ্গ প্রীতগন্ধে অনুলিপ্ত; পীতমাল্যে ও পীত উত্তরীয় বসনে সুশোভিত। তিনি যুবক তাঁর অঙ্গে সুবর্ণময় যজ্ঞোপবীত। পীতবর্ণে উষ্ণীষধারী মহাভূজা। এই পীতবাসা কুমার দর্শন করে ব্রহ্মা মহেশ্বরের স্তবগান করতে করতে তাঁর শরণাপন্ন হলেন। সেই সময় ধ্যানগর ব্রহ্মা মহেশ্বরের মুখ নিঃসৃত মাহেশ্বরী গো' দর্শন করলেন। এই মহাশ্বেরীকে মাতা, চতুষ্পদা, চতুর্বক্তা, চতুর্হস্তা, চতুর্নেত্রা, চতুঃরাঙ্গী, চতুর্দংষ্ট্রা, চতুর্মুখী এবং দুই শতত্রিশটি সর্বগুণ ভূষিতা। এই মহাদেবী মহেশ্বরী মহাদেবকে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, 'এই জগতের নাম আপনি যোগের মাধ্যমে বিশ্বকে আবৃত করে সমস্ত জাতিকে বশে নিয়ে আসুন। 'দেবস্বামী মহেশ্বর মহাদেবীকে উত্তর দিলেন 'হে দেবী! এই পীতবাসা কল্পে তুমি রুদ্রাণী রূপে আমার পাশে থাকবে। ব্রাহ্মণদের হিতার্থে তুমি তাঁদের কাছে মোক্ষরূপা হবে। মহেশ্বর ও মহেশ্বরীর এরূপ লীলা দর্শন করে ব্রহ্মা মুগ্ধ হলেন। 'গোমাতা' রূপে দেবীকে দর্শন লাভের জন্য মহেশ্বর তাঁকে দিব্যযোগ ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, সম্মত্তি ও বৈরাগ্য দান করলেন। মহেশ্বরের কৃপায় এই কল্পেও বহু পীতবাসা কুমারের জন্ম হল এবং তাঁরা জগতে ব্রাহ্মণ ও মুনিগণের হিতার্থে মহাযোগের শিক্ষাদান করে আবার মহেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হলেন।

পীতবর্ণ কল্পগত হলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আবার পৃথক একটি কল্প নির্মাণে উৎসুক হলেন। দিব্যসহস্রবছর তাঁর একাকী কেটেছে। এইবার সৃজনের প্রয়োজন। একাকী ব্রহ্মা দুঃখিত মনে একটি পুত্র চিন্তা করতে লাগলেন। তার চিন্তনশীল হৃদয় থেকে কালীধ্যান পরায়ণ এক কৃষ্ণবর্ণ পুত্র জন্মগ্রহণ করল। মহাতেজা ব্রহ্মা কুমার দর্শন করলেন। সেই কুমার কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত বলবান, তাঁর তেজদীপ্ত চারিদিক আলো করে রয়েছে। তাঁর পরিধানে কৃষ্ণবসন, মাথায় কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণীষ। তিনি কৃষ্ণ যজ্ঞোপতীধারী, কৃষ্ণমালা ও কৃষ্ণচন্দনে অনুলিপ্ত। এই কৃষ্ণবর্ণ পুত্রের জন্য এই কল্পের নাম হল অসিতকল্প। এই কল্পেও কৃষ্ণবর্ণ কুমারের থেকে আরও চারটি

BanglaBook.org

কুমার উৎপন্ন হলেন এবং সেই কুমার চতুষ্টয় সহস্র বছর ধরে মহেশ্বরের উপাসনা করলেন এবং শিষ্যদের মহাযোগ প্রদান করলেন, আবার সহস্র বছর পরে দেবাদিদেব মহাদেবের শরীরে লীন হয়ে গেলেন।

লিঙ্গপুরাণের মধ্যে এইভাবে কল্পের বিভাগ করে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক তেমনই সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের আদি কারণরূপে দেবাদিদেব মহাদেবকেই দেবতাত্রয়ের মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছে।

আপনি দিগম্বর, কৃতান্ত, ত্রিশূলী, সুন্দর, করাল, করালবদন, গজানন-মস্তকানন্দকারী, রুদ্র, যজ্ঞমানরূপী, সবদেবনমস্কৃত, প্রণতাত্মা, নীলজটাজুটধারী, শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ, চিতা-ভস্মশোভিত দেহ, দেব! আপনাকে নমস্কার। তুমি দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা, রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিত, সর্ব্বভূতের আত্মা, তুমিই সাংখ্যে উক্ত পুরুষ, পর্বত মধ্যে সুমেরু, নক্ষত্রগণমধ্যে চন্দ্র, ঋষিগণ মধ্যে বশিষ্ঠ, দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র ও বেদগণ মধ্যে ওঁঙ্কার; তুমি সামগীত মধ্যে শ্রেষ্ঠ সামগান। হে পরমেশ্বর! তুমি আরণ্য-পশু মধ্যে সিংহ, গ্রাম্য পশু মধ্যে বৃষ; আপনি লোক পূজিত ভগবান, আপনি সর্বত্র বর্তমান থাকলেও যে যে রূপ অবলম্বন করবেন, আমরা ব্রহ্মোক্ত বাক্যানুসারে সেই রূপেতেই আপনাকে দেখিতে পাইব। হে দেব, আপনি সংযতাত্মা, মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হলে আপনি ললাটে হস্তার্পণ করে অগ্নি উৎপাদন করেন। দহনকালে আপনিই আমাদের পরিত্রাতা। হে মহেশ্বর! মহাভাগ্য প্রভো। হে শুভদর্শিন! আপনি লোকহিতের জন্য সোমরূপে ভূতগণকে শীতল করেন। হে দেব আপনাকে নমস্কার!"—লিঙ্গপুরাণে উল্লিখিত এই স্তবগাথাটি বন্দিত হয়েছিল দেবদারু বনের ব্রাহ্মণকুলের কণ্ঠে। স্তব শুধুই স্তবগাথা নয়, এর মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে একটি সমাজচিত্র।

ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাসের পাশাপাশি বয়ে চলেছে সামাজিক ইতিহাস। সমাজে যখন নানা ক্লেদ দেখা দেয়। মানুষের ভাবনায়, চিন্তনে আসে বিকৃতি, তখন সমাজস্থিত মানবই সহজেই নিজেদের ক্রিয়াকর্মগুলির একটি আধ্যাত্মিক ব্যখ্যা খোঁজে, তখনই তাঁরা দেবতার গুণগানে মানব চরিত্রে সীমাবদ্ধতাকে প্রতিস্থাপন করে। এই ভাবস্থাপনা নিয়েই গড়ে ওঠে নতুন পৌরাণিক কাহিনি, লোককথা। লিঙ্গপুরাণে দেবাদিদেব মহাদেবের দেবদারু বনে গমন এবং সেখানে দেবচরিত্রের কার্যকলাপের পিছনে পিতামহ ব্রহ্মার মুক্তি। বিভিন্ন কাহিনির সমাবেশ আমাদের মনে একটি অস্থির সমাজচিত্রকে তুলে ধরে, সে সমাজ মন খুঁজতে চাইছে একটি ভিত্তি, স্থায়ী ভাব।

মহাদেবের দেবদারু বনে গমনের কাহিনি বহু পুরাণেই উল্লিখিত হয়েছে। কারণ লিঙ্গ পুরাণের ক্ষেত্রে এই কাহিনি ভিন্নরূপে বর্ণিত হয়েছে। লিঙ্গপুরাণে এই

BanglaBook.org

মূল কাহিনির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কিছু উপকাহিনি, যা প্রক্ষিপ্ত ও সমাজের বিকৃতিকে একটি শাস্ত্রগত ব্যাখ্যায় পরিণত করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাহিনিটি সংক্ষেপে এইরকম।

পুরাকালে তপশ্চিন্তারত দেবদারু-বনবাসী মুনিদের বনে মহাদেব বিকৃতরূপে প্রবেশ করেছিলেন। সস্ত্রীক, সপুত্র ও সাগ্নিক মুনিগণ মহাদেবেই সন্তোষবিধানের জন্য নিদারুণ তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। মুনিদের তপস্যায় ধূর্জটি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। দারুবনবাসি মুনিগণ শ্রদ্ধাসহকারে সকাম ধর্ম আচরণ করছেন কিনা, সকৌতুকে তা পরীক্ষার জন্য বিকৃতরূপ ধারণ করে দেবদারুবনে উপস্থিত হলেন। কেবল তাই নয়, লিঙ্গপুরাণ অনুযায়ী মুনিদের তপস্যার সকাম রূপটি উন্মোচন করে, তাকে নিষ্কাম তপস্যায় পর্যবসিত করার জন্যেই মহাদেব বিকৃতরূপ ধারণ করেছিলেন।

ভগবান শঙ্কর বিকৃত রূপ ধারণ করে অর্থাৎ, দিগম্বর, বিষমলোচন, সুন্দর, দ্বিহস্ত, কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে দিব্যদারুবনে প্রবেশ করলেন। পরম সুন্দরাকৃতি ভগবান মহাদেব সুমন্দ হাস্য সহকারে রমণীদের কামোদ্দীপক ভ্রূবিলাস প্রদর্শন ও সঙ্গীত করলেন। পতিব্রতা নারীকুলও বনমধ্যে বিকৃতরূপধারী পুরুষরূপী মহাদেবকে দর্শন করে তাঁকেই হৃষ্টচিত্তে অনুগমন করল। রমণীগণ দেবাদিবের রূপ দর্শন করে গলিতবস্ত্র ও মদোন্মত্ত হয়ে নানা ভ্রূবিলাস প্রকটিত করতে লাগলেন। উন্মাদ প্রায় রমণীকুল, কখনও গান গায়, কখনও পরস্পরের সঙ্গে চটুলবাক্যে কথা বলে, কেউ বা পুরুষরূপী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? কোথায় যাচ্ছেন? আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।'—মহাদেব নারীদের এই বিকৃত অবস্থা দেখেও কিছু বললেন না। নারীরা স্বামীদের সম্মুখেই দ্বীচারিনি হল।

শঙ্কর মৌন বা নির্লিপ্ত থাকলেও স্ত্রীদের এই অস্বাভাবিক আচরণে স্বামীরা খুবই রুষ্ট হলেন। মহাদেবের জন্য তপস্যার দৃঢ়তা ভঙ্গ হল। তাঁরা পরস্পর ক্রুদ্ধ হয়ে পুরুষরূপী মহাদেব ও বিকৃতভঙ্গী নারীদের কাছে এলেন। শঙ্করকে চিনতে না পেরে তাঁরা স্ত্রীদের আগে দেবাদিদেবকেই নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করতে আরম্ভ করল। শৈব মায়ামুগ্ধ মুণিগণ ভগবান শঙ্করকে জানতে না পেরে কঠোর বাক্য বলতে শুরু করলেন। মহাদেবের প্রতি দুষ্ট আচরণে তাঁদের তপস্যালব্ধ ফল একমুহূর্তে শূন্যে পর্যবসিত হল। কথিত আছে ব্রহ্মার বহুমঙ্গলকর যজ্ঞ ও ঋষিশাপে বিনষ্ট হয়েছিল। ভৃগুমুনির অভিশাপে মহাবীর্য্যশালী বিষ্ণুও দশবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে সুখ দুঃখ ভোগ করেছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণদের মুখে অভিশম্পাত শুনে মহাদেব অন্তর্হিত হলেন, মহাদেবের অন্তর্দ্ধানের ফলে মুনিদের

BanglaBook.org

মনে চিন্তার উদ্রেক হল, ইনি কে? কোথা থেকে এলেন, কোথায় ই বা অন্তর্হিত হলেন। সেই দুর্বলচেতা মুনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা ধ্যান বলে মহাদেব শঙ্করের কার্যকলাপ জানতে পেরে মুনিদের বলতে লাগলেন, 'হে মুনিগণ, তোমাদের ধিক, তোমরা নিতান্ত ভাগ্যহীন, তোমরা তোমাদের সাধ্যবস্তুকে লাভ করেও তাঁর মর্ম বুঝতে পারলে না। তোমাদের জীবন বৃথা। তোমরা দারুবনে বিকৃত আকারধারী পুরুষকে দেখেছ তিনিই পরমেশ্বর হে ব্রাহ্মণগণ! অতিথি বিরূপ, সুরূপ, মলিন বা মূর্খ যাই হোন না কেন, গৃহস্থেরা কখনই তাঁকে ঘৃণা করবেন না। তোমরা অতিথির অসম্মান করেছ। হে ব্রাহ্মণগণ শোনো, আমি তোমাদের এক ঋষির কাহিনি ব্যক্ত করছি, যিনি অতিথি সেবার জন্য নিজ স্ত্রীকে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হননি—' এই বলে পিতামহ ব্রহ্মার মুখ দিয়ে লিঙ্গ, সুদর্শন মুনির কাহিনি করা বর্ণনা করেছে। শিব মহিমা প্রসঙ্গে এই কাহিনি অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক। তবু বিকৃত ভাবনাকে পুরাণ সমাজ থেকে নিজের পৃষ্ঠায় তুলে নিয়েছে। কি সেই কাহিনি? ব্রহ্মা দারুবনের মুনিদের বলেছিলেন,

পুরাকালে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ সুদর্শন মুনি অতিথি সেবার জন্য কালমৃত্যুকেই জয় করেছিলেন, পৃথিবীতে অতিথিসেবা ছাড়া গৃহস্থ ব্রাহ্মণদের আত্মশোধনের আর দ্বিতীয় উপায় নেই। সুদর্শন মুনি এই অতিথি সেবায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সুবিখ্যাত সুদর্শন মুনি গৃহস্থ হয়েও মৃত্যুকে জয় করবার জন্য নিজের ভার্য্যাকে বললেন, 'হে সুব্রতে, হে সুভগ্যে! যত্ন করে আমার কথা শোনো, তুমি কখনও গৃহে আগত অতিথিদের অপমান করো না। জানবে, সকল অতিথিই সাক্ষাৎ মহাদেব স্বরূপ, অতএব নিজেকে দান করেও অতিথি সেবা করবে।' পতিব্রতা নারী স্বামীর মুখে এই কথা শুনে সন্তপ্তা ও বিবশা হলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে সুদর্শন মুনিকে বললেন, 'হে প্রভু! এ আপনি কি বললেন, আমি নিজের আত্মাকে কিভাবে অতিথিসেবায় দান করব?' স্ত্রীর আকুতি শুনে সুদর্শন মুনি আবার বললেন, 'অতিথি স্বয়ং মহাদেব স্বরূপ। অতএব, হে আর্য্যে! শিবতুল্য কোনো অতিথিকে যে কোন বস্তুই দান করা উচিত। সুতরাং তুমি কোনো চিন্তা করো না। 'পতিব্রতা কামিনী স্বামীর আদেশ মালার ন্যায় গলায় ধারণ করে গৃহকর্ম করতে থাকলেন। সুদর্শন ব্রাহ্মণের ত্যাগ ও অতিথি সেবার তপস্যায় স্বয়ং ধর্মরাজের আসন টলল, তিনি সুদর্শন রাজাকে পরীক্ষা করবার জন্য নেমে এলেন ধরিত্রীতে। তিনি ব্রাহ্মণরূপে উপস্থিত হলেন সুদর্শন ব্রাহ্মণের গৃহে, সুদর্শন পত্নী তাঁকে যথাবিধি পূজা করলেন। ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম সুদর্শন পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে, আর্য্যে তোমার বুদ্ধিমান পতি সুদর্শন কোথায়? হে আর্য্যে! তিনি নেই?— ভালো হলো। আজ আমি আর অন্নাদি ভিক্ষা করব না। আজ আমি তোমাকেই

BanglaBook.org

চাই। ধর্মরূপী অতিথির কথা শুনে পতিআজ্ঞায় অবনত সুদর্শন পত্নী অতিথিকে নিজ আত্মা দান করার জন্য উৎসুক হলেন। ঠিক এই সময় সুদর্শন গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন, 'হে ভদ্রে, কোথায় গেলে? এখানে এস।'—সুদর্শনের কণ্ঠস্বর শুনে ব্রাহ্মণী নীরব রইলেন। উত্তর দিলেন ব্রাহ্মণ বেশী ধর্মরাজ। তিনি বললেন, 'হে মহাভাগ সুদর্শন। আমি তোমার পত্নীকে নিজের আনন্দলাভে আবদ্ধ রেখেছি।' ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর শুনে সুদর্শন নীরব রইলেন। কিছুক্ষণ পরে ধর্ম আবার ঘোষণা করলেন; 'হে সুদর্শন আমি তৃপ্ত।' মহামুনি সুদর্শন সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আপনি আমার স্ত্রীকে যথেচ্ছ ভোগ করুন। আমি চললাম।' সুদর্শন ব্রাহ্মণের এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরূপী ব্রাহ্মণ নিজরূপ ধারণ করলেন। মহাদ্যুতি ধর্মদেব, বাঞ্ছিত বর প্রদান করে বললেন, 'হে দ্বিজোত্তম! আমি তোমার সুশোভনা ভার্য্যাকে ভোগ করবার কল্পনাও করিনি। কেবল শ্রদ্ধা পরীক্ষা করবার জন্যেই আজ আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। হে সুব্রত, তুমি ধর্মবলে মৃত্যুকেও জয় করলে।—এই বলে ধর্মদেব স্বস্থানে গমন করলেন। অতিথিসেবার ফল ব্রাহ্মণ সুদর্শন হাতে হাতে পেলেন।'—এই কাহিনি বর্ণনা করে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদের বললেন, 'হে ভাগ্যবিহীন ব্রাহ্মণগণ, তোমরা অতিথিকে স্বয়ং শঙ্কররূপে ভাবতে পারনি, এমন কি চিনতেও পারনি। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! আর বহু বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নেই, তোমরা ভগবান শঙ্করেই শরণাগত হত।'

ব্রহ্মার কথা শুনে দারুবনের মুনিগণ চিন্তিত ও ব্যথিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা বললেন, 'হে পিতামহ, আমরা আমাদের স্ত্রীকুলকে বিকৃতাবস্থায় দেখে কটু কথা অগ্রাহ্য করতে পারিনি। আমরা দেবাদিদেব শঙ্করকেও কটুকথায় আপ্যায়ন করেছি। এখন এই কাজের প্রায়শ্চিত্ত কি করে করব তার উপায় বর্ণনা করুন।' ব্রাহ্মণদের মিনতি শুনে ব্রহ্মা বললেন, 'শঙ্কর মহাদেবকে সন্তুষ্ট করার উপায় হল অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের মাধ্যমে পরমাত্মাস্বরূপ যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের অগ্নিতে পূজা। এই যজ্ঞের পার দ্বাদশবর্ষ, এক বর্ষ, বা দ্বাদশপায় বা দ্বাদশ দিন দুধমাত্র পান করে শান্ত ও সংযত হয়ে দেবতাদের পূজা করতে হবে। এই পূজার পরে যজ্ঞীয় পাত্রগুলি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে মাটির পাত্র জলে নিক্ষেপ করে, তৈজসাদি গুরুকে দান করে কিছুদিনের সংকল্প করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃত রুদ্র ভক্তের যদিও যজ্ঞ, দান, হোম, বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন বা বেদপাঠের কোনো আবশ্যকতা নেই। কেবল ভক্তিই শিবসাযুজ্য লাভ করাতে পারে। তবু প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই ব্রত পালন আবশ্যক।—ব্রহ্মার এই উপদেশ শুনে দারুবনের ব্রহ্মণগণ নিজ কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ঔৎসুক হলেন। তাঁরা যজ্ঞাদির আয়োজন করতে আবার দারুবনে ফিরে গেলেন। দারুবনের মুনিদের অতিথি সংস্কারের

BanglaBook.org

উপমারূপে সুদর্শন মুনির কাহিনি শুনিয়েছেন ব্রহ্মা। এছাড়াও শিব সাধনায় ভক্তিই সার,—এই তত্ত্বের জয়গানে বৃদ্ধতম শ্বেতনামা এক মুনির কাহিনি ব্যক্ত করেছেন, ব্রহ্মা বলছেন, 'হে দ্বিজগণ! বৃদ্ধতম শ্রীমান শ্বেতনামা মহামুনি 'নমস্তে রুদ্রমন্যবে' এই মন্ত্রে রুদ্ররূপী শিবের পূজা করতেন। এই মন্ত্রে পূজা করে তিনি মহাদেবকে তুষ্ট করেছিলেন। তারপর একদিন মহাতেজা যমরাজ শ্বেতমুনির মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে—এটা মনে করে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। শ্বেতমুনি সম্মুখে সাক্ষাৎ কাল কে দেখে যশস্বী পুষ্টিবর্দ্ধন মহাদেবের পূজা করলেন। মৃত্যুকালে শিব পূজায় রত শ্বেতমুনিকে যমরাজ ব্যঙ্গ করে বললেন, 'হে দ্বিজোত্তম, এবার তুমি আমার কাছে এস। এখন আর শিবপূজায় তোমার কোন ফল হবে না। আমি যাঁকে অধিকার করেছি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর, কেউ তাঁকে পরিত্রাণ করতে সমর্থ হবেন না। এ বিষয়ে আমিই প্রভু, যাকে ক্ষণকালমধ্যে যমালয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছি, তাঁর রুদ্রারাধনায় কি হবে? হে মুনি! তোমার 'মৃত্যুকাল' উপস্থিত হয়েছে, সেই কারণেই তোমাকে আজ আমি গ্রহণ করতে উপস্থিত হয়েছি।'

মুনিসত্তম শ্বেত যমরাজের এই ভয়ঙ্কর বাক্য শুনে, হা রুদ্র! হা মহাদেব!—এই বলে বিলাপ করতে শুরু করলেন। শ্বেত মুনি নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে সজল ও সন্ত্রান্ত লোচনে যমরাজকে দেখতে দেখতে বললেন—যদি আমার ইষ্ট স্বামী মঙ্গলময় দেবদেব বৃষধ্বজ রুদ্র এই লিঙ্গে বর্তমান থাকেন, তা হলে কাল! তুমি কি করতে পার? হে মহাভাগে, শিব অনুরাগীদের প্রতি তুমি এরূপ ব্যবহার করতে পারে না। মুনির কথা শুনে পাপাধারী ভয়ঙ্কর যম, সিংহনাদ করে বলে উঠলেন, 'তাই বুঝি, মৃত্যুর ক্ষণকে বদলে দিতে পারে—রুদ্রদেবের এমন শক্তি আছে নাকি! এই আমি তোমাকে বাঁধলাম। দেখি দেব দেব রুদ্র তোমায় কি করে রক্ষা করেন। এখন কোথায় শিব, কোথায় বা তাদৃশ্য ভক্তির ফল? হে শ্বেত মুনি তোমার পূজা বা পূজার ফলই বা কোথায়, আর আমিই বা কোথায়? হে শ্বেত, আমার কি ভয় আছে? আমি তোমাকে বদ্ধ করেছি।'

যমরাজের উদ্ধত আচরণ ও ভক্তের প্রতি ইষ্টের নিন্দাবাক্য বর্ষণে শিবের আসন টলল, তিনি তাঁর অনুচর ও পার্বতীকে নিয়ে ভক্তকে রক্ষা করতে শিব লিঙ্গের মধ্যে প্রকটিত হলেন। শিবলিঙ্গের মধ্য থেকে স্বয়ং মহাদেবকে নির্গত হতে দেখে কালান্ত যমরাজও ভীত হলেন, তিনি সপার্ষদ রুদ্রদেবকে বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারলেন না, শ্বেতমুনির পাশে চৈতন্য হারিয়ে পড়ে রইলেন। হঠাৎ ইষ্ট দেবতার দর্শনে শ্বেতমুনি উচ্চঃস্বরে শিব বন্দনায় মত্ত হলেন। মহাদেব শ্বেতমুনিকে অনুগ্রহ করে আবার লিঙ্গ মধ্যে বিলীন হলেন। এই কাহিনি বর্ণনা করে মহামতি ব্রহ্মা দারুবনের ব্রাহ্মণদের উপদেশ দিলেন, 'হে মুনি সত্তমগণ! জ্ঞান, তপস্যা,

BanglaBook.org

বিদ্যা, যজ্ঞ, হোম, ব্রত, বেদাধ্যয়ন, যোগশাস্ত্র আলোচনা বা ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে ভক্তি উৎপন্ন হয় না। কেবল শিবের প্রতি ভক্তিই কারুণিক মহাদেবকে তুষ্ট করে। দেবাদিদেবের প্রতি ভক্তির একমাত্র পথ হল চিত্তের প্রসন্নতা। এই ভক্তিকে ব্রহ্মা পাশুপাতী ভক্তিরূপে চিহ্নিত করেছেন।

পিতামহ ব্রহ্মার কাছে শিব মাহাত্ম্য শুনে দারুবনের মুনিরা রজত, প্রস্তর, তাম্র দিয়ে নির্মিত লিঙ্গরূপী মহাদেবকে পূজা করতে লাগলেন। দারুবনের মুনিরা যে স্তবমন্ত্রে মহাদেবের বন্দনা করেছিলেন সেই স্তবে দেবাদিদেবকে বলেছিলেন, "হে মহাদেব! আপনার বিচিত্র, গুহ্য, দুর্ব্বোধ্য চরিত ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অজ্ঞেয়। হে বিশ্বেশ্বর মহাদেব! আপনার গম্য-অগম্য পথে আমরা কিছুই জানিনা; আপনি যাই হোন, আপনাকে নমস্কার; মহাত্মা ব্যক্তিরা দেবদেব মহাদেব আপনাকে স্তব করে। আপনি দিগম্বর, কৃতান্ত, ত্রিশূলী, সুন্দর, করাল, করালবদন, গজাননমস্তক আনন্দকারী রুদ্র যজ্ঞ মানবরূপী, সর্বদেব নমস্কৃত, প্রণতাত্মা, নীলজটাজূটধারী, শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ, চিতাভস্ম শোভিত দেহ, দেব। আপনাকে নমস্কার। আপনি সংযত্মা, মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত ভগবান মহেশ্বর, মুনিদের স্তব শুনে সন্তোষলাভ করে তাঁদের দর্শন দিয়ে বললেন, 'দারুবনের ঋষিগণ তোমাদের কীর্ত্তিত এই স্তব যে পাঠ করবে, যে শুনবে, বা যে ব্রাহ্মণকে শ্রবণ করবে, সেই ব্রাহ্মণ, গণপত্যপদে প্রাপ্ত হবেন। হে মুনিসত্তমগণ! তোমরা আমার ভক্ত। তোমাদের হিতের জন্য পুণ্য কথা বলছি শোনো। সমস্ত স্ত্রীলিঙ্গ আমার দেহউৎপন্ন প্রকৃতি দেবীস্বরূপ। সমস্ত পুংলিঙ্গ আমার দেহসমুদ্ভব পুরুষ স্বরূপ। নারী ও পুরুষের মাধ্যমেই সৃষ্টি করে থাকি। যে ব্রাহ্মণেরা ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর, যাঁরা ব্রতচারী, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যান—পরায়ণ, শিবভক্ত উর্দ্ধরেতা হয়ে সংযত বাক্য এবং মনের মাধ্যমে মহাদেবের অর্চনা করেন, তাঁরা চিরকালের জন্যে রুদ্রলোকে গমন করেন।' মহাদেবের আশীর্ব্বাণী শুনে দারুবনের মুনিরা শঙ্করকে বললেন, যিনি সুরচিত বিচিত্র কুণ্ডল, উৎকৃষ্ট মাল্য ধারণ ও ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করছেন, সেই অতি যশস্বী শঙ্করকে নমস্কার!

দেবাদিদেব মহাদেবের ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গ এবং প্রায় নগ্নরূপ সন্ন্যাস সমাজে প্রসিদ্ধ। কিন্তু কেন এই ভস্মলেপন, লিঙ্গপুরাণের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, দারুবনের ঋষিদের বরদানের ফলে সমস্ত ঋষিসমাজে একটি আনন্দের বাতাবরণ সৃষ্টি হল। ভৃগু, অঙ্গিরা, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, সুকেশ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরীচি, কশ্যপ, কণ্ব, প্রভৃতি মহাতপা ঋষিগণ নীললোহিত শঙ্করের পাদমূলে উপস্থিত হলেন। দেবাদিদেবকে যথাযথ প্রণাম নিবেদন করে তাঁরা বললেন, 'হে

BanglaBook.org

প্রভু, কি রূপে ভস্মের মাধ্যমে দেহ পবিত্র হয়, নগ্নত্ব কয় প্রকার? এই প্রশ্ন জানতে ইচ্ছা হয়। আপনি আমাদের দয়া করে এ প্রসঙ্গে কিছু বলুন।

ঋষিদের প্রশ্ন শুনে মহাদেব বললেন, ভস্ম ভক্ষণ করলে শোভা বৃদ্ধি হয়, শুভ ভাবনা উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বপাপ ভস্মীভূত হয়। এর জন্যই এই বস্তুর নাম ভস্ম। ঋষিগণ তোমরা জানবে, অগ্নি ও সোম-দুইই আমার আরেক রূপ। অগ্নি স্থাবর জঙ্গমকে বারংবার দগ্ধ করেছে পবিত্র করেছে। যে ব্যক্তি অগ্নির উপাসনা করে তিলক সেবা করবে, সে ব্যক্তি আমার ভস্মের প্রভাবে সকল পাপ থেকে বিমুক্ত হবে। আমি অতি তেজস্বী অগ্নি এবং সোমদেব অম্বিকাস্বরূপা। অগ্নি স্বরূপ আমি এবং সোম এই উভয়েই সাক্ষাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি। হে মহাভাগ ঋষিগণ! এই জন্যই ভস্ম আমার বীর্য্য বলে বিখ্যাত। আমি শরীরের মাধ্যমে স্ববীর্য্য ধারণ করে অবস্থান করি। সেই জন্যে অশুভ স্থান এবং সূতিকাগৃহ ভস্মের মাধ্যমেই রক্ষিত হয়। ভস্মলেপনের মাধ্যমে বিশুদ্ধাত্মা জিত-ক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ আমার কাছে চিরকালের জন্য স্থান লাভ করে। পাশুপতব্রত, যোগশাস্ত্র এবং সাংখ্যশাস্ত্র আমাকর্তৃক নির্মিত হয়েছে। হে মুনিগণ এবার তোমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দান করব। এ জগতে লজ্জামোহ-ভয়াত্মক সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই আমি সৃজন করেছি। দেবতা, মুণিগণ এবং এই জগতের সমস্ত লোকই নগ্ন রূপে জন্মগ্রহণ করে। তোমরা নিশ্চিতভাবে জানবে, যাঁরা ইন্দ্রিয় জয় করতে অসমর্থ, তাঁরা বস্ত্রাচ্ছাদিত হলেও নগ্ন এবং যাঁরা ইন্দ্রিয় জয় করেছেন, তাঁরা বস্ত্রশূন্য হলেও অনগ্ন। অতএব বস্ত্র নগ্নতা বা অনগ্নতার কারণ নয়। ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, বৈরাগ্য, মান এবং অপমানে সমানজ্ঞান এই গুণগুলিই প্রকৃত আবরণ। মহাভারত ও পুরাণে আমরা দধীচী মুনির কাহিনি পাই। অসুর বধে নিজের অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি। লিঙ্গপুরাণের মধ্যে আমরা আরেক দধীচমুনির কাহিনি পাই, যে কাহিনির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তুষার ধবল চন্দ্রশেখর দেবাদিদেব। এক একটি পুরাণ, এক একটি দেবতার প্রাধান্য নিয়ে রচিত হয়েছে, লিঙ্গ পুরাণের মহাদেবের প্রাধান্য পুরাণের এই বৈশিষ্ট্যকেই অনুসরণ করে।

লিঙ্গপুরাণ অনুসারে, ব্রহ্মাপুত্র, মহাতেজস্বী, লোক পালক ক্ষুপ নামে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। ক্ষুপ রাজা ছিলেন দধীচ মুনির একান্ত বন্ধু। যুগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে যুগ প্রশ্ন। রাজা ক্ষুপের সঙ্গে দধীচ মুনির ও একদিন শ্রেণিদ্বন্দ্ব নিয়ে বিতর্ক দেখা দিল। মহাভারত ও পুরাণের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব হল, ক্ষত্রিয় বড় না রাক্ষস বড়। সমাজে কার স্থান অগ্রে স্থাপিত? —রাজা ক্ষুপ ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র, তিনি অষ্টলোকপালের শরীর ধারণ করে দধীচ মুনিকে

BanglaBook.org

বললেন, আমি ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম, কুবের—অধিক কি আমিই ঈশ্বর! হে চ্যবন পুত্র দধীচ, শ্রেষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ দেবতা বিষ্ণু আমি। সুতরাং ক্ষত্রিয় বলে আমাকে অবমাননা করা দূরে থাক, সর্বপ্রকারে পূজা করাই উচিত।''—ক্ষুপরাজার কথা শুনে চ্যবন তনয়, সগোত্র গৌরবে গৌরবান্বিত দধীচ মুনি ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ক্রোধ বশে ক্ষুপ রাজা মাথায় বামমুষ্টি দিয়ে আঘাত করলেন। ক্ষুপ রাজার তৎক্ষণাৎ তাঁর বজ্র দিয়ে দধীচ মুনির মস্তক ছেদন করলেন।

বহু আগে নৃপতি ক্ষুপ পিতামহ ব্রহ্মার ক্ষত থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন এবং ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হয়ে অসুর বধের জন্য বজ্র লাভ করেন। ইন্দ্রের প্রদত্ত এই বজ্রের শক্তি ছিল অমোঘ। তাই দধীচ মুনিকে বজ্র প্রয়োগ মাত্রই মুনি ভূমিতে পড়ে গেলেন। ক্ষুপরাজা মহাবলশালী ছিলেন, তিনি নিজের ইচ্ছায় নরদেহ ধারণ করে পৃথিবীর অধীশ্বর হন। তাই তিনি অজেয় ছিলেন।

দধীচী মুনি আহত অবস্থায় ভার্গব ঋষিকে স্মরণ করতে লাগলেন। গুরুশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্য যোগবলে সেখানে আগমন করে তাঁর মৃত সঞ্জীবনী সুধার মাধ্যমে দধীচী মুনির মুনি ধড় ও মুণ্ডকে জোড়া লাগালেন। তারপর দধীচী মুনিকে বললেন, হে মহাভাগা! দধীচী! হে বিপ্রর্ষে! ব্রহ্মাদি দেবগণ পূজা নিরঞ্জন দেবদের উমাপতিতে পূজা করে, তাঁর প্রসাদে তুমি অমরত্ব লাভ কর। আমিও তাঁরই প্রসাদে এই মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করেছি। এই জগতে কোন স্থানেই শিবভক্তের মৃত্যু ভয় নেই। তিনি ত্রিলোকের পিতা, সোম, অগ্নি, সূর্য এই ত্রিমণ্ডলের জনক। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি এই ত্রিগুণের, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন-এই ত্রিতত্ত্বের। গার্হপত্য, আহবনীয় দক্ষিণাগ্নি—এই অগ্নিত্রয়ের ঈশ্বর, এই সর্বত্র ত্রিধাভূত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্ররূপ যশস্বী, পুষ্টি বর্দ্ধন মহাদেবকে আমরা পূজা করি। তিনি সর্বভূতে, ত্রিগুণে, প্রকৃতি, সর্ব্বেন্দ্রিয়। দেবগণ, প্রথম, সর্বস্থানেই বিদ্যমান আছেন। যশস্বী পরমেশ্বর পুষ্পস্থ গন্ধের মতো সূক্ষ্ম। হে দ্বিজোত্তম! পরমেশ্বরের পুষ্টি প্রকৃতি তাঁর থেকেই উৎপন্ন। হে সুব্রত! মহামুনে। মায়াশ্রম, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মুনিগণ, ইন্দ্র, দেবগণ, সকলেরই পুষ্টিবর্দ্ধন হয় মহাদেবের থেকেই। আমরা কর্ম, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যোগ ও ধ্যানের মাধ্যমে সনাতন রুদ্রদেবকে আরাধনা করি। মহাদেবকে আশ্রয় করলে মহাদেব মৃত্যুপাশ থেকে মুক্তি দান করেন। কাঁকুড় ফল যেমন সূর্যতাপে পরিণত হয়ে আপনি বন্ধনমুক্ত হয়, শিবভক্তেরাও তেমনই ভক্তিপ্রভাবে স্বয়ং মুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি জলমাত্র গ্রহণ করে দিবারাত্র জপ, হোম ও মন্ত্র পাঠ করে লিঙ্গ পূজা করে, তার মৃত্যু ভয় থাকে না। সুতরাং, হে চ্যবন পুত্র তুমি লিঙ্গআরাধনা সম্পন্ন কর।'

BanglaBook.org

শুক্রাচার্যের কথা অনুসারে ক্ষুপরাজাকে পরাজিত করার জন্য দধীচ মুনি মহাদেবের আরাধনা করলেন। মহাদেব তাঁকে বজ্রের শক্তি সহ্যের ক্ষমতা দান করলেন। দধীচ মুনি এবার ক্ষুপরাজাকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেন। দধীচী মুনির কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর আরাধ্য দেবতা শঙ্খচক্র গদাধর কিরীটি ও পদ্মহস্তধারী জনার্দনকে স্তবগানে তুষ্ট করতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'হে গরুরধ্বজ, তুমি সকলের আদি, তোমার আদি নেই, তুমি প্রকৃতি, তুমি জনার্দ্দন। তুমি পুরুষ, তুমি জগতের নাথ, তুমি বিষ্ণু, তুমি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তি, পিতামহ ব্রহ্মাণ্ড তুমি; হে জনার্দ্দন! তুমি আদ্য, প্রথম জ্যোতি। হে শ্রীপতে, হে ভূপতে! হে প্রভো! তুমিই পরমধাম পরমাত্মার তমোময় রুদ্র তোমারই ক্রোধ থেকে উৎপন্ন, তোমার অনুগ্রহেই জগৎকর্তা রজোময় পিতামহ এবং সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু উৎপন্ন হয়েছেন। হে কালমূর্ত্তে! হে হরে! হে বিষ্ণো! হে নারায়ণ! হে জগন্ময়! হে বিশ্বমূর্ত্তে! হে মহেশ্বর। মহা অহঙ্কার এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি, সর্ব্বত্রই আপনি অধিষ্ঠিত আছেন। হে মহাদেব! হে জগন্নাথ! হে পিতামহ! হে জগদ্‌গুরো! হে দেব দেবেশ! আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। হে বৈকুণ্ঠ! হে শৌরে। হে সর্বজ্ঞ! হে বাসুদেব! হে মহাভুক্ত! হে সঙ্কর্ষণ! হে মহাভাগ! হে মহাবল! হে পুরোষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। হে বিভো! স্বর্গ তোমার নাভি, বায়ু তোমার নাসিকা চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার চক্ষুদ্বয়, পুষ্করাদি মেঘসকল তোমার কেশ, নক্ষত্রাদি তোমার কণ্ঠভূষণ, আমি কিরূপে তোমার স্তব করতে সমর্থ হ'ব? কিভাবেই পুরুষোত্তম আপনার পূজা করব। আমি শ্রদ্ধাসহকারে যা করলাম, যা শুনলাম এবং আপনার যে যশ কীর্ত্তন করলাম। হে ঈশ! যদি তাতে কোন দোষ থাকে, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, যে ব্যক্তি সর্বপাপ নাশক ক্ষুপচরিত বৈষ্ণবস্তোত্র ভক্তিভাবে পাঠ করে বা শোনে অথবা ব্রাহ্মণদের শোনায় সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করে।

ক্ষুপের রচিত ও কথিত স্তবমালার মধ্যে এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই স্তবে একই সঙ্গে নারায়ণকে, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে বন্দনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে, 'হে মহাদেব, হে জগন্নাথ, হে পিতামহ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর একই সঙ্গে বন্দিত। ক্ষুপের এই স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে নারায়ণ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হতেই ক্ষুপ রাজা তাঁকে দুঃখ করে বললেন, 'হে ভগবান্! দধীচ নামে বিখ্যাত ধর্মাত্মা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। হে জগৎপতে, শিব আরাধনায় সিদ্ধ দধীচ সভার মধ্যে আমাকে অবজ্ঞা করে, আমার মস্তকে বাম পা দিয়ে আঘাত করলেন, এবং সগর্বে বললেন, 'আমি কাউকেই ভয় করি না, হে জগদীশ্বর। আমি তাঁকে পরাজিত করতে ইচ্ছা করি। হে জনার্দ্দন, যাতে আমার মঙ্গল হয়, তা

BanglaBook.org

করুন।' ক্ষুপ রাজার কথা শুনে নারায়ণ বললেন, শিবের আশ্রয় গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণদের আর কোন ভয় থাকে না। তাই দধীচের কথা আর কি বলব? অতএব ভূপতি! কোন মতেই তোমার বিজয় লাভের সম্ভাবনা নেই। দেবগণ সহ আমারও বিপ্রশাপ হবে, এ ব্যাপারে আমি নিতান্ত দুঃখিত। হে রাজেন্দ্র! দক্ষযজ্ঞে ব্রাহ্মণশাপে আমার ও দেবগণের মৃত্যু ও উত্থান হবে। তাই হে রাজন্, দধীচ বিজয়ের জন্য আমি যত্নবান হব। যেভাবেই হোক, তাঁর মনে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে, সেই ক্ষোভ দূর করতে চেষ্টা করব।'—এই বলে নারায়ণ এক ব্রাহ্মণের রূপধারণ করে মহর্ষি দধীচের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে বললেন, 'হে দধীচে হে ব্রহ্মর্ষে! হে শিবসেবা তৎপর সনাতন। আমি আপনার কাছে একটি বর প্রার্থনা করি, আপনি আমাকে সেই বরদান করুন।'—ব্রাহ্মণরূপী জনার্দ্দনকে চিনতে পেরে গেলেন দধীচ। তিনি বললেন, 'হে নারায়ণ, আপনাকে প্রণম্য, শিবতুষ্টির ফলে আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবই জানতে পারি যেহেতু আমি আপনার প্রকৃতরূপ জানতে পেরেছি, সেহেতু আপনি আপনার ছদ্মবেশ ত্যাগ করুন। হে ভগবান্, আপনি ভক্তবৎসল, তবু এ আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি, শিব পূজকের কি কোন কিছুর প্রতি-ভীতি থাকে শিবের বরে আমি ভয়কে জয় করেছি। সভার মধ্যে ক্ষুপ রাজাকে যে ভয়হীনতার কথা বলেছি তাতে শিব মাহাত্ম্যই প্রচারিত হয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় আমার কি কতর্ব্য, সত্যিই এই জগতে দেব, দৈত্য, ব্রাহ্মণ কাউকেই আমি ভয় পাই না।'—দধীচ মুনির কথা শুনে নারায়ণ বলল, 'হে মুনি, আমি জানি তুমি শিবরাধনায় নিযুক্ত, তাই তুমি কাউকে ভয় পাওনা, তবু আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, সভামধ্যস্থলে ক্ষুপরাজা সামনে আমি খুব ভয় পেয়েছি—এই কথাটি একবার উচ্চারণ কর। স্বয়ং নারায়ণের মুখে এই কথা শুনেও দধীচ মুনি শিবভাবনা থেকে বিচ্যুত হলেন না। তিনি উন্মুক্ত কণ্ঠে নারায়ণের সামনেই বলে উঠলেন, 'শিব-প্রসাদে আমি দেব, দ্বিজ, কাউকেই ভয় পাই না।' নারায়ণ মহামুনির কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে সুদর্শন চক্র দিয়ে মুনিকে বধ করতে চাইলেন। কিন্তু সুদর্শনচক্র মুনির কাছে এসেই স্তব্ধ হল। শিবভক্তকে বধ করবে কি করে? সুদর্শনচক্রকে স্তব্ধ হতে দেখে দধীচ মুনি বললেন, 'হে নারায়ণ, আপনি মহাদেবের কাছেই এই চক্র লাভ করেছিলেন, তাই এই চক্র আমাকে আঘাত করবে না। আপনি অন্য অস্ত্র প্রয়োগ করুন। নারায়ণ দেবগণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে বহু অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কিন্তু দধীচ মুনিকে বধ করতে সক্ষম হলেন না। এদিকে দধীচ মুনি এক মুষ্টি কুশ নিক্ষেপ করতেই একটি ত্রিশূলের উদ্ভব হল। এরপর বিষ্ণুর সঙ্গে মহামুনির দধীচের খুব যুদ্ধ হল। বিষ্ণু কোনো উপায়েই দধীচকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেন না। অবশেষে নারায়ণের আদেশে ক্ষুপরাজ

BanglaBook.org

দধীচ মুনির কাছে ক্ষমা চাইলেন। যে স্থানে দধীচ মুনি শিবের জন্য তপস্যা করেছিলেন, সেই স্থানটি 'স্থানেশ্বর তীর্থে' পরিণত হল। যে স্থানেশ্বর তীর্থে শিবের পূজা করে, তার শিব সাযুজ্য লাভ হয়।

লিঙ্গ পূজার উৎপত্তির কারণ স্বরূপ পৌরাণিক সাহিত্য যতই চমকপ্রদ কাহিনির বর্ণনা করুক না কেন শিবভাবনার সঙ্গে লিঙ্গ পূজার সংযুক্ত হওয়ার একটি বিশেষ ক্ষণ ছিল এবং কারণও ছিল। যাকে বিভিন্ন পুরাণ বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছে। আদিম পূজা ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উদার দর্শন। শৈবভাবাপন্ন সাধকেরা সৃষ্টি করেছেন নানা শৈব সম্প্রদায়। তাঁরা আজও নাগবিভূষিত মহাদেবের পূজা করেন এবং তাঁরই মতো যাযাবরের জীবন যাপন করেন।

লিঙ্গ অর্থে প্রতীক। আমাদের দেহের সূক্ষ্মরূপকে আমরা লিঙ্গ শরীররূপে চিহ্নিত করি। শিবগীতা এবং অন্যান্য উপনিষদে আছে বাক-পানি-পাদ-পায়ু-উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। প্রাণ, আপন, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ বায়ু মিলিত হয়ে তৈরি হয় লিঙ্গশরীর। আমাদের সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরের মতোই শিবভাবনার প্রতীকরূপে, সূক্ষ্মভাবরূপে লিঙ্গ দেহে পূজিত হন শিব।

শিবলিঙ্গের গঠন ও আকৃতির মধ্যে নানা পার্থক্য রয়েছে। কোন লিঙ্গ ঘন কৃষ্ণবর্ণ, কোনটি শ্বেতশুভ্র। আবার কোনও লিঙ্গ দেখতে পাকা আমের রঙের আবার কোনওটি ঘননীলরঙের দ্যুতিসম্পন্ন। কেবল আকৃতির দিক থেকে নয়, বিভিন্ন লিঙ্গের পূজাপদ্ধতি ও উপকারিতা ভিন্ন ভিন্ন। সব লিঙ্গ গৃহীদের পক্ষে পূজ্য হওয়া উচিত নয়। কোনও কোনও লিঙ্গের লক্ষণ দেখে বলা যায়—এই লিঙ্গ গুলি গৃহীর কল্যাণের থেকে অকল্যাণ করবে বেশি। আবার কোনও লিঙ্গ কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের দ্বারাই পূজিত হওয়া উচিত। কারণ এই লিঙ্গ আরাধনা মানবকে সংসার বন্ধন মোচনের দিকে নিয়ে যায়—এনে দেয় চরম প্রাপ্তির দ্বারপ্রান্তে। শিবলিঙ্গের লক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ মানুষই বর্ণনা করে বলতে সক্ষম হন। এক্ষেত্রে নারায়ণের প্রতীক, শালগ্রামশিলার সঙ্গে শিবলিঙ্গ আরাধনার সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন নারায়ণ শিলা তার বিভিন্ন লক্ষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নামে খ্যাত হন। কখনও তিনি শ্রীধর, কখনও রাজরাজেশ্বর, কখনও বা দামোদর। দেবাদিদেবের লিঙ্গ-লক্ষণে ও নামকরণে এইরকমই ভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী পুণ্যতোয়া গণ্ডকীর তীরে সৃষ্টি হয় নারায়ণ শিলা। এই শিলা প্রকৃতির নিজস্ব সৃষ্ট সম্পদ, তা বিশেষ লক্ষণে চিহ্নিত হয়ে আরাধিত হয় বিভিন্ন নামে। শিবলিঙ্গের ক্ষেত্রেও আমরা এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই।

BanglaBook.org

এখনও পশ্চিম ভারতে প্রবাহিনী নর্মদার জলে শিবলিঙ্গ আপনা আপনি উদ্ভুত হন। জলে সৃষ্ট হন বলেই তিনি 'জলময়ীশিবা'। ধর্মেতিহাসের গতি মানুষের মনের মতোই গহন ও বিচিত্র। তাই ভারতের এই দুই প্রধান পূজাপদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য একটু বিস্তারিত তুলে ধরা প্রয়োজন। তেত্রিশ কোটি দেব ও দেবীর সুন্দর কান্তিগুলি ছেড়ে হঠাৎ-ই বিশেষ আকৃতির পাথর পূজিত হতে শুরু হল কেন?—এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই যুক্তিবাদীর মনকে নাড়া দিয়ে যাবে। বাস্তবিকই আজকের দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ সমাজদার্শনিক কার্ল মার্ক্স ভারতবর্ষের পূজাপদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করার সময় বলেছিলেন, এই ভারতবাসীরা অদ্ভুত, এঁরা গরুকে পূজা করে, নুড়িকে আরাধনা করে!—ভাবহীন ব্যক্তির চোখে ভাবনাময় ঈশ্বর নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। ইংরেজ মিশনারীরাও ভারতবর্ষে এসে 'পুতুল পূজা' নামে একটি ভ্রান্ত শব্দের সৃষ্টি করে গিয়েছেন। কিন্তু এর পিছনে মানুষের সমন্বয়ের ধারণাকে তুলে ধরতে পারেননি।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি লিঙ্গ শব্দের অর্থ প্রতীক। প্রাচীন মানুষ নানা প্রতীকের আরাধনা করত। যাতে নৃতত্ত্বের ভাষায় 'টোটেম' বা 'ট্যাবু' বলে চিহ্নিত করা হয়। পৃথিবীর সমস্ত সমাজেই এই টোটেম পূজাপদ্ধতির প্রচলন ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পূজা তার প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ধর্মভাবনার কোনও অংশই হারিয়ে যায় না। প্রাচীন এই টোটেম পূজাও সংযুক্ত হয় নতুন ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতীকের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এক নির্দিষ্ট পূজাপদ্ধতি, আরোপিত হয় ভাবসমূহ। এর ফলেই সৃষ্টি হয় লিঙ্গ আরাধনা বা শালগ্রাম শিলার পূজা। এই পূজাগুলি দুটিভাবে মানুষকে নাড়া দেয়; সমাজের একবারে অন্তজঃ শ্রেণিকে উপরে তুলে আনে। দ্বিতীয়ত, ধর্মভাবনাকে জনমানসের মধ্যে বিস্তার করে দেয়। তাই প্রাচীন মিশরে সর্পদেবতার আরাধনা প্রাচীনত্ব হারিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু আমাদের গ্রামবাংলার মনসা পূজা কিন্তু এখনও জনপ্রিয়।

শালগ্রাম ও লিঙ্গ আরাধনার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুই-ই পরিলক্ষিত হয়। শিবলিঙ্গ নির্মাণ করা যেতে পারে, মানুষ নিজে শিব তৈরী করে পূজা করতে পারে, কিন্তু শালগ্রাম শিলা কিন্তু প্রকৃতির দান। বিচিত্র এই শিলা, গণ্ডকী নদীর তীরে শিলারূপে নারায়ণ বিরাজ করছেন—এই পৌরাণিক কাহিনিতে পূজিত হন শালগ্রামশিলা। গণ্ডকী নদীজলে বিশেষ লক্ষণযুক্ত পাথর দেখতে পাওয়া যায়। গোলাকার এই পাথরে গভীর চক্র থাকে, কখনও কখনও সেই চক্রের গভীরে বিশেষ লক্ষণও ধরা পড়ে। এই বিশেষ লক্ষণকে চিহ্নিত করে, তার উপর চন্দন চর্চিত চোখ মুখে শালগ্রামশিলা সজ্জিত হন। চন্দনের সঙ্গে থাকে তুলসী পত্র।

BanglaBook.org

হিন্দু ঘরের প্রতিটি শুভ কাজে এই শিলা অপরিহার্য।

পৌরাণিক কাহিনিতে শালগ্রাম শিলার সঙ্গে দুটি নারী গণ্ডকী ও তুলসী, ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে নারীরা শালগ্রাম শিলার আরাধনা তো দূরের কথা স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ পুরুষ এই শিলা আরাধনা করার অধিকারী। অন্যদিকে শিবলিঙ্গ আরাধনায় কিন্তু মেয়েরাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। যদিও পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে আমরা দেখতে পাই দেবকুলের পরম শত্রু অসুরেরাও শিব আরাধনা করছেন এবং বর লাভ করে বিপদে ফেলছেন দেবতাদের। অর্থাৎ শিবলিঙ্গের পূজা করার অধিকার যেমন সকলের আছে, ঠিক তেমনই তাকে স্পর্শ করার অধিকারীও সকলেই।

শালগ্রাম শিলার মতোই শিবলিঙ্গ নর্মদা নদীর তীরে প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি সৃষ্ট এই লিঙ্গগুলি আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিচিত্র বর্ণের অধিকারী! শিবলিঙ্গ গড়ে ওঠারও নানা কাহিনি আমরা স্কন্দ পুরাণের মধ্যে পাই। গণ্ডকী ও তুলসীর মতো, নর্মদা ও শিপ্রা নদী শিব লিঙ্গ পূজার সঙ্গে জড়িত। আর গঙ্গা? তিনি পুরাণে শিবের জটাজালে আবৃত হয়ে ধরণীর ভার লাঘব করতে মর্ত্যে নেমেছিলেন, তাই একদিকে উমা পার্বতীর সপত্নীরূপে শিবপূজায় অপরিহার্য। অপরদিকে নারায়ণের পত্নী রূপেও শালগ্রাম পূজায় অপরিহার্য।

লিঙ্গপুরাণে দেবাদিদেব মহাদেবের লীলাভূমিরূপে ভারবতর্ষকেই কল্পনা করা হয়েছে। এই পুরাণে বলা হয়েছে, এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপা ও নদী পর্বত সঙ্কুল। এর চারিদিক সপ্তসাগরে বেষ্টিত। পৃথিবীর সাতটি দ্বীপেই দেবাদিদেব নানারূপ বেশ ধারণ করে নিয়ত বিরাজ করেন। এই সপ্তদ্বীপ ব্যতীত—সপ্ত সমুদ্র চারিদিক বেষ্টিত। এই সমুদ্রগুলি হল লবণ-সমুদ্র, ইক্ষুরস-সমুদ্র, সুরা-সমুদ্র, ঘৃত-সমুদ্র, দধি-সমুদ্র, জল-সমুদ্র। এই সমুদ্রগুলিতেও গিরিজাকান্ত নিজের অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে জলরূপ ধারণ করে উর্মিমালারূপ বাহু দ্বারা ক্রীড়া করে চলেছেন। ক্ষীর সমুদ্রে অমৃতরাশি মধ্যে যোগনিদ্রায় মগ্ন হয়ে শ্রীহরি প্রকৃতপক্ষে হরের ই ধ্যান করছেন। যখন সেই ভগবান, পরম কারুণিক হরিপ্রবুদ্ধ হয়ে কর্মমুখর হন তখন এই অখিল জগৎ প্রবুদ্ধ হয় এবং যে সময়ে তিনি শয়ন করেন, সেই সময় সমগ্র চরাচর সুপ্ত হয়ে থাকে। তিনি এই অখিল জগৎ সৃজন করেছেন এবং তিনিই শিবানুগ্রহে ধারণ, রক্ষা ও সংস্কার করে থাকেন।

লিঙ্গ পুরাণে সূত ঋষিদের বলেছিলেন, রুদ্রদেব সকল বিশ্বকে রক্ষা করছেন, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহলোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক, পাতাল কোটি নরক, সমুদ্র তারকা সবই মহাদেবের প্রসাদে তাঁদের গতি নির্ধারণ করছে। মহাদেবই এইভাবে সমগ্র বিশ্বকে সৃজন করেছেন, এবং এ সমস্তই তাঁর স্বরূপ।

BanglaBook.org

ত্রিভুবন মহেশ্বরের শরীর স্বরূপ। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্লোক, মহলোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক—এই সাতটি লোকই অণ্ড বা ডিম থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই সাতটি লোক নিচে মহাতল ইত্যাদি সপ্ততল রয়েছে। সপ্ততলের পরে রয়েছে নরক। পৃথিবীর যেমন বিস্তার সপ্তপাতালেরও বিস্তার সেইরকমই। মহাতল ও হেমতল নানা রত্নে পরিপূর্ণ, রসাতল শিলাময়, তলাতল সুক্তাময় সুতল পীতবর্ণ, বিতল বিদ্রুমের ন্যায় প্রভাযুক্ত, অতলশুভ্র। রসাতলে বাস করেন সুবর্ণনাগ ও বাসুকি। রসাতলে সাধারণত নাগগণের বাসভূমি। বিরোচন, হিরণ্যাক্ষ, নরক প্রভৃতি অসুরগণ নিরন্তর তলাতলে বিরাজ করে বলে তলাতল অতি বিখ্যাত ও বহুশোভা সম্পন্ন। কালনেমি, বৈনায়ক ও অন্যান্য অসুর প্রভৃতি সুতলে নিয়ত বিরাজ করে, সেই সুতল অতি শোভাশালী। এইরকমভাবে বিতলে তারক ও অগ্নিমুখাদি দানবগণ সর্বদা অবস্থান করে। বিতল কুবলাশ্বের অধিষ্ঠিত স্থান রূপে বিখ্যাত। অতল বীরশ্রেষ্ঠ মহাকুম্ভ, হয়গ্রীব, শঙ্কুকর্ণ ও নমুচি প্রভৃতি বীরের অধিষ্ঠিত স্থান এবং অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন। এই তলেই অনুচরসহ, পুত্র নন্দীশ্বর ও পত্নী জগদম্বার সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব নিজ অবস্থান করেন।' —অর্থাৎ লিঙ্গ পুরাণ অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টি ওতপ্রোতোভাবে জড়িয়ে রয়েছে শিবসত্তার সঙ্গে। শিবচেতনার সঙ্গে। যা কিছু শুভ, যা কিছু সুন্দর তাই শিব, তাই পরম মঙ্গলময় ঈশ্বর।

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যদি দেবাদিদেব সংপৃক্ত হয়ে থাকেন তবে তিনি কেবল ভারতীয়দের কাছে কি করে শ্রেষ্ঠদেবতা হয়ে উঠলেন? লিঙ্গপুরাণে সে কাহিনিও বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুরাণ অনুসারে জম্বুদ্বীপের রাজা প্রিয়ব্রত তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর পদে অভিষেক করালেন। আগ্নীধ্র অত্যন্ত শিবভক্তি পরায়ণ, সর্বদা তপস্যায় রত থাকতেন। অতি বুদ্ধিমান ও সুপুরুষ আগ্নীধ্রের নয়টি পুত্র ছিল। এই নয়টি পুত্রের প্রতিটির পিতার মতো শিবভক্তি পরায়ণ ও তপস্যা প্রবণ স্বভাব লাভ করেছিল। এই নয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন নাভি, অপর আটজন—কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, হিরন্মান, কুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল।

আগ্নীধ্র তাঁর নয় পুত্রকে নয়টি দেশভাগ করে দিলেন। নাভিকে হেমনামক দক্ষিণবর্ষ, কিম্পুরুষকে হেমকূটবর্ষ, হরিকে নৈষধবর্ষ, ইলাবৃতকে মেরুযুক্তবর্ষ, রম্যকে নীলাচলাশ্রিত বর্ষ, হিরন্মানকে নীলাচলাশ্রিত বর্ষের উত্তরস্থিত শ্বেতবর্ষ, কুরুকে শৃঙ্গবর্ষ, ভদ্রাশ্বকে মাল্যবান বর্ষ, কেতুমালকে গান্ধমাদন বর্ষ প্রদান করলেন। নয়পুত্রকে রাজ্যভাগ করে দিয়ে আগ্নীধ্র—তপস্যায় মগ্ন হলেন, নয়পুত্রের নয়টি দেশ শিবক্ষেত্র রূপে বিধৃত হল। আগ্নীধ্রের প্রথম পুত্র নাভির পত্নী ছিলেন মরুদেবী। নাভি ও মরুদেবীর একমাত্র পুত্র ঋষভ। এই ঋষভের পুত্র

BanglaBook.org

হলেন ভরত। ঋষভ হিমগিরির দক্ষিণ অংশ ভরতকে প্রদান করেছিলেন। রাজা ভরতের শাসিত ভূমিই ভারতবর্ষ নামে খ্যাত। রাজা ভরতকে রাজ্যভার প্রদান করে রাজা ঋষভ যেমন শিবের তপস্যায় জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন, ঠিক সেইরকমই রাজা ভরত ও তাঁর পুত্র সুমতিকে রাজ্যভার প্রদান করে শিবের ধ্যানে মগ্ন হয়ে ছিলেন।

অর্থাৎ লিঙ্গপুরাণের কাহিনী অনুসারে ভারতবর্ষের আদি শাসকগণই শিবের উপাসক ছিলেন। সুতরাং শিব দেবতার ধারণা একান্ত ভারতীয় ধারণা। যদিও কোনও কোনও পণ্ডিতদের মধ্যে শিবভাবনা বহিরাগত, তবুও পুরাণের মধ্যে এর বিপরীত ধারণাও আমরা পাই। শিবভাবনার মধ্যে শিবের যে রুদ্ররূপের বন্দনা করা হয়েছে এই রুদ্ররূপের ধারণা আমরা বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেও দেখতে পাই। বৈদিকযুগে অঙ্গিরা নামে এক ঋষি ছিলেন তার তিনপুত্র কুৎস, হিরণ্যস্তূপ, গৃৎসমদ। পিতা ও পুত্রেরা সকলেই বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে একশ চৌদ্দ নম্বর সূক্তে বন্দনা করা হয়েছে, এখানে বলা হয়েছে, 'মহান কপর্দী বীরদর্পচূর্ণকারী রুদ্রদেবতাকে আমরা এই মন্ত্রে আবাহন করছি। তাঁর কৃপায় যেন দ্বিপদ মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু সকলেই সুস্থ ও রোগশূন্য হয়, মর্ত্ত্য-মানুষের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য হে রুদ্র! তোমাকে প্রণাম নিবেদন করছি।' —এই সূক্তেরই চার নম্বর মন্ত্রে বলা হচ্ছে,—আমরা ঐহিক ও পারত্রিক সুরক্ষার জন্য দীপ্তিমান, যজ্ঞসাধক, রহস্যময়, গতিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাময় রুদ্রদেবতাকে আহ্বান করছি। তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, হে রুদ্র, তুমি আমাদেরকে দয়া কর।'

বেদের রুদ্রদেব বিবর্তনের নানা পথ ধরে অবশেষে আমাদের আত্মভোলা শিবঠাকুরে রূপান্তরিত হয়েছেন। শিব ভাবনা এবং শিব সুন্দরকে নিয়ে রচিত নানা কাহিনি আমরা দুই রকম অর্থ বের করতে পারি। একটি জাগতিক উদ্দেশ্য সাধন করে, অপরটি আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধন করে। যেমন মহাভারতের কর্ণপর্ব ও হরিবংশে ত্রিপুরাসুরের কাহিনি আছে। ত্রিপুরাসুরকে বধ করেছিলেন বলে শিবের অপর নাম ত্রিপুরারি। দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বধ করেছিলেন ভীমা নদীর উৎসস্থানে। যুদ্ধ ক্লান্ত মহাদেবের ঘাম থেকে সৃষ্ট হয়েছে ভীমা নদী।

মহাভারতের কর্ণপর্ব অনুসারে, দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে একবার দৈত্যগণ পরাজিত হন। অপমানের জ্বালায় তারকাসুরের তিনপুত্র, তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদুৎন্মালী কঠোর তপস্যার মাধ্যমে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে এক অদ্ভুত বর প্রার্থনা করেন। তাঁরা ব্রহ্মার কাছে বর চান যে তারা তিনজন যেন এমন তিনটে পৃথক পুর বা নগরে বাস করতে পারে, যেখানে সবরকমে ভোগের বস্তু থাকবে কিন্তু দেবতা, দৈত্য যক্ষ বা রাক্ষস—কেউই সেই নগরকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবে না।

BanglaBook.org

এমনকি ব্রহ্মশাপেও সেই নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। সহস্র বছর পরে তারা যখন মিলিত হয়ে একদেহ একপ্রাণ হবে, তখন তাদের এই তিনটে পুরীও একত্র হয়ে যাবে। তখন যে দেবতা এই সম্মিলিত ত্রিপুরকে একবাণে ভেদ করতে পারবেন, তাঁর হাতেই তাঁদের সম্মিলিত-সংযুক্ত দেহ ত্রিপুরাসুরের মৃত্যু হবে।'—তারকাসুর পুত্রদের তপস্যায় তুষ্ট ব্রহ্মা এই বর প্রদান করলে তাঁর ময়দানবদের দিয়ে তিনটি পুর বা নগর নির্মাণ করেন—তারকাক্ষের জন্যে স্বর্গে স্বর্ণময়পুর, কমলাক্ষের জন্য অন্তরীক্ষে রৌপ্যময়পুর এবং বিদ্যুন্মালীর জন্য পৃথিবীতে কৃষ্ণ লৌহপুর।

তাঁরকাসুরের তিনপুত্র এই তিন পুরীতে বসবাস করতে লাগলেন। এরমধ্যে তারকাক্ষের পুত্র হরি ব্রহ্মার তপস্যা করে বরলাভ করলেন। সেই বরলাভ করে তিনটি পুরেই তিনটি মৃত সঞ্জীবনী সরোবর নির্মাণ করেন। এই সরোবরের এটাই গুণ ছিল যে, এতে মৃত দৈত্যদের নিক্ষেপ করলে তারা পুনরায় জীবন লাভ করত।

এর ফলে দৈত্য সংখ্যা কখনই কমে গেল না। পুনর্জীবিত দৈত্যরা দেবতাদের নানাভাবে উৎপীড়ন করত। দেবতারা তাঁদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, এই ঘটনার সম্যক প্রতিকারের জন্য ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা তাঁদেরকে শিবের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। দেবকুল তখন ছুটলেন দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে। দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে শিব এই দৈত্যদেরকে বধ করার আশ্বাস প্রদান করেন এবং দৈত্যবধের জন্য সমস্ত দেবতার অর্ধেক তেজ গ্রহণ করেন। সমস্ত দেবতাদের শক্তি হরণ করেছিলেন বলে মহেশ্বর মহাদেব নামে বন্দিত হলেন।

এরপর দেবাদিদেব মহাদেব দেবতাদের আদেশ দিলেন তাঁরা যেন দিব্য রথ ও ধনুক তৈরি করেন। দেব কারিগণ বিশ্বকর্মার উপর দেবতার এই দিব্যরথ ও দিব্য ধনুক প্রস্তুত করার দায়িত্ব দিলেন। বিশ্বকর্মা পৃথিবী, দেবীশক্তি, মন্দার পর্বত, দিগ্বদিক, নক্ষত্র মণ্ডল, বাসুকি, হিমালয়, বিন্ধ্যপর্বত, সপ্তর্ষিমণ্ডল, সিন্ধু, গঙ্গা, সরস্বতী, দিনরাত্রি, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ প্রভৃতির অংশ দিয়ে একটি দিব্যরথ তৈরি করলেন। চন্দ্র, সূর্য এই রথের রথচক্র এবং ইন্দ্র, বরুণ, কুবের ও যম এই দেবতারা অশ্ব হলেন। রথের ধ্বজা হলেন সুমেরু পর্বত এবং বিদ্যুৎময় মেঘ হলেন পতাকা। মহাদেব সংবৎসরকে ধনু ও কালরাত্রিকে জ্যা করেন। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র মহাদেবের তীর হন, ব্রহ্মাকে সেই দিব্যরথের সারথি করে মহাদেব ত্রিপুরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। বাণস্থিত বিষ্ণু, অগ্নি, চন্দ্র, ব্রহ্মা এবং স্বয়ং মহাদেবের ভারে রথ ভূমিতে গেঁথে গেল। রথের চাকা ভূমিতে প্রবিষ্ট হলে তা চলার অযোগ্য হয়ে উঠল। নারায়ণ তখন বাণ থেকে নির্গত হয়ে বৃষ রূপে রথকে মাটি থেকে তুলে দিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব হলেন বৃষবাহন। তিনি রথের বাহন

BanglaBook.org

অশ্বের পিঠে এক পা এবং বৃষরূপী নারায়ণের পিঠে আর এক পা স্থাপন করে তারকাসুরের তিনপুত্রের তিন পুরীকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। ধনুতে সংযোজিত করলেন পশুপতি অস্ত্র। এরপর একটি বিশেষক্ষণে ত্রিপুর একত্রিত হল এবং তিন অসুরও একদেহে ত্রিপুরাসুরের সৃষ্টি করল। মহাদেব তাঁর পশুপাত অস্ত্রে ধ্বংস করলেন ত্রিপুর আর বধ হলেন ত্রিপুরাসুর। শিব হলেন ত্রিপুরারি। ত্রিপুরাসুরকে বধ করে ক্লান্ত মহাদেবের ঘাম থেকে সৃষ্টি হল ভীমা নদী, সেই স্থানে দেবতারা স্থাপন করলেন জলেশ্বর মহাদেব।

পৌরাণিক কাহিনিতে জলেশ্বর মহাদেব সম্বন্ধে এই কাহিনি বলা হলেও জলেশ্বর মহাদেবের তাত্ত্বিক অর্থ হল জীবের সংসার জাল, কর্মজাল ছিন্ন করে জীবের স্থূলদেহকে সূক্ষ্মদেহে পরিণত করে। এইভাবে শিব-মহিমা বিভিন্ন কাহিনি ও তত্ত্বের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

শিবভাবনা ও নদী

তত্ত্বকথা ছেড়ে আমরা গল্প কথায় আসি। মহাভারতে আমরা পাই, দেবাসুরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে সমুদ্রমন্থন হয়েছিল সেই মন্থনজাত গরলকে মহাদেব ধারণ করেছিলেন তাঁর কণ্ঠে। তীব্র বিষে তাঁর শুভ্র কণ্ঠ নীল কণ্ঠে রূপান্তরিত হয়েছিল। মহাদেবের এই গরলপান নিয়েই গড়ে উঠেছে দুটি নদীর উৎপত্তি কাহিনী। একটি নর্মদা অপরটি শিপ্রা।

স্কন্দপুরাণের মধ্যে আমরা শিপ্রা নামে একটি নদী-চরিত্রের দেখা পাই। যে নদী-চরিত্রকে এক পবিত্র নারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই পুরাণে বলা হয়েছে পৃথিবীতে শিপ্রা নদীর মতো নদী নেই, যাঁর তীরমাত্র স্পর্শ করলে ক্ষণকালের মধ্যে মুক্তি হয়ে থাকে। এই শিপ্রা নদীর জন্মকথা খুবই বিচিত্র। শিপ্রার জন্ম হয়েছে বৈকুণ্ঠে। সুরালয়ে শিপ্রা নদী জ্বরঘ্নী, মহাদ্বারে পাপঘ্নী এবং পাতালে অমৃত নামে খ্যাত। বরাহকল্পে এই নদীর নাম ছিল বিষ্ণুদেহা; অবন্তীতে এই নদীর কামধেনু থেকে জন্মের কথা বলা হয়েছে, এর জন্যই তাঁর নাম শিপ্রা।

একদিন মহাখেয়ালি দেবতা দেবাদিদেব মহাদেব ব্রহ্মার কপাল পাত্র হাতে নিয়ে ভিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হলেন। ভিক্ষার জন্য তিনি সমস্ত লোকে বিচরণ করলেন। কিন্তু সর্বলোকে বিচরণ করেও নীলকণ্ঠ কোথাও ভিক্ষা পেলেন না। ধরনীতে ভিক্ষালাভ না করতে পেরে তিনি অপরাহ্নে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হলেন।

BanglaBook.org

বহুদিনের ক্ষুধায় কাতর মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্ত লোকের নিন্দা করতে করতে 'আমাকে ভিক্ষা দান করো' বলে উচ্চস্বরে ভিক্ষা চাইতে লাগলেন। বৈকুণ্ঠে মহাদেবকে ওইভাবে ভিক্ষা চাইতে দেখে স্বয়ং হরি বললেন, 'হে হর! এই আমি আপনাকে ভিক্ষা দিচ্ছি। আপনি তা গ্রহণ করুন।' এই বলে হরি তাঁর নিজের তর্জনী অঙ্গুলি হরের ভিক্ষাপাত্রে প্রদান করলেন। মহাদেব খাদ্যবস্তুর বদলে একটি আঙুল দান করতে দেখে নারায়ণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং তাঁর ভিক্ষাপাত্রে দেওয়া হরির আঙুলটি ক্রোধে কেটে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই কাটা আঙুল দিয়ে অজস্রধারায় রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। সেই রক্ত শঙ্করের হস্তস্থিত কপালপাত্র পূর্ণ হয়ে ভূতলে উছলে পড়ল। ভূতলে পতিত সেই রক্তধারা থেকেই জন্ম হল শিপ্রা নদীর। একবার বাণাসুর নামে এক ভয়ানক অসুর কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে বন্দী করলে কৃষ্ণের সঙ্গে বাণাসুরের যুদ্ধ শুরু হল। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে বাণাসুরের সহস্র বাহু কেটে দিলে বিপন্ন বাণাসুর শঙ্করের শরণাপন্ন হলেন। তখন মহাদেব ভয়বিহ্বল শরণাগত মহাদৈত্যকে আশ্বাস দান করে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। মহাদেবকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেতে দেখে নারায়ণ হর জিঘাংসায় ক্রুদ্ধ হয়ে মহামোহন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। হরির মোহন অস্ত্রের প্রভাবে শিব কিছুক্ষণের জন্য সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন এবং তাঁর অন্তরে বৈষ্ণব জ্বরের সৃষ্টি হল। কিছুক্ষণ পর মহাদেবও সংজ্ঞা লাভ করে মহেশ্বর জ্বরের সৃষ্টি করলেন এবং সেই জ্বর মহাদেবের ললাটপট থেকে উৎপন্ন হয়ে সমস্ত কৃষ্ণসেনার মধ্যে সংক্রামিত হল। কৃষ্ণপক্ষীয় সমস্ত সেনা এই মহেশ্বর জ্বরে অভিভূত হয়ে পড়ল। এরপর মহেশ্বর জ্বর এবং বৈষ্ণব জ্বর উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলতে লাগল। এইভাবে বহুকাল সংগ্রাম করে মহেশ্বর জ্বর শেষে ক্লান্ত হয়ে ত্রিভুবন পর্যটন করল এবং অবশেষে শিপ্রার জলে স্নান করে সেই জ্বর থেকে মুক্তি পেল। বৈষ্ণব জ্বরও মহেশ্বর জ্বরকে শিপ্রাতে স্নান করে শান্তিলাভ করতে দেখে সেই স্থানেই স্নান সম্পন্ন করল এবং জ্বরের প্রকোপ থেকে মুক্তি লাভ করল।

মাহেশ্বর ও বৈষ্ণবজ্বরকে হরণ করায় শিপ্রা জ্বরঘ্নী নামে প্রসিদ্ধা হলেন। এই মহানদী শিপ্রার সঙ্গে মহাদেবের আর একটি কাহিনী আমরা পাই। দেব ও অসুরের মধ্যে সমুদ্র মন্থনের ফলে যখন কালকূট বিষ উৎপন্ন হল তখন সেই ভীষণ বিষের প্রভাব সমস্ত পৃথিবীতে ছেয়ে গেল। সেই বিষের প্রভাব সমস্ত জগৎ চরাচরকে বাঁচানোর জন্য দেবতারা মহাদেবের দ্বারস্থ হয়ে বললেন, 'হে প্রভু, এই তীব্র বিষের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন।' দেবতাদের আহ্বানে মহাদেব জগতের কল্যাণের জন্য সেই বিষকে নিজ কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হলেন। মহাদেব সেই বিষকে কণ্ঠে ধারণ করলে দেবী পার্বতী তাঁকে ত্যাগ করলেন কারণ বিষবৃক্ষ

BanglaBook.org

সর্বদাই অসেব্য। পার্বতী শিবকে ত্যাগ করে চলে যেতে শিবের মনে দুঃখ হল। তিনি জটাস্থ গঙ্গাকে বললেন, 'দেবী, তুমি আমার এই কালকূট বিষ তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে সাগরে নিয়ে যাও। তুমি ছাড়া এই কাজ কেউ করতে পারবে না।

গঙ্গার কাছে প্রত্যাখ্যাত শিব যমুনা, সরস্বতী ইত্যাদি নদীকে আহ্বান করলেন। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই তাঁদের অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। দুঃখিত শিব ব্রহ্ম-সমুদ্ভবা শিপ্রাকে আহ্বান করে বললেন, 'পুত্রী; শিপ্রে! তুমি আমার আদেশে এই কালকূট বহন করে মহাকাল বনে গমন কর। সেখানে গমন করে দেখবে কামেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ রয়েছে। তুমি এই বিষ সেই লিঙ্গে নিয়োজিত করবে।' শিপ্রা দেবাদিদেবকে প্রণাম করে বললেন, 'দেব, আপনার এই অধম কন্যা অবশ্যই আপনার আদেশ পালন করবে। পিতা, আমি আপনার কথা মতো এই দুঃসহ বিষ বহন করে মহাকালে গমন করছি। আমি জানি, এই কালকূটকে স্পর্শ করামাত্র আমি বিষে জর্জরিত হয়ে পড়ব এবং জনগণের অসেব্য হয়ে যাব। তবু এই বিষ গ্রহণে আমি রাজি।' শিপ্রার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন, 'কন্যা শোনো, তোমার ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি তোমায় আশ্বাস দান করছি পুত্রি, ভূলোকে, পাতালে, স্বর্গে ও অন্তরীক্ষে যত পূণ্যতীর্থ আছে, আজ থেকে সমস্ত তীর্থই তোমার কাছে এসে তোমার সেবা করবে। তুমি সব তীর্থের সেরা তীর্থ হবে।' মহাদেবের কথায় শিপ্রা সন্তুষ্ট হয়ে সেই মহাবিষ কালকূট গ্রহণ করে মহাকালের কামেশ্বর লিঙ্গে স্থাপন করলেন। কামেশ্বর লিঙ্গ বিষলিঙ্গে পরিণত হলে যে সেই লিঙ্গ দর্শন করতে লাগল তাঁরই মৃত্যু হতে লাগল। এমতাবস্থায় সকলে মহাদেবকে মিনতি করলে তিনি সেই লিঙ্গকে কুটুমেশ্বর লিঙ্গে পরিণত করে বললেন, 'আজ থেকে যে এই লিঙ্গ দর্শন করবে তাঁর কুটুম্ব বৃদ্ধি হবে এবং পবিত্র শিপ্রায় স্নান করে যে কুটুমেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করবে সে রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ করবে।

নর্মদায়াঃ জলং স্ব পীত্বা অর্চয়িত্বা বৃষধ্বজং
দুর্গতিঞ্চ ন পশ্যন্তি তস্যা তীর্থ প্রভাবতঃ

হে মানব হে নর্মদার জল নিত্য পান করে, নর্মদায় নিত্য স্নান করে এবং নর্মদার তীরে অবস্থিত বিভিন্ন বিচিত্র শিবলিঙ্গের অর্চনা করে তাঁর সব দুর্গতির অবসান হয়। মর্ত্ত্যজীবনেই সে অমর্ত্ত্যজীবনের সন্ধান পায়।

পুণ্য প্রবাহিনী গঙ্গা ও মুক্তিদায়িনী নর্মদা ভারতের দুই প্রধান নদী, ভারতীয়দের ধর্মজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গঙ্গা যেন ভক্তির প্রতিমা আর নর্মদা হল জ্ঞান প্রবাহিনী। দেবী গঙ্গার কাহিনি আমরা সকলেই জানি।

পুরাকালে সাগর নামে সূর্যবংশ জাত অতি প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল দুই পত্নী, একজনের নাম বৈদভী অপরজন হলেন শৈব্যা। এই দুই মনোরমা পত্নীর একজন ছিলেন সন্তানহীনা, শৈব্যার গর্ভে অসমঞ্জ নামে গুণবাণ পুত্র হয়েছিল। কিন্তু বৈদর্ভীর কোনও সন্তান ছিল না। তাই তিনি সন্তান কামনায় শিবের তপস্যা আরম্ভ করেন এবং শিবের বরে তিনি সন্তানসম্ভবা হন। কিন্তু সময়কালে দেখা গেল তিনি প্রসব করেছেন এক খণ্ড মাংসপিণ্ড। জড় মাংসপিণ্ড দেখে রানী কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে শিব দুঃখিত হয়ে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মাংসপিণ্ডকে ষাট হাজার ভাগে বিভক্ত করেন এবং সগর রাজা এই ষাট হাজার মাংসপিণ্ড থেকে ষাট হাজার বলবান পরাক্রমশালী পুত্র লাভ করেন, কিন্তু মহামুনি কপিলের ক্রোধে এই ষাট হাজার পুত্র ভস্মীভূত হয়। সগরের পুত্রদের শোকে মৃত্যু হল। দেবী গঙ্গার স্পর্শেই এই ষাট হাজার পুত্রের জীবনদান সম্ভব। রাজা সগরের পুত্র অসমঞ্জ গঙ্গার পূজা করলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অংশুমানও সমস্ত জীবন ধরে গঙ্গার আরাধনা করলেন। অংশুমানের পুত্র দিলীপেরও সমস্ত জীবন গঙ্গা আরাধনায় কাটল। দিলীপের পুত্র ভগীরথ গঙ্গার মর্তে অবতরণ করতে সক্ষম হলেন। ভগীরথ ছিলেন অতি বিচক্ষণ, বৈষ্ণবদের মধ্যে সেরা বৈষ্ণব। তিনি বহু বছর কৃষ্ণের ধ্যানে কাটালেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে পূর্ব পুরুষদের উদ্ধার লাভের জন্য প্রার্থনা করতে, কৃষ্ণ জাহ্নবীকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে সুরেশ্বরী, তুমি ভারতীয় শাপে মর্ত্যে গমন কর, আর সগর রাজার সন্তানগণকে উদ্ধার কর।'

অতঃপর দেবীগঙ্গা নারায়ণকে সম্বোধন করে বললেন, হে দেব, আপনার আদেশে এবং ভারতীয় শাপ গ্রহণের জন্যে আমি অবশ্যই মর্ত্যে যাব। কিন্তু প্রভু, আমার জালে পাপী মানুষ অবগাহন করবে এবং এত পাপ আমি কিরূপে গ্রহণ করব? কবে এই পাপ গ্রহণের শাপমুক্তি ঘটবে? আপনার শ্রীচরণে আবার কবে আমি মিলিত হতে পারব?

উত্তরে শ্রীহরি বললেন, 'তুমি ভারতে গিয়ে লবণাম্বু সমুদ্রের স্ত্রী হবে। এই সুমুদ্র আমারই অংশজাত। সমুদ্র তোমায় স্ত্রী হিসাবে পেয়ে ধন্য হবে। তুমি পাপহারিণী। যে ব্যক্তি শতেক যোজন দূরে থেকেও 'গঙ্গা' 'গঙ্গা' উচ্চারণ করবে' তারও সমস্ত পাপ দূর হবে, কিন্তু তুমি থাকবে কলঙ্কহীন হয়ে।

অতঃপর শ্রীহরির বাক্যে শান্ত হয়ে গঙ্গা মর্ত্যে আগমন করলেন। কিন্তু মর্ত্যে আগমন করলে কি হবে, গঙ্গার উদ্দাম পবিত্র জলরাশি ধারণ করবে কে? এগিয়ে এলেন দেবাদিদেব মহাদেব, গঙ্গা তাঁর উচ্ছ্বাস, আবেগ ও দুঃখ নিয়ে আছড়ে পড়লেন শিবের জটায়, সেই জটাজাল তাঁর দুঃখ ক্ষোভ হরণ করে

BanglaBook.org

ভারতের জন্য তাকে মাতৃরূপী গঙ্গা নদীরূপে বইয়ে দিলেন। সেই থেকে দেবাদিদেব মহাদেবের জটায় গঙ্গা অবস্থিত হলেন। তিনি হলেন গঙ্গাধর।

মহাভারতে 'গঙ্গা' এক গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র। রাজা শান্তনুর স্ত্রী তিনি। ভীষ্মের জননী। মহাভিষ নামে ইক্ষ্বাকু বংশীয় এক রাজা ছিলেন। তিনি বহু যাগযজ্ঞ করে স্বর্গে যান। একদিন তিনি দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন। সেখানে গঙ্গাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কথোপকথনের মধ্যে হঠাৎ গঙ্গার সূক্ষ্ম বসন হাওয়া উড়ে গেল। দেবগণ মাথা নিচু করে থাকলেন কিন্তু মহাভিষ দৃঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলেন গঙ্গার দিকে। মহাভিষের এই দেবনারীর প্রতি কুদৃষ্টি ব্রহ্মার ভাল লাগল না। তিনি তাঁকে আবার মর্ত্যলোকে জন্ম নেওয়ার শাপ দিলেন। মহাভিষ প্রতীপ রাজার পুত্র শান্তনু হয়ে জন্ম নিলেন। এদিকে গঙ্গা মহাভিষকে চিন্তা করতে করতে ফিরবার সময় পথে বসু নামক দেবগণকে মূর্ছিত হয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে তাঁদের এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলল বশিষ্ঠের শাপে তাঁদের এই দশা। তাঁদের নরযোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে, তাঁরা গঙ্গাকে অনুরোধ করে বললেন, মানুষী গর্ভে আমরা যেতে চাই না, আপনি আমাদের প্রসব করুন, কিন্তু হে দেবী, প্রসবের পরেই আমাদের দয়া করে জলে ফেলে দেবেন, যাতে আমরা শীঘ্র নিষ্কৃতি পাই। রাজা শান্তনু হবেন আমাদের পিতা। এই শর্তে গঙ্গা রাজি হলেন।

একদিন শান্তনু গঙ্গার তীরে বেড়াতে বেড়াতে দেবী গঙ্গাকে দেখে হলেন মোহিত। দু'জনের পরিচয় হল। বিবাহের কথায় গঙ্গা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, তাঁর কোন শুভ বা অশুভ কাজেই শান্তনু বারণ করতে পারবেন না। বিবাহ সম্পন্ন হল। রাজা শান্তনু স্ত্রীর গুণপনায় খুব সুখী কিন্তু কিছুদিন পরেই তার চমক ভাঙল, একটি করে তাঁদের পুত্র সন্তান হয়, আর গঙ্গা তাকে জলে ভাসিয়ে দেয়। এ কী নিষ্ঠুরতা। একটি একটি করে সাতটি পুত্রের একই দশা হল। অষ্টমপুত্রটি জলে ভাসাবার সময় শান্তনু তাঁকে বাধা দিলেন। প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী গঙ্গা নিজ পরিচয় ব্যক্ত করে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। এই শেষ পুত্র মহাভারতের গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম হিসাবে খ্যাত।

সুরধুনী গঙ্গার মতো দক্ষিণ ভারতে নর্মদা হলেন পবিত্রতোয়া। তিনি সর্বপাপহারি। নর্মদা শব্দের অর্থ হল যিনি আনন্দ-বিলাস প্রদান করেন। যিনি মানুষকে আনন্দ প্রদান করেন। কি করে সৃষ্টি হল নর্মদার! অমরকণ্টকের চূড়ায় তপস্যায় মগ্ন ছিলেন মহাদেব। বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন তিনি। তপস্যায় বিভোর শিবের নীলকণ্ঠ থেকে সৃষ্টি হল এক নারীর। তিনি নীলকণ্ঠ থেকে নির্গত হয়ে তাঁর ডান পায়ের উপর দাঁড়িয়ে শিবের তপস্যায় মগ্ন হলেন। এইভাবে

BanglaBook.org

বহুকাল কেটে গেল। দেবাদিদেব সমাধিমগ্ন, তাঁর পদতলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁরই কণ্ঠ উদ্ভূত কন্যা। তাঁর দিব্যতায় চারিদিক ভরে আছে, দেবীর এক হাতে অক্ষমালা অপর হাতে কমণ্ডলু। মাথায় জটাভার। হঠাৎ চোখ মেললেন শম্ভু, তাকিয়ে দেখতে পেলেন অপরূপ কন্যাকে। তিনি তপস্যা মগ্ন দেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি মা? তোমার কঠোর তপস্যায় আমি প্রীত হয়েছি। তুমি আমার কাছে বর গ্রহণ কর।' দেবী নর্মদা বললেন, 'সমুদ্রমন্থনের গরল পান করে তুমি নীলকণ্ঠ হয়েছ। হে মহেশ্বর, এই নীলকণ্ঠ থেকেই আমার উদ্ভব। আমি তোমার কন্যা, তোমার অংশজাত। তাই প্রার্থনা করি, আমি যেন ঠিক এইরকমভাবেই চিরকাল তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে পারি।' মহাদেব তাঁর কন্যার কথা শুনে বললেন, তাই হবে, তবে তুমি নীলকণ্ঠ থেকে জাত বলে কোনো ক্ষোভ রেখ না। তুমি আমার তপস্যার তেজ থেকে সৃষ্টি হয়েছ। তাই তুমি শুধু আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়েই থাকবে, তুমি হবে মোক্ষদাত্রী এবং সর্বসিদ্ধি—প্রদায়িনী।'

বরপ্রদান করে চলে গেলেন মহেশ্বর। কন্যা আবার বসলেন তপস্যায়। তাঁর কঠোর তপস্যায় দেবতাদের টনক নড়ল। শিবের ঠোঁটে খেলে গেল মৃদু হাসির রেখা। স্নেহের কন্যাকে পরীক্ষা করবেন মহেশ্বর। তাই হঠাৎ-ই দেবতারা মুগ্ধ হয়ে উঠলেন। দেবতারা চঞ্চল হয়ে নেমে এলেন মর্ত্যে। শিবকন্যাকে তাঁদের চাই। তপস্বীনীকে বহু অনুনয় বিনয় করলেন। অনেক প্রলোভন দেখালেন, কিন্তু কিছুতে ওই কন্যা টললেন না, বিচলিত হলেন না। প্রার্থনা যখন বিফল হল, তখন দেবতারা স্থির করলেন, শক্তি প্রয়োগ করে তাঁরা জয় করবেন কুমারীকে। দেবতাদের অভিসন্ধি জানতে পেরে তপস্বিনী কন্যা হলেন চঞ্চলা, নদীর রূপ ধরে গহন পর্বতের মধ্যে দিয়ে ছুটে চললেন কুমারী। দেবতারা তাঁর পেছন পেছন বহুদূর গেলেন, কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বিন্ধ্য পর্বতের কোলে বসে হাঁপাতে লাগলেন।

এতক্ষণ সবই লক্ষ্য করছিলেন দেবাদিদেব। কন্যার জয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে দেবশংকর আবির্ভূত হলেন এবং বললেন, হে কন্যা তোমার তেজ ও দৃঢ়তা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আজ থেকে তুমি আমার আনন্দ বিলাসের ক্ষেত্র হবে। আমি তোমার নাম দিলাম নর্মদা। আজ থেকে তুমি আমার জলময় রূপ। আজ থেকে আমি তোমার পুত্র হয়ে তোমার কোলে বিরাজ করব। তোমার জলে আজ থেকে আমি শিবলিঙ্গ রূপে বিরাজ করব।'—দেবাদিদেবের বরলাভ করে নর্মদা হলেন পুণ্যতোয়া। তাঁর তীরের প্রতিটি পারই শিবলিঙ্গ রূপে প্রসিদ্ধ।

অমরকন্টক হলো দেবী নর্মদার উৎপত্তি স্থল। দেবী শিবের কণ্ঠ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন বলে পর্বতের নাম প্রকৃতপক্ষে হল অমরকণ্ঠক। অমরকণ্ঠক থেকে অমরকন্টকে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার কোনো কোনো মতে ওই স্থানে বারংবার

BanglaBook.org

দেবতারা দৈত্যদের কাছে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়েছিলেন। তাই দেবতাদের কণ্টক স্বরূপ স্থানই অমরকণ্টক। শিব আরাধনার এ হল এক উল্লেখযোগ্য পবিত্র তীর্থস্থান।

মহাদেবকে মহাভারতে নানা প্রসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। তার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে সুন্দর কাহিনির মালা। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে মদ্ররাজ শল্যকে উদ্দেশ্য করে মহাদেবের ত্রিপুরাসুর বধের কাহিনি ব্যক্ত করছেন অতি দুষ্ট দুর্যোধন। তিনি এই গল্পের মাধ্যমেই শল্যকে মহাদেবতুল্য বীর রূপে প্রচ্ছন্নভাবে চাটুকারীতা করছেন। রণাঙ্গনে বর্ণিত ত্রিপুরাসুর বধের এই কাহিনি শল্যরাজের হৃদয়কে বিগলিত করতে সক্ষম হল না। কর্ণ এবং অর্জুনকে সমকক্ষ বীর বলে মনে করেন না শল্য। তিনি নীচজাতি ভুক্ত কর্ণকে নিজের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানহীন ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করছেন এবং এরই বিপরীতে আরেকটি পৌরাণিক কাহিনি উপস্থাপিত করছেন। শল্য কর্ণকে উদ্দেশ করে বলছেন, হে কর্ণ পুরাকালে সমুদ্রের কাছে কোন দেশে প্রচুর ধনশালী, যজ্ঞকারী দাতা, ক্ষমাশীল, পবিত্র স্বভাবের এক বৈশ্য ছিলেন। সেই বৈশ্য কোন ধার্মিক রাজার রাজ্যে বাস করতেন, তাঁর ছিল বহু পুত্র। পিতার আদরে পুত্রগুলি ছিল অশিক্ষিত। এই অশিক্ষিত অথচ যশস্বী বৈশ্য পুত্রদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে একটি কাক জীবনধারণ করত। বৈশ্যপুত্রেরা সর্বদাই কাকটাকে মাংসযুক্ত অন্ন, দই, ক্ষীর, পায়স, মধু ঘি ইত্যাদি খেতে দিত। নোংরা উচ্ছিষ্ট না খেয়ে বৈশ্যপুত্রদের উচ্ছিষ্টে পালিত কাকটি ধীরে ধীরে গর্বিত হয়ে উঠল।

একদিন সমুদ্রের তীরে কতগুলি সুন্দর হাঁসের দল এসে উপস্থিত হল। বৈশ্যপুত্ররা সেই হাঁসের দল দেখে কাকটিকে বলল, 'কাক! তুমি এইসব পক্ষীর থেকে অনেক ভালো।' অল্পবুদ্ধি সেই বৈশ্যপুত্ররা সকলে মিলে প্রতারণা করল, কিন্তু মূর্খতা ও দর্পবশত কাক ভাবল, তাদের কথাই সত্যি।' দুর্বুদ্ধি যুক্ত সেই কাক তখন হাঁসেদের গিয়ে বলল, এসো, আমরা উড়ে দেখি। কে কতবার উড়তে পারে, কত দ্রুত গতি সম্পন্ন তার একটা প্রতিযোগিতা হয়ে যাক না কেন।'

কাকের কথা শুনে হাঁসের দলের হাসি আর ধরে না। তাঁরা সান্ত্বনা বাক্যে কাককে শান্ত করার উদ্দেশ্যে বলল, 'দেখ আমরা মানসসরোবরবাসী হংস। এই পৃথিবীতে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে বিচরণ করি।' দুর্মতি কাক! দূরগমনের জন্য সর্বদা আমরা গৌরব লাভ করি, তুই আমাদের সঙ্গে কী করে প্রতিযোগিতায় পারবি?

হাঁসেদের কথা শুনে কাক বললেন, 'হংসগণ, তোমরা কি জান প্রায় একশ প্রকারে উড়তে পারি, আর একশ যোজন পথ অতিক্রম করতে পারি! কেবল তাই

BanglaBook.org

নয় চুয়ান্ন রকম নৃত্য করতে করতে উড়তে পারা যায়! তোমরা কোন নৃত্যটি দেখতে চাও বল। —কাকের কথা শুনে হাঁসেরা বললেন, কাক! অবশ্যই তুমি একশত পাতের যেকোন প্রকার পাতাটি ধরে উড়বে! আমরা কিন্তু একটি পাতই জানি। আমরা সেই ভাবেই উড়ব।

এরপর হাঁসের দল ও কাক দুজনেই আকাশে উড়ল। কাক তো চঞ্চলমতি। সে নানা প্রকার ভঙ্গিমায় উড়তে থাকল আর চীৎকার করে বলতে লাগল—'দেখ এই এইভাবে আমি গমন করছি!' তার 'কা কা' রবে অন্যান্য কাকেরাও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। কিন্তু হাঁসেদের মুখ থেকে কোনো কথা বের হল না। তাঁরা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ পরেই স্থলভূমি শেষ হয়ে সমুদ্রের বিশাল জলরাশি নয়নগোচর হল। হাঁসের দল এগিয়ে চলল, কাকও কিছুক্ষণ সাগরের উপর দিয়ে উড়ে চলল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পরিশ্রান্ত হওয়ার জন্য কোন স্থলভূমি না দেখতে পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। চারিদিকে সমুদ্রের জলরাশি দেখতে দেখতে বহুভাষী কাকের মাথা ঘুরে গেল। সে জলের মধ্যে গিয়ে ভাসতে লাগল। হাঁসেরা তাঁকে দেখে বললেন, হে কাক, তুমি তো অনেক রকমভাবে উড়তে জান—এ তোমার বিচরণের কিরকম পাত!' কাক জলে হাবুডুবু খেতে বলল, হংস! বিধাতা আমাকে কাক পক্ষিরূপে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং আমরা 'কা কা' রবে বিচরণ করি। এখন আপনার কাছে শরণাপন্ন হয়েছি। আপনি আমাকে জলের প্রান্তে নিয়ে চলুন। আমি বৈশ্য পুত্রদের উচ্ছিষ্ট ভোজনে দর্পিত হয়ে নিজেকে গরুড়ের মতো মনে করতাম এবং বহু কাক ও অন্যান্য পক্ষীদের অবজ্ঞা করতাম, এখন আপনার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছি। আপনি আমাকে তীর প্রান্তে নিয়ে চলুন। কাকের আকুতি শুনে হাঁসের দল তার জলে সিক্ত শরীরটিকে পা দিয়ে উঠিয়ে দ্বীপের মধ্যে রেখে এল। কাকের দর্প চিরকালের মতো চূর্ণ হল।

শল্য রাজ, কর্ণকে এই কাহিনি বলে তাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বারণ করছেন। পুরাণ ও মহাকাব্য বিশেষ করে শিবভাবনায় জীবজন্তু, পশুপাখি সব প্রতীক গল্পের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। যেমন হরি এবং ব্রহ্মার বিবাদের ফলে কেতকী পুষ্পের অভিশাপ গ্রহণ! নারায়ণ ও ব্রহ্মার দ্বন্দ দেখে জ্যোতিরূপ শিব হেসে উঠেছিলেন। তাঁর মস্তকে ছিলেন কেতকী পুষ্প, মহাদেবের দেহ হাসির জন্য আন্দোলিত হলে কেতকী ফুল শিবমস্তক চ্যুত হয়ে নীচের দিকে নেমে আসতে লাগলেন। পথে তাঁর সাথে দেখা হল ব্রহ্মার। শিবের মস্তকে বাস করার ফলে কেতকী ফুলটি তখন তাজা সুগন্ধ যুক্ত ছিল। ব্রহ্মা তাকে দেখে বুঝতে পারলেন, এই পুষ্প শৈবাধীন। কিন্তু ব্রহ্মার কথায় মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করার ফলে কেতকী ফুলকে পূজার উপাচার থেকে বহিষ্কৃত করলেন। ব্রহ্মাকে বললেন, 'হে দেবতা, তুমি মাননীয়

BanglaBook.org

হয়েও মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করেছ, তাই আজ থেকে তোমার পূজার চল থাকবে না। কেবল বিষ্ণুকে বর দিলেন শিব, আমরা তিন দেবতা এতদিন একত্রে পূজিত হতাম। আজ থেকে আমার মতোই তোমার পৃথক পূজার আয়োজন হবে, গড়ে উঠবে তোমার মন্দির।' দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে অভিশাপ পেয়ে ব্রহ্মার খুব দুঃখ হল। তিনি বললেন, হে ভোলানাথ আমি তোমাদের চেয়ে বয়সে বৃদ্ধ। আমাকে এভাবে অভিশপ্ত করো না। ভোলানাথ তখন বললেন, 'হে প্রজাপতি, আজ থেকে সমস্ত গার্হপত্য ও রাজসূয় যজ্ঞে আপনিই পৌরহিত্য করবেন। আপানাকে ছাড়া কোনো যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠিত হবে না।

শিবপুরাণে শিবলিঙ্গ আরাধনার প্রশস্তি করে বলা হয়েছে, যদি প্রতিদিন, শিবলিঙ্গ অর্চনা করা যায়, তবে সাধক সালোক্য, সামীপ্য, সারুপ্য, সৃষ্টি ও সাজুয্য লাভ করে। অর্থাৎ আরাধিত ঈশ্বরের নৈকট্য, তাঁর স্বরূপ, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সঙ্গে একত্বের অনুভূতি লাভ করে। যে স্থানে শিবের প্রকাশ সেই স্থানে অন্যসব স্থানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তীর্থ। যে তীর্থ মানুষের জীবনে মুক্তি এনে দিতে পারে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে মহাদেবের গুণ বর্ণনা আমরা পাই। মহামতি ভীষ্মকে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করছেন, 'হে প্রভাবশালী গঙ্গানন্দন! আপনি জগদীশ্বর এবং ব্রহ্মার নিয়ন্তা মহাদেবের মহৈশ্বর্য্যও যথাযথভাবে কীর্ত্তন করুন।'—যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে ভীষ্ম বললেন, 'হে পুত্র, হে রাজ শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী মহাদেবের গুণ বলতে আমি সমর্থ নই। যিনি সর্বব্যাপী হয়েও সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হন না। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রেরও সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু; আর ব্রহ্মা থেকে পিশাচ পর্যন্ত সমস্ত দেবতা যাঁর উপাসনা করেন সেই দেবাদিদেবের গুণ আমি কিরূপে ব্যক্ত করি! যোগী ও তত্ত্বদর্শী ঋষিরা যাঁকে প্রকৃতির থেকেও শ্রেষ্ঠরূপে এবং পুরুষের মধ্যে প্রধান রূপে ধ্যান করেন—তিনি নিরাকারা রূপে এবং আকাররূপে অরাধিত হন। হে পুত্র যুধিষ্ঠির! শঙ্খচক্র গদাধারী নারায়ণ, ব্যতীত, আমার মতো লোকের পক্ষে জগতের উৎপাদক সেই পরমেশ্বরকে জানতে কে সমর্থ হবে। ভরত নন্দন, মহাত্মা কৃষ্ণ যখন বদরিকা আশ্রমে আপন ভক্তির গুণে সেই রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করে জগতে প্রিয়ের থেকেও প্রিয়তর রূপে বন্দিত হয়েছেন। এই কৃষ্ণ দেবাদিদেবকে প্রসন্ন করবার জন্য এক বছর তপস্যা করেছিলেন। কারণ কৃষ্ণের একটি যোগ্য পুত্রের প্রয়োজন ছিল। পুত্রের জন্য মহাদেবের তপস্যা করে দেবাদিদেবের ঐশ্বর্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। রাজা, এই মহাবাহু কৃষ্ণ ভগবান মহাদেবের গুণ ও যথার্থ ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করতে সমর্থ।'

BanglaBook.org

মহামতি ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বললে, যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে শিব মহিমা খ্যাপনে উৎসাহিত করলেন। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে, শ্রীকৃষ্ণ জানালেন, তিনি

প্রতিটি মহির্ষীর গর্ভে মহাদেবের তপস্যা করেই পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। সব স্ত্রী পুত্রবতী হলে তিনি জাম্ববতীর অনুরোধে হিমালয়ে দেবাদিদেবের তপস্যার জন্য উপস্থিত হলেন। তিনি প্রথমে ঋষি উপমন্যুর আশ্রমে প্রবেশ করতেই, মহর্ষি তাঁকে বললেন, 'হে কৃষ্ণ! নিশ্চয়ই আপনি নিজের মতো পরাক্রমশালী পুত্রের জনক হবেন। আপনি এই আশ্রমে দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা করুন। কারণ জগদীশ্বর মহাদেব স্ত্রী সঙ্গে এই স্থানেই ক্রীড়া করেন। এই বলে ঋষি উপমন্যু জানালেন, সুমেরু পর্বতকে কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম—এই রকম দস্যু ছিল হিরণ্যকশিপু। সেই দানব দেবাদিদেবের তপস্যা করে দশকোটি বছরের জন্য দেবতাদের আধিপত্য লাভ করে। মন্দার নামে বিখ্যাত সেই হিরণ্য কশিপুরই পুত্র মহাদেবের বরে দশকোটি বছর পর্যন্ত ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। বিষ্ণুর সেই ভয়ঙ্কর সুদর্শন চক্র, যে চক্র স্বয়ং মহাদেব তাকে দান করেছিলেন। সেই 'সুদর্শন চক্র' মন্দারকে স্পর্শ করতে সক্ষম হল না। সেই সময় অত্যন্ত বলবান মন্দার যুদ্ধে সর্বদা দেবতার পীড়ন করতে থাকলেও দেবগণ কখনই মন্দারের ক্ষতি করতে সক্ষম হত না। শিব প্রভাবে মন্দার সর্বদাই সুরক্ষিত থাকত। ঠিক এইরকম ভাবেই মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বিদ্যুৎপ্রভ নামে এক অসুরকে ত্রিভুনের অধিশ্বরত্ব বরদান করলেন। এরফলে বিদ্যুৎপ্রভ লক্ষ বছর পর্যন্ত ত্রিভুনের অধীশ্বর হয়েছিল। মহাদেব তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি সর্বদা আমার অনুচর হবে। ভগবান মহাদেব বিদ্যুৎপ্রভকে রাজ্যরূপে কুশদ্বীপ দান করেছিলেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শিবভাবনা ঃ পুষ্পের পরিচয়

রামায়ণের কাহিনির সঙ্গে শিবপূজার ও শিব মাহাত্ম্যের নানা অংশ জড়িত হয়ে রয়েছে। শিব পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার মিথ্যাভাষণ ও কেতকী ফুলের অভিশপ্ত হওয়ার কথা আমরা আলোচনা করেছি। কেতকী ফুলের মতো আমাদের অতিপ্রিয় চাঁপা ফুলও শিবপূজায় অযোগ্য। কেন? এই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে রামায়ণের এক মনোজ্ঞ কাহিনি। সেখানে কেতকী ফুলের কথা বলা হয়েছে। কোনও এক সময় রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্র পিতা দশরথের আদেশে লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে ফল্গু নদীর তীরে কিছুকাল বাস করেছিলেন। রামচন্দ্রের বিরহে কাতর দশরথের তখন মৃত্যু হয়েছে। বনবাসে থাকতে থাকতে রামসীতা যখন ফল্গু নদীর তীরে উপস্থিত হলেন তখন পিতৃশ্রাদ্ধের কাল উপস্থিত হয়েছে। এই বনে কী করে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করব?—এই চিন্তা করে রামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণকে কাছের গ্রামে শ্রাদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। তখন লক্ষ্মণ রামের আদেশে একটি মাত্র পাত্র হাতে নিয়ে গ্রামের উদ্দেশে চললেন। মনের মধ্যে গভীর দুঃখ যিনি রঘুকুলপতি যিনি রাজা, তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের উপাচারের অভাব! লক্ষ্মণ গ্রামের দিকে এলেন বটে কিন্তু ফিরে আসতে দেরি করলেন। শ্রাদ্ধের সময় অতিক্রান্ত হতে চলেছে দেখে চিন্তিত রাম স্বয়ং লক্ষ্মণের খোঁজে নির্গত হলেন। ফল্গু নদীর তীরে একাকিনী রইলেন সীতা।

জানকী একা একা চিন্তা করতে লাগলেন, মধ্যাহ্ন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দিবাভাগে করণীয় শ্রাদ্ধ এখনও সম্পন্ন হল না। দেবর লক্ষ্মণের দেখা নেই, রঘুকুলপতি রামও ফিরছেন না। এদিকে শ্রাদ্ধের শুভ মুহূর্ত অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এরপরেই আরম্ভ হবে রাক্ষসী কাল। যে সময় শ্রাদ্ধের পক্ষে একান্ত অযোগ্য—এই সব ভাবতে ভাবতে জানকী নদীতে স্নান করে সামান্য কিছু দ্রব্য সংগ্রহ করে—আমিই আজ শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করব—এই ভেবে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করলেন। পিণ্ড প্রদান করা মাত্রই আকাশবাণী হল, 'হে জনকনন্দিনী আজ আমরা পরিতৃপ্ত হলাম, এর ফলে তুমিও ধন্য হলে। সেই দিব্যবাণীর সঙ্গে সঙ্গে নানা অলঙ্কারে ভূষিত কয়েকটি হাত সীতা দেখতে পেলেন, হাতগুলি পিণ্ড গ্রহণের জন্য অঞ্জলিবদ্ধ। সীতা তাঁদের পিণ্ড প্রদান করে বললেন, 'আমার পিণ্ড

BanglaBook.org

গ্রহণে আপনারা কারা উপস্থিত হয়েছেন তা আমাকে বলুন'। রাজা দশরথ তখন অদৃশ্যে থেকেই বললেন, 'সীতে! আমি তোমার শ্বশুর, আমার নাম দশরথ। তোমার দেওয়া পিণ্ডে আমরা পরিতৃপ্ত হলাম, তোমার কৃত শ্রাদ্ধ সফল হয়েছে।' সীতা দশরথের কথা শুনে বললেন, 'পিতা! আমার পতি আপনাদের হস্তদর্শনপূর্বক পিণ্ড গ্রহণের কথা যদি বিশ্বাস না করেন!' দশরথ উত্তর দিলেন, 'হে নিষ্পাপে! তুমি এই ঘটনার কতকগুলি সাক্ষী রাখো।' আকাশবাণী শুনে রাজকুলনন্দিনী সীতা সামনের ফল্গু নদী, ধেনু, অগ্নি ও কেতকী ফুলকে বললেন, 'তোমরা সকলে এ বিষয়ে সাক্ষী হয়ে রইলে।'

এই ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে রামচন্দ্র ফল্গু নদীর তীরে ফিরে এলেন এবং সীতাকে বললেন, 'হে সীতে! তাড়াতাড়ি শ্রাদ্ধের পিণ্ড প্রস্তুতের জন্য শুচি হয়ে এসো। শ্রাদ্ধের সময় অতিক্রান্ত হতে চলেছে, তোমার শ্বশুরও এই সময় নিশ্চয়ই উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং আর দেরি করো না।' রামচন্দ্রের কথা শুনে বৈদেহী তাঁর শ্রাদ্ধদানের কথা ও শ্বশুরকুলের শ্রাদ্ধে গ্রহণের ঘটনা যথাযথভাবে প্রকাশ করলেন। সীতা মুখে 'তাঁরা স্বয়ং হস্ত প্রসারণ করে পিণ্ড গ্রহণ করেছেন'—এই কথা শুনে রামচন্দ্র বিস্মিত হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, 'লক্ষ্মণ! জানকী যা বলল তুমি কি শুনতে পেলে? আমরা শাস্ত্রসম্মতভাবে আহ্বান করে যাঁদের দর্শন পাই না, এমনি আহ্বানে তাঁরা দর্শন দিলেন! এর বড় আশ্চর্য কথা! নিশ্চয়ই ক্লান্ত বৈদেহী ভুল দর্শন করেছেন।' অগত্যা স্বামীর কথায় সীতা লজ্জিত হয়ে বললেন, স্বামী এই অভূতপূর্ব ঘটনা আপনাকে বিশ্বাস করাবার জন্য আমি কতগুলি সাক্ষী রেখেছি, আপনি তাঁদের কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন!' সীতার কথা শুনে প্রজাবৎসল রাম বললেন, 'বেশ, আনো তোমার সাক্ষীদের। তাঁরা যদি এ ঘটনার বিবরণ দেয় তবে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করব।' সীতা তখন তাঁর চারজন সাক্ষীকে আহ্বান করলেন। ফল্গু নদী, অগ্নি, ধেনু ও কেতকী ফুল রামচন্দ্রের সামনে বললেন, 'হে দেব, সীতা যা বলছেন তার আমরা কিছুই জানি না।' সাক্ষীদের কথা শুনে রাম ও লক্ষ্মণ পরস্পর হাসলেন এবং সীতাকে শ্রাদ্ধের আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন।' এরপর সীতা পাক করলেন, রামচন্দ্র শ্রাদ্ধ করতে আরম্ভ করে পিতৃগণকে আহ্বান করলেন। সূর্য মণ্ডল থেকে তখনই আকাশবাণী হল, 'হে বৎস! কী জন্য আবার আমাদের আহ্বান করছো? জানকী তো আমাদের পিণ্ডদান করেছেন।' এই কথা শুনেও রাম বললেন, 'হে প্রভু, আমি এই কথা মানতে পারছি না।' আবার আকাশবাণী হল, 'হে রাম! জানকী শ্রাদ্ধ করেছেন, আবার শ্রাদ্ধ করো না।'

পূর্বপুরুষদের আকাশবাণীতে বিশ্বাস না করে রাম যখন শ্রাদ্ধক্রিয়া উদ্‌যাপনে আগ্রহী হয়েছেন তখন স্বয়ং সূর্য তাঁদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে বললেন, 'হে রাম,

BanglaBook.org

সীতা শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেছেন। আমি তাঁর হয়ে সাক্ষী প্রদান করছি।' সূর্যদেবের সাক্ষাৎ লাভ করে রাম নিশ্চিন্ত হলেন এবং সীতাকে বললেন, 'সীতে তোমাকে বধূরূপে লাভ করে আমাদের কুল পবিত্র হয়েছে। তুমি স্বয়ং পবিত্রতা স্বরূপিণী।' এরপর পাক করা অন্নগ্রহণ করে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, 'লক্ষ্মণ সীতার সাক্ষীরা তাঁর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে ঠিক করেননি।' স্বামীর উক্তি শুনে জানকী চারজনকেই অভিশাপ দিলেন। জানকী বললেন, হে ফল্গু নদী তুমি যা শুনেছো, যা দেখেছো, তা সম্বন্ধে সত্যি কথা বললে না। এজন্য আজ থেকে তুমি পাতালে প্রবাহিত হও।' কেতকী ফুলকে বললেন, 'হে কেতকী! আজ অসত্য ভাষণের জন্য তুমি সবসময়েই শিবের অগ্রাহ্য হবে।' এবং সামনে উপস্থিত গরুকে বললেন, 'হে নিষ্পাপে! তুমি যে মিথ্যা বললে, এ কারণে তুমি পুচ্ছদেশে পবিত্রতা ও মুখে অপবিত্রতা হও। আর অগ্নি আজ তুমি দেবতাদের মুখ স্বরূপ হয়েও মিথ্যাভাষণ করলে সুতরাং আজ থেকে তুমি সর্বভূক হবে।' অর্থাৎ শিব পুরাণ ও রামায়ণের কাহিনি অনুসারে কেতকী ফুল শিব পূজায় অযোগ্য হয়েছিলেন সীতার অভিশাপে। তবে পিতামহ ব্রহ্মার জন্য মিথ্যা হওয়ার কাহিনিও আমরা শিবপুরাণের মধ্যে পাই।

শিবপুরাণের মধ্যে চাঁপা ফুলের অভিশপ্ত হওয়ার কাহিনিও পাওয়া যায়। পুরাকালে দক্ষিণ ভারতে গোকর্ণদেশে মহেশ্বর 'গোকর্ণেশ' নামে খ্যাত ছিলেন এবং পূজিত হতেন। কথিত ছিল এই 'গোকর্ণেশ' শিব সর্বলোকের সুখদান করেন এবং তাঁকে দর্শন করলেই পাপরাশি ভস্ম হয়ে যায়। কোন এক সময় দেবর্ষি নারদ 'গোকর্ণেশ'কে দর্শন করার জন্য গোকর্ণদেশে উপস্থিত হলেন। গোকর্ণ দেশে উপস্থিত হয়ে পথের মধ্যে চাঁপাফুলের বাহার দেখে গাছের তলায় বসে পড়লেন। এক ব্রাহ্মণ সেই সময় চাঁপা ফুল তোলার জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হলেন এবং বীণাবাদনরত নারদকে দেখতে পেলেন। নারদকে দেখে ব্রাহ্মণ ভাবলেন, এঁর সামনে যদি ফুল সংগ্রহ করি তবে ইনি ফুল সংগ্রহের উদ্দেশ্য কী এবং তার ফল কী?—এইসব প্রশ্ন অবশ্যই করবেন। সুতরাং এখন ফুল না তোলাই বাঞ্ছনীয়। এদিকে ব্রাহ্মণকে 'সাজি' হাতে দেখে নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্রাহ্মণ, তুমি এখানে কিসের জন্য উপস্থিত হয়েছো? তোমার হাতে ওটা কী? ব্রাহ্মণ সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে উঠল, 'দেবর্ষি আমি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষার জন্য নির্গত হয়েছি।' এরপর নারদ গোকর্ণেশ মন্দিরে গিয়ে দেব দর্শন করলেন এবং দেবতাকে তুষ্ট করলেন। এই সময় ব্রাহ্মণ মনের সুখে চাঁপা ফুল তুলে 'সাজি' ভর্তি করলেন, পথে নারদের সঙ্গে তাঁর আবার দেখা হল। নারদ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'ব্রাহ্মণ তুমি কোথায় যাচ্ছো?' ব্রাহ্মণ আবার মিথ্যা কথা উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, 'আমি

BanglaBook.org

ভিক্ষার জন্য নির্গত হয়েছিলাম কিন্তু ভিক্ষা না পেয়ে ফিরে চলেছি।' ব্রাহ্মণের কথা শুনে নারদ বুঝতে পারলেন, এই ব্যক্তি সত্য কথা বলছে না। তিনি সত্য জানবার জন্য চাঁপা ফুলের বৃক্ষের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে পাদপশ্রেষ্ঠ, ওই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ কোথায় গেল এবং কতগুলো পুষ্প গ্রহণ করল।' চম্পক বৃক্ষকে ব্রাহ্মণ সত্য কথা উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছিল। তাই চাঁপা ফুলের গাছ মাথা নেড়ে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'ব্রাহ্মণ কে? পুষ্প কী? তুমি কে?'

চম্পক বৃক্ষের কাছে কপট বিস্ময়ে মিথ্যা কথা শুনে নারদের কৌতূহল হল। নারদ আবার শিব সন্নিধানে গমন করলেন। দেখলেন, ইতিমধ্যে একশ একটি চাঁপা ফুল দিয়ে কে একজন পূজা করে গিয়েছে। অন্য এক ব্রাহ্মণ তখন পূজা করতে উদ্যত হয়েছে। নারদ সেই ব্রাহ্মণকে দেখে বললেন, 'তুমি কে? কী প্রার্থনা করছো? এই ফুলগুলি কে নিয়ে এসে পূজা দিয়ে গেল।' নারদের প্রশ্ন শুনে ব্রাহ্মণ বললেন, 'হে, দেবর্ষি ভগবান শিবকে পূজা করে আমি মুক্তি প্রার্থনা করছি। একজন ব্রাহ্মণ চাঁপা ফুল দিয়ে নিত্য শিবপূজা করে রাজাকে মুগ্ধ করেন সে ওই রাজার কাছে প্রচুর ধন গ্রহণ করে অন্য ব্রাহ্মণদের বঞ্চিত করছে এবং ধনমদে মত্ত হয়ে অন্য ব্রাহ্মণদের অত্যাচার করছে। সে এতই গর্বে স্ফীত যে আত্মীয় ও পর ভেদ করে না। হে প্রভু, আমি পুজোর জন্য এই ফুল শিবের পায়ে সমর্পণ করছি। নারদ ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, তোমার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে এতে কোনও সন্দেহ নেই।'

ব্রাহ্মণকে বরদান করে নারদ মনে মনে ভাবলেন, ওই মিথ্যেবাদী ব্রাহ্মণ শম্ভুকে ফুলের মাধ্যমে বশে রেখে রাজাকে সন্তুষ্ট করেছে। ব্রাহ্মণদের পীড়া দিচ্ছে এবং রাজার দানশালার অধ্যক্ষ হয়ে অন্য ব্রাহ্মণদের বঞ্চিত করছে। এ অবস্থার পরিবর্তন একান্ত দরকার! তিনি একান্তে গোকর্ণেশ শিবকে বললেন, 'হে দেব, এই অত্যাচারী ব্রাহ্মণকে এইরকমভাবে আপনি বরদান করছেন কেন? সে যে সকলের পীড়নের কারণ হয়ে উঠেছে।' শিব নারদের কথা শুনে উত্তর দিলেন, 'হে নারদ, আমি কী করব, ওই মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণ চাঁপা ফুল থেকেই এই সম্পদ লাভ করছে। কারণ যে ব্যক্তি আমাকে চাঁপা ফুল দিয়ে পূজা করবে, ত্রিজগৎ তার বশীভূত হবে। সুতরাং আমি কী করব।'

শিব ও নারদের আলাপনের সময় হঠাৎ এক ব্রাহ্মণী সেখানে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণী কাঁদাতে কাঁদতে নারদকে বললেন, 'হে দ্বিজবর, আমার দুঃখের কারণ শুনুন। সম্প্রতি আমার অদৃষ্ট দোষে আমার স্বামী পঙ্গু হয়েছেন। আমার একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা রয়েছে। তাঁর বিবাহ দেবার জন্য আমার স্বামী রাজার

BanglaBook.org

কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। সেই অর্থে অধিকাংশ মিথ্যেবাদী ব্রাহ্মণটি হস্তগত করেছে। ওই ব্রাহ্মণ রাজাকে অন্ধ করে তুলেছে। রাজা তাঁর বিষয়ে অভিযোগ থাকলেও কোনও প্রতিকার করেন না। এখন আমি কী করব? কোথায় যাব? কোন রক্ষকই আমার নেই। ওই ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শিবপূজার জন্য এই মন্দিরে আগমন করে।' ব্রাহ্মণীর কথা শুনে নারদ প্রশ্ন করলেন, 'হে ব্রাহ্মণী, তোমার স্বামীকে রাজা কী ধন প্রদান করেছেন?' ব্রাহ্মণী বললেন, 'হে দ্বিজবর, রাজা একটি প্রসবের জন্য প্রস্তুত গাভী দিয়েছেন আর কিছু অর্থ প্রদান করেছেন।

আমার স্বামী কখনও এমন দান গ্রহণ করেন না, কেবল কন্যা বিবাহযোগ্যা বলে তিনি রাজার কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এখন দুষ্ট মিথ্যেবাদী দানশালার অধ্যক্ষ ব্রাহ্মণ আমাদের বলছেন, ধন এবং ধেনু—দুটোই ভাগ করে অর্ধেক আমাকে দাও। ধন ভাগ করা যায়, কিন্তু ধেনু কি ভাগ করা সম্ভব? কারণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে গো-এর অধিকার বিভক্ত করলে পাপ হয়। এখন আমি কী করব।' ব্রাহ্মণীর কথা শুনে নারদ বুঝলেন এঁকে ওই মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণের হাত থেকে রক্ষা করা দরকার এবং একটা বিহিত করা প্রয়োজন। তিনি ব্রাহ্মণীকে সান্ত্বনা দিয়ে দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে গোপনে তাঁর বক্তব্য নিবেদন করতে চললেন।

গোকর্ণ দেশের গোকর্ণের শিবকে চাঁপা ফুল দিয়ে পূজা করে দুষ্ট ব্রাহ্মণ রাজাকে বশীভূত করেছে। ধনশালার অধ্যক্ষ হয়ে অন্যান্য ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার শুরু করেছে। দেবর্ষি নারদ ব্রাহ্মণীর কাছে তাঁর সমস্ত দুঃখ বৃত্তান্ত অবগত হয়ে রুদ্ধদ্বারে গোকর্ণেশ মহাদেবকে মিনতি করলেন এবং বললেন, 'হে প্রভু, যে ব্যক্তি এইরকম অসাধু তাঁর হাতে কেন পূজা গ্রহণ করেন? এই ব্রাহ্মণের মতো দুষ্ট, পরদ্রব্যাপহারী আর কে আছে? হে দেব, রাজার কাছে প্রাপ্ত ভিক্ষায় ভাগ বাসানো অতি পাপকর্ম। তারপর গোবিভাগ!'—যে কাজ একান্ত গর্হিত—আপনার ভক্ত ব্রাহ্মণ সেই মহাপাপ কাজ করতে উদ্যত হয়েছে। হে দেবাদিদেব, শাস্ত্রমতে গোমাতার মধ্যে জগত অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। শাস্ত্রে বলে গরুর দক্ষিণ শৃঙ্গে গঙ্গা অবস্থান করেন, বাম শৃঙ্গে যমুনা আর শৃঙ্গমধ্যে দেবী সরস্বতী বিরাজমান। যাঁর স্কন্ধে ব্রহ্মা, মধ্যদেশে নন্দী প্রভৃতি অনুচর সমেত রুদ্র, কটিদেশে বিষ্ণু পৃষ্ঠভাগে তীর্থসকল, দক্ষিণ কুক্ষিতে ঋষিগণ, বাম কুক্ষিতে দেবগণ, অধোভাগে নদীগণ, খুরদেশে চারটি বেদ, দুগ্ধধারায় সমুদ্রগণ অবস্থিত। এইরূপ অতি পবিত্রা গোমাতাকে আপনার ভক্ত বিভক্ত করতে চাইছে সেই ভক্তকে আপনি পদতলে ঠাঁই দেন কী করে?'—এতদূর প্রার্থনা করেও দেবর্ষি থামলেন না, কারণ সেই যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ ধন হল গোধন'। এই গোধনে কখনই বিভাজনের কথা

BanglaBook.org

উঠত না তাই দেবর্ষির মুখে মহাদেবকে প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে শিবপুরাণে চিত্রিত হল গোমাহাত্মের আরও কিছু বর্ণনা। দেবর্ষি নারদ বলে চললেন গোকর্ণেশ মহাদেবকে, 'এই ত্রিজগৎ স্বরূপিণী গোমাতাকে যে ব্যক্তি পূজা করে আর প্রদক্ষিণ করে, সে নিশ্চয় পৃথিবী প্রদক্ষিণের পুণ্যলাভ করে। পৃথিবী প্রমাণ স্বর্ণ ও ধেনু প্রদানের মধ্যে—ধেনুদানই শ্রেষ্ঠতর। মানুষ যাঁর দুধ পান করে গঙ্গাজল পানের ফল প্রাপ্ত হয়, যাঁর বিষ্ঠা বা মুত্র পান করলে সমস্ত রকম পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যে গোমাতার সকল অঙ্গই পবিত্র; এই গোমাতাকে স্পর্শমাত্রই সমস্ত রকম পাপ বিনষ্ট হয়। পৃথিবী মধ্যে গোদান, পৃথিবীদান ও বিদ্যাদান করলে শতসংখ্যক পূর্বপুরুষ নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করেন। হে দেবদেব, যে সমস্ত মহাপাপের কোনও প্রায়শ্চিত্ত নেই, সেই পাপও গোদানের মাধ্যমে বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি সুরূপা, বহু পয়স্বিনী, সৎস্বভাবা, সবৎসা ধেনুর শৃঙ্গদ্বয়ে সুবর্ণ, খুরে রৌপ্য, নয়নে প্রবাল, কণ্ঠে অলঙ্কার, সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্র ও পিঠে তাম্র দিয়ে এবং তাকে কাঁসার দোহন পাত্রসমন্বিতা করে, তীর্থাদি কোনও পবিত্র স্থানে, শুভ সময়ে সদব্রাহ্মণকে অর্পণ করে, তার কিছুই দুর্লভ হয় না। মাতৃবিক্রয়, কন্যাবিক্রয়, বেদবিক্রয় ও গোবিক্রয় করলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।' এই ব্রাহ্মণ সেই পাপে উদ্যত হয়েছে, 'হে দেব, ওই ব্যক্তি আপনার ভক্ত, আপনি কি এর প্রতিবিধান করবেন না?'

দেবর্ষি নারদের মুখে গোকর্ণেশ মহাদেব গোমাতার বন্দনা শুনে বললেন, 'হে নারদ, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। তুমি যা ভাল বোঝো তাই করো। ওই ব্রাহ্মণ যাতে নিজের পাপফল ভোগ করে সদ্‌গতি লাভ করতে পারে এবং আমার ভক্তে পরিণত হয়—সেই চেষ্টাই তুমি করবে। তোমার সকল কাজে আমার সম্মতি রইল।' গোকর্ণেশ মহাদেব এই কথা বললে দেবর্ষি তাঁকে প্রণাম করে সেই চম্পক বৃক্ষের কাছে উপস্থিত হলেন। যে বৃক্ষের পুষ্প দিয়ে দুষ্ট ব্রাহ্মণ মহাদেবকে তুষ্ট করেন।

চম্পক বৃক্ষ দেবর্ষিকে আসতে দেখে মনে মনে প্রমাদ গুণল। ঢেঁকি চড়ে দেবর্ষি বারংবার আমার কাছেই আসছে কেন? আমি সুন্দর সোনার চাঁপা ফুল ব্রাহ্মণকে দিই। সে তো দেবাদিদেবকে তুষ্ট করার জন্য। আমার ফুল শিবশম্ভুর ভালো লাগে বলেই তো আমার এত খাতির। ব্রাহ্মণ আমার উপকারই করেন। অথচ দেবর্ষি যেন বড় বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন।' বিরক্ত চাঁপা গাছ তার ফুলে পূর্ণ শাখাগুলিকে আরও দ্রুত আন্দোলিত করতে লাগল। খুবই বিরক্ত সে। নারদ তখন সেই বৃক্ষকে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে বৃক্ষবর! কোন ব্যক্তি প্রতিদিন তোমার পুষ্প চয়ন করে নিয়ে যান—আমার কাছে সত্য করে বলো।' নারদের প্রশ্নে চম্পক বৃক্ষ প্রথম কোনও উত্তর প্রদান না করে পরে দেবর্ষিকে আগের

BanglaBook.org

মতোই মিথ্যা কথা শোনালেন। তখন শিবের আদেশে দেবর্ষি নারদ চম্পক বৃক্ষকে শাপ দিয়ে বললেন, ''হে চম্পক! আমি সত্য বলছি তোমার মতো গুণবান ব্যক্তি যদি সত্য বাক্য বলে তবে তার ইহলোক ও পরলোক কিছুই দুর্লভ থাকে না, কিন্তু এখন তোমায় আমি তোমার মিথ্যা কথা বলার ফল প্রদান করছি, আজ থেকে ত্রিলোক মধ্যে তুমি শিবের অমান্য হবে এবং তোমার ফুল কোনও সময়ই শিবপূজার যোগ্য হবে না।'

চাঁপা ফুলের গাছ অভিশপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণের সেখানে আবির্ভাব হল। আজও সে শিবপূজার জন্য ফুল সংগ্রহ করতে উপস্থিত হয়েছে।

নারদ তাঁকে দেখেই ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, 'রে দুষ্ট! তুই নিশ্চয়ই রাজার কাছে গিয়ে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার করছিস। চম্পক পুষ্পের প্রভাবে ভগবান শিবকে বশ করে ব্রাহ্মণদের কষ্ট দিচ্ছিস! এই পাপে তুই ব্রাহ্মণ থেকে রাক্ষসে পরিণত হ'। নারদ শাপবাক্য উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ বুঝতে পারলেন দেবর্ষি নারদ কী ভয়ানক অভিশাপে তাঁকে অভিশপ্ত করেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দেবর্ষির পায়ে পড়ে অনুরোধ করলেন, 'হে প্রভু, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, আমার প্রতি কৃপা করুন।' ব্রাহ্মণকে ওইভাবে কাঁদতে দেখে নারদ শিবের আদেশ স্মরণ করলেন। দেবাদিদেব তাঁকে বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ নিজের কৃত কর্মের শাস্তিলাভ করুক কিন্তু তারপরে আবার আমার ভক্তে পরিণত হোক। শিবের কথা স্মরণে রেখে আর ব্রাহ্মণকে ওইভাবে কাঁদতে দেখে নারদ দয়াপূর্ণ হৃদয়ে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ! আমি কখনও শত্রুর প্রতিও ভুল করে মিথ্যা উচ্চারণ করি না। এই কারণে আমার অভিশাপ নিশ্চয়ই ফলবতী হবে।' নারদের অভিশাপে ব্রাহ্মণ বিরাধ নামে রাক্ষসত্ব লাভ করল। নারদ তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ তুমি অভিশপ্ত হলে বটে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করলেই তোমার শাপমুক্তি ঘটবে। তুমি শ্রীরামচন্দ্রের হাতে নিহত হবে এবং দেবাদিদেব শঙ্করের আশীর্বাদে আবার সুন্দর রূপ লাভ করবে।' বিরাধ রাক্ষসকে এই কথা বলে নারদ গোকর্ণেশ শিবকে প্রণাম করে গোকর্ণপুরী ত্যাগ করলেন। তাঁর অভিশাপে চাঁপা ফুল চিরকাল শিবপূজার অযোগ্য হয়ে রইল।

শিবপুরাণে বর্ণিত শিবপূজায় চাঁপা ফুলের অপাংতেয় হওয়ার কাহিনির মধ্যে সব থেকে চমকপ্রদ অংশ হল নারদ বর্ণিত গোমাহাত্ম; পুরাণগুলি হল তৎকালীন সমাজব্যস্থার ছবি তুল্য। গোকর্ণেশ শিবের মধ্যেও গো-সম্পর্কিত একটু ছোঁয়া পাওয়া যায় কারণ গোকর্ণপুরী অর্থাৎ গরুর কানের সদৃশ অঞ্চল—এই অঞ্চলের প্রধান দেবতা হলেন গোকর্ণেশ; তাঁরই কাছে গোমাতার মাহাত্ম খ্যাপন করছেন দেবর্ষি নারদ। এই গোস্তুতিকে গল্পের ক্ষেত্রে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও,

BanglaBook.org

গোমাহাত্ম্যও গরুর প্রয়োজনীয়তা তৎকালের সমাজে কতটা প্রাসঙ্গিক ছিল তা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়।

যাই হোক, আমরা শিবপূজা, শিব আরাধনার নানা উপকরণ নিয়ে আলোচনায় ফিরে যাব, বাস্তবিকই বড় বিচিত্র এই দেবতা, কেতকী ও চম্পকের মতো সুবর্ণ যুক্ত সুগন্ধযুক্ত পুষ্প অভিশপ্ত হলে, শিব নিজের মাথায় তুলে নিলেন গন্ধ বর্ণহীন ধুতুরা ফুলের ডালি। গুণের দিক দিয়েও এই পুষ্পের কোনও স্থান নেই। বরঞ্চ এই ফুলের বীজ অতি ভয়ানক বিষ—যা অনায়াসে একটি প্রাণীর জীবন নিতে সক্ষম। দেবাদিদেব সেই নীলকণ্ঠ বিষ ধারণের মতোই জটায় ধারণ করেছেন সেই বিষযুক্তা পুষ্প। জীবনের কাছে যা অপ্রয়োজনীয়, মৃত্যুর যা কাছাকাছি সেখানেই নির্ভয় হস্ত স্থাপন করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেবাদিদেব শঙ্কর। সকল জীবের তিনি মঙ্গল করেন তাই তিনি শঙ্কর।

শিবপুরাণ অনুযায়ী দেবাদিদেব কেতকী ও চম্পক—এই দুই পুষ্প ছাড়া আর সব ফুলেই তুষ্ট হন। এই পুরাণ অনুযায়ী যে ব্যক্তি ধুতুরা ফুল দিয়ে শিব পূজা সম্পন্ন করেন তিনি পুত্রলাভ করেন। যে ধুতুরা ফুলের লাল রক্তবর্ণ সেই ধুতুরা ফুলই শিবপূজায় প্রকৃষ্ট। এছাড়া দূর্বা দিয়ে শিবপূজা করলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। বকফুল দিয়ে শিব পূজা করলে বিপুল যশ বৃদ্ধি পায়। তুলসী পত্রের মাধ্যমে শিবপূজা করলে ভোগ ও মোক্ষ ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি আকন্দ ফুল দিয়ে শিব পূজা করে, জবাকুসুম দিয়ে শিবপূজা করে তাঁর অবশ্যই শত্রুবিনাশ হয়। করবীর পুষ্প দিয়ে পুজো করলে রোগ থেকে মুক্ত হয়, বন্ধুক পুষ্প দিয়ে পূজা করলে ভূষণ ও জাতি-পুষ্পের মাধ্যমে শিবপূজা করলে বাহনসম্পদ লাভ হয়। অতসী ফুল দিয়ে শিবের পূজা করলে পূজক বিষ্ণুর ভক্ত হয়। কোনও পুরুষ শমীপত্র দিয়ে পুজো করলে মুক্তিলাভ করে। কোনও নারী যদি যুথিকা ফুল দিয়ে শিবপূজা করে তাঁর গৃহ কোনওদিন শস্যহীন হয় না। মল্লিকা ফুলে শিবপূজা সম্পন্ন হলে পূজক কল্যাণকারী পত্নী লাভ করে।

যে কোন ফুলই দেবাদিদেব মহাদেবকে লক্ষ বার অর্পণ করলে মানুষ মহৎ ফল লাভ করে। তিল দিয়ে পূজা করলে মহাদেব স্বয়ং তাঁকে মুক্তি প্রদান করেন। ধানের মাধ্যমে পূজা করলে বা শিবের উদ্দেশে তণ্ডুল সমর্পণ করলে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হয়। লক্ষ তিল দিয়ে মহাদেবের তৃপ্তি সাধন করতে পারলে মানুষ মহাপাতকের পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়। লক্ষ যবের মাধ্যমে যিনি শিবপূজা করেন তাঁর পূজা মানস সরোবরে কৃত পূজার ফলের সমতুল্য।

শিবপুরাণে পুষ্প, শস্য ছাড়াও অন্যান্য উপকরণ সহযোগে শিবপূজার মাহাত্ম্য খ্যাপন করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, রুদ্রের স্তব, জপ, বেদের

BanglaBook.org

পুরুষসূক্ত ও শতরুদ্রীয় মন্দ্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শিবলিঙ্গে জলধারা প্রদান করলে বহু ফল হয়, মানুষ শ্রীবৃদ্ধি করে, বংশবৃদ্ধি হয় এবং প্রবল জ্বর তুল্য রোগের শান্তি হয়। গঙ্গা জলের ধারা দিয়ে শিব পূজা করলে মোক্ষফল লাভ হয়। ঘৃতের মাধ্যমে শিব লিঙ্গ পূজা করলে ক্লীবত্ব দূর হয়। জড়বুদ্ধিযুক্ত মানুষ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদনের জন্য শর্করামিশ্রিত দুধ দিয়ে মহাদেবকে স্নান করাবে। এছাড়াও কোনও ব্যক্তির স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলে, দৈহিক কষ্টে ও গৃহবিবাদে শিবের এই ধারাস্নান অতীব ফলপ্রদ। শত্রু জয়ের জন্য সুবাসিত তেলের মাধ্যমে শিবপূজা করবে। মধুর মাধ্যমে শিবপূজা করলে বাতশ্লেষ্মা রোগ থেকে মুক্তিলাভ হয়। ইক্ষুরসে শিবপূজা সম্পন্ন করলে মানুষের সকল দুঃখ দূর হয়। সুতরাং শিব পুরাণ অনুযায়ী কেবল ফুল জলে তুষ্ট মহাদেবকে নানা উপকরণে পূজা করলে তার শুভ ফল অনায়াসে লাভ করা সম্ভব।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শিবপূজা ও উপাচার

নানা উপাচারে পূজা করলে দেবাদিদেব তুষ্ট হন। কিন্তু তা বলে উপাচারবিহীন পূজকের উপর তিনি কদাপি রুষ্ট হয়েছেন, এরকমটি দেখা যায় না। বরং আশুতোষ সর্বদাই অল্পে তুষ্ট। যেভাবেই হোক শিবের পূজা করলেই তার উপর তুষ্ট হন শঙ্কর। এইরকম নানা কাহিনি পুরাণের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলির মধ্যে একটি হল এই রকম।

অবন্তিনগরে এক দীক্ষিত ব্রাহ্মণের বাস ছিল। সেই ব্রাহ্মণ ছিলেন বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে পারদর্শী। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন সৎকুলোৎপন্না ও পতিধর্মপরায়ণা। তিনি ভক্তিভাবে পতির আজ্ঞা পালন করতেন। এই ব্রাহ্মণের সুনিধি ও বেদনিধি নামে দুটি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুনিধি পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন, বেদনিধি বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেও বারবণিতা সঙ্গ তার চরিত্রকে কলুষিত করে তুলেছিল। বেদনিধি বেদজ্ঞ হলেও বারবণিতার গৃহে সর্বদা ভোজনাদি করত। ব্রাহ্মণ কনিষ্ঠ পুত্রের এই আচরণ জানতে পেরে বারংবার তাঁকে নিষেধ করলেন। কিন্তু তবুও বেদনিধি তাঁর স্বভাব পরিবর্তন করল না। সে পিতামাতার অবাধ্য হয়েও বারবণিতা সঙ্গে তুষ্ট হয়ে রইল।

একদিন অবন্তিনগরের রাজা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রতি তুষ্ট হয়ে তাঁকে কিছু অমূল্য রত্ন দান করলেন। ব্রাহ্মণ গৃহে এসে গোপনে ব্রাহ্মণীকে সেই অলঙ্কারগুলি রাখতে দিলেন। ব্রাহ্মণ যখন ব্রাহ্মণীকে সেই অলঙ্কারগুলি প্রদান করছেন তখন দুষ্ট বেদনিধি তা দেখতে পেল। ব্রাহ্মণী অন্যত্র চলে যেতেই সে সেই গুলি নিয়ে বারবণিতাকে প্রদান করল। ব্রাহ্মণী গহনা চুরি ঘটনা জানতেও পারলেন না।

এদিকে বেদনিধি যে বারবণিতাকে অলঙ্কারগুলি প্রদান করেছিল সেই নর্তকী বারবণিতা রাজার সামনে নৃত্যের সময় সেই দুর্মূল্য অলঙ্কারগুলি পরলেন। রাজা নর্তকীর অঙ্গে তাঁর প্রদত্ত গহনা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি নর্তকীকে বন্দী করে কোথায় সে এই অলঙ্কার লাভ করেছে তা বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। নর্তকী প্রথমে সবকিছু অস্বীকার করলেও রাজার ভর্ৎসনায় কাতর হতেই রাজা তাঁর অঙ্গ থেকে অলঙ্কারগুলি খুলে নিয়ে ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠালেন।

BanglaBook.org

রাজার আদেশে ব্রাহ্মণ উপস্থিত হলে, রাজা তাঁকে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আমি কয়েকদিন আগে আপনাকে কতগুলি গহনা দান করেছিলাম। আজ আমার সেই গহনাগুলি দেখবার বিশেষ প্রয়োজন, আপনি গৃহে গিয়ে সেই গহনাগুলি সংগ্রহ করে আনুন।' রাজার আদেশে ব্রাহ্মণ দ্রুত ব্রাহ্মণীর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, 'প্রিয়ে, তোমাকে রাজার প্রদত্ত যে গহনাগুলি দিয়েছি সেগুলি এখুনিই একবার দাও তো।' ব্রাহ্মণী যে স্থানে অলঙ্কারগুলি লুকিয়ে রেখেছিলেন সেই স্থানটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও অলঙ্কারগুলি পেলেন না। তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন, 'হে প্রভু, আমি যত্ন সহকারে অলঙ্কারগুলি রক্ষা করেছিলাম, নিশ্চয়ই কোনও গুপ্ত চোর সেই গুপ্ত স্থান থেকে গহনাগুলি নিয়ে গিয়েছে।' ব্রাহ্মণীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ খুবই ভীত হলেন। ছুটতে ছুটতে উপস্থিত হলেন রাজার কাছে।— 'হে রাজন, ব্রাহ্মণীর কাছে আপনার প্রদত্ত গহনাগুলি রাখতে দিয়েছিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণী এখন তা খুঁজে পাচ্ছেন না। আমি এখন কি করব?' ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা নর্তকীর কাছে গহনা প্রাপ্তির ঘটনা-সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। রাজার প্রদত্ত গহনা বারবণিতার কাছে! ব্রাহ্মণ এ দারুণ সংবাদে মর্মাহত হয়ে ছুটতে ছুটতে এলেন বাড়িতে। কে এমন করল? ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী পরামর্শ করে বুঝলেন এ তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র বেদনিধি কাজ। তাঁরা তখন পুত্রকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'রে পুত্র! তুই এই গৃহ পরিত্যাগ কর। আমাদের তোর মতো বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুত্রের প্রয়োজন নেই। তুই আমাদের বংশের মুখে কালিমা লেপন করেছিস। আজ থেকে তোর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। 'পিতামাতা পরিত্যাগ করলে বিলাসপ্রিয় বেদনিধি উপস্থিত হলেন সেই নর্তকীর কাছে। ধনহীন পুরুষ নর্তকীর কোনও প্রয়োজন নেই। উপরন্তু যে পুরুষের জন্য স্বয়ং রাজার কাছে অপমানিত হতে হয়েছে। নর্তকীও বেদনিধিকে তিরস্কার করে বের করে দিল। বেদনিধি তখন অন্য এক বারবণিতার ঘরে রাত্রি যাপন করে সকালে নগরের প্রান্তে এক শিবমন্দিরের তলায় উপস্থিত হল। তখন বেদনিধি তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধিত। কিন্তু ক্ষুণ্নিবৃত্তি লাভ করার কোনও উপায় নেই। ব্রাহ্মণ পুত্র হঠাৎ দেখতে পেল, নগরের নর-নারীরা পূজা ও প্রসাদের পাত্র হাতে করে মন্দিরের দিকে আসছে। গণনা করে বুঝল, আজ শিবরাত্রি ব্রতের দিন। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল বেদনিধি, আজ প্রচুর ফল, মুল নিয়ে ভক্তরা মন্দিরে উপস্থিত হবে। আমি সেই ভগবানে নিবেদিত অন্ন ভক্ষণ করব। এই বুদ্ধি করে মন্দিরের একপাশে লুকিয়ে থাকল। কখনও বা শিবমন্দিরের ভিতরে গমন করে অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে পূজা দেখতে লাগল। শিবরাত্রি ব্রত সমস্ত রাত্রিব্যাপী উদ্‌যাপিত হয়। বেদনিধি রাত্রির অপেক্ষা করে জাগতে লাগল। এরপর রাত গভীর হতে লাগল। ভক্তরা প্রহরে প্রহরে পূজা

BanglaBook.org

করার জন্য কেউবা মন্দিরে কেউবা ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ বেদনিধি, সেই সময় সকলকে নিদ্রিত দেখে মহাদেবকে নিবেদিত অন্ন এবং নানারকমের ফল গ্রহণের জন্য চুপি চুপি শিব লিঙ্গের কাছে গমন করল। রাত্রির অন্ধকারে প্রদীপের আলো মৃদু থাকায় বেদনিধি ঠিকভাবে দেখতে পেলেন না। তিনি তার পাগড়ি থেকে একণ্ড বস্ত্র ছিঁড়ে প্রদীপের পলতে তৈরি করলেন এবং দীপশিখা উজ্জ্বল করে দিলেন। এর ফলে শিবের উপর যে অন্ধকার ছিল, তা দূরীভূত হল এবং আলোক প্রকাশ পেল। বেদনিধিও সুন্দরভাবে অন্ন প্রসাদগুলি দেখতে পেলেন এবং ধীরে ধীরে মনের আনন্দে তা ভক্ষণ করতে শুরু করলেন। পরিতৃপ্ত সহকারে আহার করে বেদনিধি যেই মন্দির থেকে যেইমাত্র নির্গত হতে গেলেন অমনি অসতর্কতা বশত, এক ব্যক্তির গায়ে তাঁর পা ঠেকে গেল। ভক্তটি তৎক্ষণাৎ ঘুম থেকে উঠে 'চোর 'চোর শব্দে চারিদিক সচকিত করে তুললেন। সকলে জাগ্রত হয়েছে দেখে বেধনিধি পালাতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বেশীদূর তাঁর যাওয়া হল না। রাজার রক্ষীরা তাঁকে বাণ দিয়ে বিদ্ধ করল। বেদনিধি মাটিতে পড়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হল।

দুষ্ট বেদনিধি শিবের কাছে নিবেদনের জন্য অন্নগ্রহণের উদ্দেশে মন্দিরে প্রবেশ করেছিল। শিবের প্রতি বিন্দুমাত্র ভক্তি বা পূজার ভাব তাঁর মনের মধ্যে ছিল না। কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ শিবরাত্রির ব্রত ও জাগরণ উভয়েই তার মাধ্যমে নির্বাহ হল। মৃত্যুর পরে তাঁকে নিয়ে যেতে একসাথে যমদূত ও শিবদূতেরা উপস্থিত হলেন। যমদূতদের দেখে শিবদূতরা বললেন, আপনারা এখানে কেন? যমদূত উত্তর দিলেন, 'এই ব্যক্তি অতি পাষণ্ড। মায়ের গহনা চুরি করে বারবণিতাকে প্রদান করে।' বেদজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও বারবণিতার সেবা করা একান্ত গর্হিত কাজ। এ কথা শুনে শিবদূতেরা বলল, 'হে যমদূতগণ, ব্রাহ্মণের বহু পাপকর্ম ছিল বটে, কিন্তু শিবের ব্রত ও শিবরাত্রির জাগরণের মাধ্যমে সব পাপস্খালন হয়ে গিয়েছে। ব্রত উদ্‌যাপনের পরমুহূর্তেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়, এটুকু সময়ের মধ্যে সে কি পাপ করতে পারে। সুতরাং এই ব্রাহ্মণ অবশ্যই শিবলোকে যাওয়ার যোগ্য।' শিবদূতেরা নানা কথা বললেও যমদূতেরা বেদনিধির উপর নিজেদের অধিকার কখনই ছাড়লেন না। ফলে উভয় পক্ষের দূতের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হল। তাঁরা উভয়ই তখন যমরাজের কাছে উপস্থিত হলেন। যমরাজ সব কথা শুনে বললেন, 'শিবদূতেরা যা বলেছেন, তা সবই সত্য। শিবরাত্রি ব্রত উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মণের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়েছে।' পরে যম শৈবদূতদের প্রণাম করে ব্রাহ্মণকে নমস্কার করে 'তুমি ভাগ্যবান' এই উক্তিতে তুষ্ট করে পুনরায় জীবনদান করলেন এবং ব্রাহ্মণকে কলিঙ্গ দেশের অধিপতি করে

BanglaBook.org

দিলেন। বেদনিধি কলিঙ্গ দেশের অধিপতি হয়ে নিত্য শিবপূজা করতেন এবং আয়োজন সহকারে শিবরাত্রি ব্রতের উদ্‌যাপন করতেন—এইভাবে ধর্মসঙ্গত জীবন যাপন করে, নিজেদের রাজ্যে শিবপূজা ও শিবরাত্রি ব্রতের প্রচলন করে শিবলোক প্রাপ্ত হলেন।

দুরাত্মা ব্রাহ্মণ কোনও প্রকার যত্ন না করেও এই ব্রত উদ্‌যাপিত করেছিল বলে তার জীবনে এইরকম মানলাভ হল আর যে ব্যক্তি পরম ভক্তিভাবে শিবার্চনা করে তাঁর মুক্তিলাভ হবে এতে আর আশ্চর্য কি? যে ব্যক্তি ভক্তির সঙ্গে শিবরাত্রিতে দীপ দান করে সেই ব্যক্তি উত্তমপদ লাভ করে। তাই এই ব্রতের মতো উৎকৃষ্ট ব্রত আর নেই। শিব পুরাণে বলা হয়েছে, শিবই জ্ঞান প্রকাশক, শিবই পরম দেবতা। তাঁর আরাধনাতেই মুক্তি। যে ব্রতে শিবের উপাসনা নেই। সে ব্রত ব্রতই নয়।

শিব সদাই সন্তুষ্ট। তবু সকাম অর্থাৎ কামনা যুক্ত পূজায় নানারকম বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হয়েছে। পুরাণে বলা হয়েছে, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য, নৈবেদ্য, আরতি, প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও আত্ম পরিহার বিসর্জন দিয়ে যে ব্যক্তি মহাদেবের সন্তোষ বিধান করে, মঙ্গলকর শঙ্কর তাকে নিখিল রাজ্যের অধিপতি করেন। মহাদেবের প্রার্থনা ও স্তব মন্ত্র রচনা করে বলা হয়েছে, পূজার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে দেবাদিদেবকে প্রার্থনা করবে, 'হে শঙ্কর, অজ্ঞানতা হোক আর জ্ঞানত হাক, আমি যা কিছু জপ পূজা করলাম, সে সমস্তই আপনার অনুগ্রহে সফল হোক। হে কৃপানিধি মহাদেব। আমি আপনারই, আপনিই আমার প্রাণের একমাত্র পরিত্রাতা, আপনিই আমাকে পালন করছেন, অতএব হে ভূতনাথ! আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আমি যখনই পূজা করব তখনই আপনাকে আমার কাছে আসতে হবে। এই বাক্যে তুষ্ট করলে তবে দেবাদিদেবের স্তব সার্থক হবে। 'এই স্তবের পর যে ব্যক্তি রাজ্য কামনা করে, সে দশ কোটি ফুল দিয়ে মৃন্ময় শিবলিঙ্গ আরাধনা করবে। যে ফুল সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হবে সেই ফুলকে চন্দনে লিপ্ত করে বিল্বপত্র ও জলধারা দিয়ে শিব পূজা সম্পন্ন করলে যথার্থ ফল লাভ হয়। যে মানুষ প্রাধান্য লাভ করতে চায় সে পাঁচ কোটি পুষ্প শিবের পদতলে নিবেদন করবে। কারাবদ্ধ মানুষ লক্ষ পুষ্প এবং রোগগ্রস্ত পুরুষ পঞ্চাশ হাজার পুষ্পের মাধ্যমে মহাদেবের পূজা করবে। কন্যাকামী মানুষ পঁচিশ হাজার পুষ্প ও বিদ্যার্থীরা এর অর্ধেক পুষ্প প্রদান করে শিবপূজা সম্পন্ন করবে। এইভাবে শিবপূজায় নানা বিধি ও আচারের প্রয়োগ করা হয়েছে। শিব এমন দেবতা যাঁকে অল্পেই তুষ্ট করা যায়। তাঁর পূজায় তাই মানুষের আর্তি এত বেশি শিবভাবনা মানুষকে পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতার শিক্ষা দেয়।

BanglaBook.org

উত্তর প্রদেশের গাজিপুর জেলায় শিবনারায়ণ নামে এক ক্ষত্রিয়ের জন্ম হয়। তিনি সাধন জীবনে এত উন্নত হয়েছিলেন যে শৈবভক্তরা মনে করত তাঁর মধ্যে অলখ নিরঞ্জন কর্তাপুরুষের এক জীবাত্মা অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, তিনি এক বিশেষ শৈবধারার প্রবর্তন করেন। সন্তবিলাস, সন্তসুন্দর, সন্ত আখেরি, সন্ত উপদেশ শব্দাবলী এবং সন্ত মহিমা প্রকাশিত হয় শিবনারায়ণ প্রতিটি সম্প্রদায়ের গ্রন্থরূপে। এঁদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের প্রধান পালনীয় কর্তব্য হল, (১) সত্যিপথে থাকব, পরস্ত্রীর উপর কুদৃষ্টি দেব না (২) মূর্তিপূজা বা হিন্দু মুসলমানদের কোন আচার অনুষ্ঠান করব না। কোন দেবদেবীকে মানব না (৩) দেখি দেখি ঘর যাও অর্থাৎ বিচার করে চলব এবং যা খেতে রুচি হবে তাই খাব (৪) অলখ্‌পুরুষের অবতার কর্তাগুরুর নামই জপ করব। এঁদের প্রধান পূজ্য হলেন গুরু। এঁদের মতে সতীনারী যেমন পরপুরুষের সেবা করে না, তেমনি সন্তজন নিজ গুরু ছাড়া অন্য দেবতার পূজা করে না। এই নতুন সম্প্রদায়ের চিন্তা ও সাধন পদ্ধতি দেখে মনে হয়, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মাঝামাঝি একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। মহম্মদ শাহের আমলে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ইতিহাস ও রাজনীতি ধর্মজীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করে এই ঘটনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিচিত্র ভাবে দেবাদিবেদ মহাদেব পূজিত হয়ে আসছেন। বিভক্ত হয়েছে বহু সম্প্রদায়। আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর প্রবর্তিত নাগা সম্প্রদায়ের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। এঁরা ত্রিশূল ও তারবারিধারী একদল যুদ্ধ বিশারদ সন্ন্যাসী দল। এঁদের প্রধান শাখা কিন্তু হল নির্বাণী ও নিরঞ্জনী আখড়া। কিন্তু এ দুই আখড়া ছাড়াও আরও কয়েক ধরণের নাগা সম্প্রদায়ের দেখা পাওয়া যায় তাঁরা কেবল সশস্ত্র নন তাঁদের কোমরে লোহার চেন এবং লোহার গোঁটা দিয়ে লিঙ্গকে বিদ্ধ করে সংযমের চরম নিদর্শন প্রদান করছে এই সম্প্রদায় মনে করে শিব ও নারায়ণ পৃথক নন। যিনি শিব তিনিই নারায়ণ। তাঁদের প্রণাম মন্ত্রে বলা হচ্ছে

"শিবায় বিষ্ণুকপায় বিষ্ণবে শিবরূপিণে
দক্ষযজ্ঞ বিনাশায় হরিদেবায় বৈ নমঃ।।

হে অজেয় পুরুষ। তুমি একাধারে বিষ্ণুরূপী শিব এবং শিবরূপী বিষ্ণু, যজ্ঞবিনাশকারী হে বীরভদ্র। তোমাকে প্রণাম করি। —এই সম্প্রদায় নিজেদের প্রতিষ্ঠাতা রূপে 'দত্তাত্রেয় অবধূতে' নাম স্মরণ করেন। এখানে দত্তাত্রেয় নামে আমরা পুরাণের দত্তাত্রেয় ঋষির কথা যেন না মনে করি। নাগা সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা নাগারা প্রধান সন্ন্যাসীকে অবধূত নামে চিহ্নিত করেন। তিনি হলেন দত্তাত্রেয় ভগবান। এই দত্তাত্রেয় অবধূতের গায়ের ভষ্ম সযত্নে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে

BanglaBook.org

রক্ষিত হয়েছে। এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিভূতিপূর্ণ পাত্রকে বলেন 'বিভূতি নারায়ণ'। অর্থাৎ শিবের ভস্ম মাখা গায়ের সঙ্গে নারায়ণকে যেন সংযুক্ত করে দেওয়া হল। শিক্ষাগ্রহণের সময় নাগা সন্ন্যাসীরা এই বিভূতি নারায়ণের থালা নিয়ে ভক্তদের কাছে যায়। যে ভক্তরা সোনা বা রূপার মুদ্রা দান করে তারাই বিভূতি নারায়ণের থালায় সরাসরি ভিক্ষাদানের সুযোগ পায়। অন্যরা সন্ন্যাসীর ঝোলায় ভিক্ষা দান করে। ভিক্ষা প্রদানের এই ব্যবস্থা নাগা সন্ন্যাসীগণ ও ভক্তরা খুব নিষ্ঠা সহকারে পালন করে। তাঁদের ধারণা যাঁরা বিভূতি-নারায়ণের থালায় ভিক্ষা দান করতে সমর্থ হয় তাঁদের অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়। তার সঙ্গে সর্বকামনা সিদ্ধ হয়।

নাগা সন্ন্যাসীদের এই বিভূতি নারায়ণের আকার নিয়েও পার্থক্য রয়েছে। কোন সম্প্রদায়ের বিভূতি নারায়ণের গোলা অর্থাৎ পাত্রটি গোলাকার। নিরঞ্জনী সম্প্রদায়ের নাগা সন্ন্যাসীদের বিভূতি নারায়ণের পাত্রটি চতুষ্কোণ। এর সঙ্গে সঙ্গে সাধুদের জটার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। এক এক সম্প্রদায়ের সাধুরা এক এক রকম জটা ধারণ করেন। অর্থাৎ জটার ধরণ দেখেই বুঝতে পারা যাবে এই সন্ন্যাসী কোন সম্প্রদায়ের নাগা সন্ন্যাসী। জটার পার্থক্য শুনে আমাদের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। জটার পার্থক্য কিরকম? তিনরকমের জটা দেখতে পাওয়া যায়, নাগজটা, শম্ভুজটা এবং বারবান। যে জটা দীর্ঘ লম্বা এবং সাপের ফণার মত হয়ে থাকে সেই জটাকে নাগজটা বলা হয়। নাগফণী সম্প্রদায়ের নাগারা এই জটাধারণ করে। যে জটা সাপের মতন পাকান নয় তার নাম শম্ভুজটা। শম্ভুজটা দীর্ঘ হয় কিন্তু বারবান জটার দৈর্ঘ্য ছোট। নির্বাণী, নিরঞ্জনী, নির্মলী ও জুনা আখড়ার সাধুরা শম্ভুজটা ধারণ করে। নাগফনী সম্প্রদায়ের সাধুরা তাঁদের ত্রিশূল শিবলিঙ্গের মাথায় স্থাপন করে একসঙ্গে শিবলিঙ্গে স্তব শুরু করে - "হে মহাদেব। তুমি জটাজুটধারী, সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর, তৃতীয় নয়ন দিয়ে তুমি জ্ঞানকে ভস্ম করেছ। হে নীলকণ্ঠ! তুমি দেবতাদেরও দেবতা। আমি জানি তুমি ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে প্রধান, ত্রিলোচন, সর্বব্যাপক, দেবগণের ও গতি এবং এই জগৎটা তোমারই সৃষ্টি।"

"ভগবন! মহেশ্বর! তুমি প্রমথদের অধিপতি, জগতের মঙ্গলবিধানকারী, সৃষ্টিকর্তাদেরও সৃষ্টিকর্তা, প্রকৃতি পুরুষের অতীত, শ্রেষ্ঠদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ পরম সূক্ষ্ম তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপ, হে দয়াল। তুমি প্রসন্ন হও; আমি যে অপরাধ করেছি তা নিজগুণে ক্ষমা কর। দেবাদিদেব। আমি তোমারই দর্শনাকাঙ্খী হয়ে তপস্বীদের উত্তম আশ্রয়, তোমার প্রীতিপদ এই মহাপর্বতে এসে উপস্থিত হয়েছি। ভগবন্! তুমি সমগ্র জগতের প্রণম্য, তুমি আমাদের কৃপা কর, প্রসন্ন হও, আমি যে তোমার দর্শনলাভের জন্য দুঃসাহস করে এই জীবন গ্রহণ করেছি। আমার কোন অপরাধ নিওনা প্রভু।

BanglaBook.org

"হে প্রভু আমি তোমার শরণাগত। সুতরাং আমি জীবনে যে সব সংঘর্ষ করেছি, তার জন্য আমায় ক্ষমা কর।"—

এই স্তব যেন যোদ্ধা সৈনিকদের দেবাদিদেবের কাছে কাতর ভাবে আত্মসমর্পণ। যোদ্ধা হলেও তাঁরা সাধু, সৈনিকদের শৃঙ্খলা দিয়ে তাঁরা বিধর্মীদের হাত থেকে নিজের ধর্মভাবনাকে, ধর্মচেতনাকে রক্ষা করতে প্রস্তুত।

শৈবভাবনার সাধক সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ইতিহাস থেকে আমরা এটুকু বুঝতে পারি, বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক কারণে ধর্মরক্ষার্থে দেবাদিদেব মহাদেবকে ঘিরে এক এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিচিত্র ভূমিকা পালন করেন। দেবাদিদেব মহাদেবকে নিয়ে কত আশ্চর্য তীর্থ গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে গঠিত হয়েছে আশ্চর্য কাহিনী, দ্বাদশ লিঙ্গের অন্যতম লিঙ্গ ওঁঙ্কারেশ্বর তীর্থের কাছেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঋণমুক্তেশ্বর শিব। এই শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে স্থানীয় কাহিনীটি হল এইরকম—এই শিবলিঙ্গকে অর্চনা করলে এবং এই দেবতাকে পাঁচপোয়া অড়হড় ডাল অর্পণ করলে সমস্ত রকমের ঋণ থেকে মানুষ মুক্ত হয়। আচার্য শঙ্কর নাকি স্বয়ং এই লিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা। শিবলিঙ্গের এইরকমের পূজা নর্মদাতটের আরও কিছু শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পাঁচপোয়া অড়হড় ডাল বা পাঁচপোয়া চিনি শিবলিঙ্গকে প্রদান করলে দেবতা জীবকে ঋণ থেকে মুক্তি দান করেন।

স্কন্দপুরাণের রেবাখন্ডে নর্মদা নদীর তটে, বহু শিবলিঙ্গ ও শৈবতীর্থের দেখা পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরণের শিবলিঙ্গের অস্তিত্ব রয়েছে, কোন লিঙ্গ স্বচ্ছ, কোনটি অস্বচ্ছ, অমসৃণ। এইসব লিঙ্গমূর্তির মধ্যে বাণলিঙ্গ প্রধান। প্রতিটি মন্দিরেই বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। স্বচ্ছ জামরঙের বা সাদা রঙের ডিম্বাকৃতি এই লিঙ্গ টি সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক। লিঙ্গের নাম বাণ হল কেন? পৌরাণিক বাণাসুরের কাহিনী আমাদের সকলেরই জানা। রাজা বাণ ছিলেন শিবভক্ত। ওঁঙ্কারেশ্বর মন্দিরের কাছেই ধাবড়ীকুণ্ডেই তাঁর তপস্যা ও যজ্ঞকুণ্ড। দেবতাদের দেবতা শিব তাঁর ভক্তের সাধনায় এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে 'বাণ' নামটি তিনিই গ্রহণ করেন। ভক্তের নাম অনুসারে তাঁর বিশেষ এক লিঙ্গের নাম হয় বাণলিঙ্গ। বাণরাজার যজ্ঞকুণ্ড ও তপস্যাস্থলেই দেবাদিদেবের বরে অজস্র বাণলিঙ্গ আজও দেখা যায়।

ঠিক এরকমই আরেকটি তীর্থ হল এরণ্ডী ও নর্মদা নদীর সঙ্গমস্থল এরণ্ডীক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের অধিষ্ঠিত মহাদেবের নাম মন্মথেশ। স্বয়ং কামদেব এই তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে এই লিঙ্গকে 'কামেশ' বলা হয়। ঋষি অত্রির স্ত্রী অনসূয়া দেবী ও পুত্রলাভের কামনায় এই এরণ্ডীসঙ্গমে এসে মন্মথেশ শিবের আরাধনা করেছিলেন এবং পুত্রলাভ করেছিলেন। তীর্থকাহিনী অনুসারে এই এরণ্ডী

BanglaBook.org

সঙ্গমে যেহেতু স্বয়ং কামদেব দেবাদিদেবকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাই এই দেবতার পায়ে পূজার অর্ঘ্য প্রদান করলে বন্ধ্যানারীরা সন্তানলাভ করে। চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এই মন্মথেশ মহাদেবের পূজা করলে পুত্রলাভ হয়।

ঋষিপত্নী অনসূয়া এই তীর্থে এসে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর একইসঙ্গে তাঁকে পুত্রলাভের বর দিতে চাইলে অনসূয়া সেই তিন দেবতাকে প্রণাম করে বলেন, 'হে দেবত্রয়, আপনারা তিনজনই আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুণ।' অনসূয়ার কথা শুনে মহাদেব বললেন, 'ভদ্রে। হে শুভে, তুমি যা প্রার্থনা করলে, আমরা তাই পূর্ণ করব। এই তীর্থে এক বৈষ্ণবী মায়া এরণ্ডী নামে বিরাজ করবে। যাঁর দর্শন করলে সমস্ত পাপ নষ্ট হবে। দেবতা কখনও নারীর গর্ভে বাস করেন না। অতএব তোমার পুত্ররূপে আমরা ভিন্নভাবে আবির্ভাব হব।" এর পরেই ব্রহ্মা সোম নাম নিয়ে, মহেশ্বর দুর্বাশা নাম নিয়ে এবং বিষ্ণু দত্তাত্রেয় নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এই এরণ্ডী সঙ্গমে মন্মথেশ লিঙ্গের সঙ্গে সেই থেকে বৈষ্ণবী মায়া রূপে এরণ্ডী তীর্থের এবং এরণ্ডী মাতার বিগ্রহ পূজিত হয়ে আসছে।

এইরকম ছোট ছোট পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গেই বহুরকমের সাধন পদ্ধতিও রেবানদী তীরের সাধুসমাজ পালন করে আসছেন। এই সাধনার মধ্যে যোগভ্যাস বা হঠযোগই প্রধান। এক এক শৈব সম্প্রদায় এক একরকমভাবে হঠযোগের প্রক্রিয়া পালন করেন এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই বক্তব্য তাঁদের প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সুতরাং এই পদ্ধতির কোনো বিকল্প পথ নেই। নাগা সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই হঠযোগ প্রধান। নাগফণী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা বিশ্বাস করে ভগবান দত্তাত্রেয় খেচরী ও শাম্ভবী মুদ্রা—যা হঠযোগের বিশেষ পদ্ধতি- তা তাঁদের সম্প্রদায়কে যেভাবে প্রদান করেছেন অন্য কোন নাগা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে সেভাবে প্রদান করেনি। অর্থাৎ এই মুদ্রাগুলি যোগাভ্যাসের প্রাথমিক অঙ্গ বলে তা দত্তাত্রেয় সরাসরি নাগফনী সম্প্রদায়কে প্রদান করেছিলেন বা শিখিয়েছিলেন। কিন্তু নিরঞ্জনী, নির্বানী আখড়ার সাধুরা যতই ভগবান দত্তাত্রেয়কে নিজেদের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করুন না কেন, তাঁরা হঠযোগের এই মুদ্রাগুলি সরাসরি লাভ করেন নি। নাগফনী সম্প্রদায়কে সরাসরি প্রদান করেছিলেন বলেই অন্য নাগা সম্প্রদায়ের থেকে এই সম্প্রদায় দৈর্ঘ্যে বড় জটা রাখার অধিকারী।

শৈব সন্ন্যাসীদের মধ্যে জটা এবং দণ্ড —এটি হল সন্ন্যাসের বাহ্যিক চিহ্ন। নাগা সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা গেরুয়া বস্ত্রধারণ করেন। গেরুয়া ত্যাগের প্রতীক। শঙ্করাচার্য্য যখন দশনামী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন তখন

BanglaBook.org

কেবলমাত্র আশ্রম, তীর্থ ও সরস্বতী মঠের সন্ন্যাসীদেরই দণ্ড ধারণের অধিকার দিয়েছেন। দণ্ড অর্থাৎ একটি রূপক যা সন্ন্যাসীর মনকে আঘাত করে জানিয়ে দেবে—তিনি সন্ন্যাসী। লৌকিক ব্যবহারের উর্দ্ধে তিনি বিচরণ করেন। দশনামী সম্প্রদায়ের মধ্যে, গিরি, পুরী, বন, পর্বত আরণ্য, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসদানের সময় গুরু দণ্ড দান করেন। কিন্তু এসব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস গ্রহণের পর দণ্ড জলে বিসর্জন দিয়ে দেন। কোনো প্রতীক তারা বহন করেন না। —এইভাবে সন্ন্যাসীদের মধ্যেও বিচিত্র বিভাজন সৃষ্টি হয়ে এক বিরাট ও বিচিত্র সন্ন্যাসী সমাজের সৃষ্টি হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে। শিবমহিমা কীর্তনে আমরা সন্ন্যাসীদের প্রসঙ্গ এত দীর্ঘ করলাম কেন? —এর কারণ সন্ন্যাসীদের মূল গুরু হলেন শিব। সে সন্ন্যাসী যে সম্প্রদায়ের হোন না কেন। শিবের উদাসীন আনন্দময়, ত্যাগমন রূপটির বন্দনা করেই সন্ন্যাসভাবনার সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করেছে মানবমন। তাই শিব ও সন্ন্যাস কখনও একই শব্দের দুই প্রকাশ রূপে চিহ্নিত হয়েছে। অসংখ্য সন্ন্যাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এক বাণী 'শিবগুরু' 'শিবগুরু'।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই

শিব ঃ আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয়

'শিবই গুরু', গুরুই 'শিব'-হিন্দুশাস্ত্রে গুরুকে স্বয়ং শিবস্বরূপ রূপে বন্দনা করা হয়েছে। কেন? কারণ শিবের ত্যাগদীপ্ত তপস্বী মূর্তি একদিকে যেমন স্পষ্টভাবে সাধকের মনকে স্পর্শ করবে, অপরদিকে শিবই সমস্ত দেবদেবীস্বরূপ হয়ে গুরুর সঙ্গে একীভূত হবেন। যার ফলে এক রক্ত মাংসের মানুষের মধ্যে অনন্তকে অনুভূত করতে পারা যায়। তন্ত্রে আমরা দেখি 'গুরুগীতা' নামে এক অপূর্ব গ্রন্থ। যে গ্রন্থে শঙ্করপ্রিয়া পার্বতী তাঁর পূজ্য স্বামীর কাছে গুরু প্রসঙ্গের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করছেন। এবং শিষ্যা, অনুগতা স্ত্রীকে দেবাদিদেব শঙ্কর গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন। এই তত্ত্বের ব্যাখ্যায় মহাদেব জানাচ্ছেন প্রতিমাতে যে মানুষ শিলাবুদ্ধি করে আর গুরুকে মানুষ বুদ্ধি করে তাঁর সাধনজীবনের ভিত্তি শূণ্য হয়ে যায়। গুরুকে শিবস্বরূপ চিন্তা করেই শিবগুরুর বন্দনা করেই আমাদের সাধন জীবনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। তাই সন্ন্যাসীরা বন্দনা করেন 'শিবগুরু শিবগুরু'।

শক্তি আরাধনাকে কেন্দ্র করে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে কয়েকটি পীঠস্থান গড়ে উঠেছে। যে পীঠস্থানগুলি শক্তিসাধনার কেন্দ্রস্থল। ঠিক সেইরকমই শৈব ভাবাপন্ন ভক্তদের আশ্রয় স্থল হল দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গ। বারোটি স্থানে জ্যোর্তিলিঙ্গকে কেন্দ্র করে বারোটি শৈবতীর্থ গড়ে উঠেছে। এছাড়াও নর্মদাতীর্থে, নর্মদা-নদীর পরিক্রমা পথকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে রয়েছে প্রচুর শিবমন্দির এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা পৌরাণিক কাহিনী। রামায়ণ মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণে-র প্রায় প্রতিটিতেই ছড়িয়ে রয়েছে শিবকাহিনী। বিভিন্নভাবে, বিভিন্নরূপে। এই সব কাহিনীর উৎস সন্ধান করা বৃথা। তার এই কাহিনীগুলির মধ্য দিয়েই দেবতা দেবাদিদেব মহাদেবের চরিত্রায়ণের পাশে পাশে একটি অস্পষ্ট সমাজ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। যে সমস্ত চিত্রে আর্য অনার্য সংমিশ্রণ। অথবা বিতর্ক এড়িয়ে বলা যায়, উচ্চবর্ণ ও উপজাতিদের মধ্যে শিবভাবনাকে কেন্দ্র করে এক সংমিশ্রণ হয়েছে। যা ধর্মভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে। দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গ বর্ণনায় আমরা এই

BanglaBook.org

সাংস্কৃতিক সম্মেলনের দিকটি বারংবার দেখতে পাব। ধর্মেতিহাস গড়ে ওঠে সমাজকে কেন্দ্র করে। ধর্মভাবনা, দেবমহিমা বর্ণনায় এই গতিপথকে যদি নির্দিষ্ট করতে না পারা যায়, তবে তা কেবলমাত্র অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ ছাড়া আর কিছুই হয় না। প্রতিটি শৈবতীর্থের মধ্যে বিবর্তনের একটি ধারাপথকে নির্দিষ্ট করা যায়। যেমন বারাণসী। আজকেও এই তীর্থ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। তবু এই শহরের বুক চিড়ে যদি ধর্মভাবনার স্রোতটির গতিপথ চেনার চেষ্টা করা হয় তবে দেখা যায়, এই শহরে কোন ধর্মভাবনার স্রোত না আছড়ে পড়ছে? বৌদ্ধ ভাবনা, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, ইসলামের আগ্রাসী মনোভাব—কোন ক্ষেত্রই এখানে অনুপস্থিত নয়। প্রতিটি স্রোতই এসেছে কিন্তু হারিয়ে গিয়েছে শিবভাবনার মধ্যে দিয়ে। তাই এই কাশীর পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে এত বৈচিত্র্য, এত আকর্ষণ। ভগিনী নিবেদিতা এই শহরের ইতিহাস বর্ণনায় বলেছেন, বিবর্তনের দিক দিয়ে এই শহর এক অভিনবত্বের দাবী রাখে। এই শহরের প্রতিটি গৃহই যেন বিভিন্ন যুগের সাক্ষ্য বহন করছে। শহরের নীচে লুকিয়ে আছে আরেকটি শহর।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অর্জুন ও তার শিবারাধনা

আমরা সংস্কৃতি সমন্বয়ের কথা বলছিলাম, মহাভারতে এই সম্মেলনের প্রকৃষ্ট কাহিনী আমরা স্মরণ করব। পাণ্ডবরা বনে বাস করছেন। পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়েও শান্তি নেই দুর্যোধনের। নানা প্রকারে বিব্রত করার চেষ্টায় রত কৌরবপক্ষ। এর মধ্যে ব্যাসদেব একদিন পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। পাণ্ডবরা তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 'হে মহাত্মন, দুরাত্মা দুর্যোধন এই বনেও আমাদের বারংবার কষ্টের কারণ হয়েছে। আপনি আমাদের দুঃখনাশের জন্য কোন মঙ্গলজনক উপদেশ প্রদান করুন। বাসুদেবকৃষ্ণ আমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, দুঃখনাশের জন্য সর্বদা শঙ্করের আরাধনা কর। কিন্তু আমরা এই উপদেশ পালন করতে পারিনি। এখন আমরা কি করব তা উপদেশ করুন।' —পাণ্ডবদের কথা শুনে ব্যাসদেব আনন্দের সঙ্গে বললেন, 'শ্রেষ্ঠবীরগণ, আমি শিবের সেবা প্রতিদিন করে থাকি। তোমরাও তাঁর বন্দনা কর। তাহলে চিরস্থায়ী সুখ হবে। পরে ব্যাসদেব বিচার করে পণ্ডপাণ্ডবের মধ্যে অর্জুনকেই তপস্যার জন্য উপযুক্ত মনে করলেন এবং তাঁকে শিবরাধনার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়ে বললেন, 'হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যাতে তোমাদের সর্বদা মঙ্গল হয়, তার জন্য বলছি, তুমি শোনো, ব্রহ্মাদি তৃণ পর্যন্ত যা কিছু দেখছ, তা সমস্তই শিবস্বরূপ। যা দৃশ্য, যা ধ্যেয়, তার সমস্তই শিবস্বরূপ। দেবাদিদেব মহাদেব সর্বদুঃখবিনাশক। তাই সর্বদা শিবপূজা কর। যিনি বিষ্ণু, তিনিও ঐ শিবেরই এক অদ্ভুত রূপান্তর মাত্র। কিন্তু বিষ্ণুকে প্রসন্ন করতে কষ্টসাধ্য তপস্যার প্রয়োজন। কিন্তু শিব অল্পতেই তুষ্ট হন। হে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব, দেবরাজ ইন্দ্র ক্ষত্রিয়দের হিতসাধন করেন এবং শিবমন্ত্র প্রদান করেন। হে অর্জুন তোমাকে আজ আমি ইন্দ্রপ্রদত্ত শিবমন্ত্র প্রদান করব। তুমি এই মন্ত্র গ্রহণ করে ইন্দ্রকীল পর্বতের পাদদেশে ভাগীরথীর তীরে তপস্যায় মগ্ন হও। সশস্ত্র অস্ত্রধারণ করে তপোবিঘ্নকারী প্রাণীদের পথরোধ করবে। সর্বদা শিবের স্তব পাঠ করবে।' এইভাবে মহামুনি ব্যাস, অর্জুনকে ঐ গোপনীয় এবং হিতজনক বিদ্যাদান করে সকলকে আশীর্বাদ করলেন, 'হে রাজাগণ, তোমরা ধর্মকে আশ্রয় করে বাস কর, হে শ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের সর্বত্রই সিদ্ধিলাভ হোক।'

BanglaBook.org

ব্যাস পাণ্ডবদের এইভাবে বরপ্রদান করলে তাঁর আশীর্বাদে এবং নতুন জন্মলাভে অর্জুন যেন এক নতুন দীপ্তি লাভ করলেন। শিবমন্ত্র প্রভাবে অনুপম তেজ ধারণ করলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই অর্জুনের এই তেজ দেখে বললেন, 'হে অর্জুন, তুমি এক মহান কার্যের জন্য নির্বাচিত হয়েছ। হে ভ্রাতা, তুমি ব্যাসদেবের কথানুসারে শীঘ্রই ইন্দ্রকীল পর্বতে গমন কর এবং তপস্যায় মগ্ন হও।' জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশ হলেও অর্জুনের তপস্যায় যাত্রার সংবাদে দ্রৌপদীর মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হল। তিনি অশ্রুজল নিয়ে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে বললেন, ''সকলের সুখের জন্য তুমি বারংবার ত্যাগ স্বীকার করছ। ত্যাগই যেন তোমার জীবনব্রত, হে প্রিয় স্বামী, তুমি অতি যত্নসহকারে এই শুভকর্ম সম্পাদন করবে।'' কেবল দ্রৌপদী নন, অর্জুনের বিরহে অন্যান্য পাণ্ডবরাও দুঃখিত হলেন। ব্যাসদেব তাঁদের নানা কথাপ্রসঙ্গের মাধ্যমে পাণ্ডবদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। অর্জুনের যাওয়ার পথে নানা শুভচিহ্নের দেখা পাওয়া গেল। অর্জুন বুঝতে পারলেন এই শিবারাধনা আমাদের শত্রু ধ্বংসের পথে নিশ্চয়ই সহায়ক হবে। অর্জুন ইন্দ্রকীল পর্বতের পাদদেশে এক সুন্দর স্থানে তপস্যায় বসলেন। প্রথমেই তিনি ব্যাসদেবের কথা মতো পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্মাণ করলেন, পরে স্তবমন্ত্রে তাকে জাগ্রত করে, শিবমন্ত্র জপ করতে করতে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। পাশে রইল তাঁর গাণ্ডীব। ব্যাসদেব তাঁকে আদেশ করেছিলেন সমস্ত অস্ত্র দিয়ে তপোবিঘ্নকারীর নাশ করবে। তাই গাণ্ডীবধারী গাণ্ডীব নিয়েই তপস্যায় বসলেন।

শিবমন্ত্রের তেজে অর্জুনের সমগ্র শরীর থেকে এক অপূর্ব তেজোরাশি নির্গত হতে থাকল। দেবতারা তা দেখে ভীত হলেন, স্বয়ং ইন্দ্র অর্জুনকে পরীক্ষা করার জন্য নেমে এলেন। ছদ্মবেশ ধারণ করে অর্জুনকে বললেন, 'হে স্বামিন। তুমি এই নবীন বয়সে এখানে কিজন্য তপস্যা করছ? তোমার এই তপস্যা নিশ্চয়ই মুক্তির জন্য নয়, নিশ্চয়ই তা যুদ্ধজয়ের জন্যে। হে সাধক, আমি তোমায় যা বলি তুমি তা শ্রবণ কর। এখন তুমি সুখের জন্য তপস্যা করছ, কিন্তু এই তপস্যা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ লৌকিক সুখ স্বপ্নতুল্য। আজ আছে, কাল নেই। সুতরাং এই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য কখনই তপস্যা করা উচিত নয়। যদি মুক্তির জন্য তোমার তপস্যা করতে হয় তবে তুমি শিবপূজার মাধ্যমে তা লাভ করবে। জয়ের জন্য তপস্যা করলে ইন্দ্রের তপস্যা করতে হবে। দেবরাজ তোমাকে জয়যুক্ত করতে পারেন। কিন্তু মুক্তি দিতে সক্ষম নন। তুমি শিবভজনা ত্যাগ করে ইন্দ্রভাবনা শুরু কর।'

ছদ্মবেশী ইন্দ্রের এই কথা শুনে অর্জুন বিরক্ত হলেন। তিনি বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আমি রাজ্যমাত্র ইচ্ছা করি, মুক্তি ইচ্ছা করি না। আপনি কিজন্য এরকম

BanglaBook.org

কথা বলছেন? আমি স্বয়ং ব্যাসদেবের আদেশে এই তপস্যার আয়োজন করেছি। আপনি এখন এই স্থান থেকে দয়া করে চলে যান। আমার পরিবারের মঙ্গলের জন্য আমি তপস্যা করছি, আপনি কেন বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন? অর্জুনের কথা শুনে দেবরাজ নিজমূর্তি ধারণ করলেন এবং লজ্জিত অর্জুনকে আশীর্বাদ করে বলেলেন, 'তুমি ধন্য অর্জুন। তুমি কৃতার্থ, তোমার মন নিশ্চল। তোমরা শত্রুরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ—এরা সকলেই অজেয়। এঁদের পরাজিত করার সাধ্য আমারও নেই। তাই তোমাকে বলছি, তুমি একাগ্রমনে শম্ভু ভজনা কর। তিনি ইহলোকে জয় ও পরলোকে মুক্তিফল প্রদান করবেন। তাঁর আরাধনা করলে, 'হে ভারত! তুমি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করবে। তবে তুমি সাবধানে তপোনুষ্ঠান করবে। কখনই অনবধানে থাকবে না। কারণ, হে রাজসত্তম! মঙ্গলকার্য্যে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তোমার যেমন ধৈর্য্য আছে সেইভাবে তুমি নিজেকে রক্ষা করবে। এই জঙ্গলময় স্থানে নানা প্রকার বিপদের সম্ভাবনা। হে অর্জুন, তুমি সর্বদা সচেতন থাকবে। এইভাবে অর্জুনকে পরীক্ষা করে এবং বর প্রদান করে দেবরাজ ইন্দ্র প্রস্থান করলেন। ইন্দ্রকীল পর্বতের গহন প্রদেশে অর্জুন আবার শিবলিঙ্গ সম্মুখে রেখে শিবধ্যানে মনোনিবেশ করলেন। কখনও তিনি পরমযোগীর মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে শিবমন্ত্র উচ্চারণ করেন। কখনও তিনি শিবধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকেন। অর্জুনের এই তপস্যায় দেবগণ আশ্চর্য হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে এই দুশ্চর তপস্যার কথা দুর্যোধনের কানে উঠল। তিনি অর্জুনের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য 'মূক' নামে এক দৈত্যকে নিযুক্ত করলেন। মূক দৈত্য এক ভয়ানক শূকরের বেশ ধারণ করে পাহাড় পর্বত ভেদ করে নানা শব্দ করতে করতে অর্জুনের তপস্যা স্থলের দিকে ছুটে চলল। অর্জুন সেই শূকররূপী দৈত্যকে দর্শন করে মনে মনে ভাবলেন, এই জীব সাধারণ নয়, কোন দৈত্যে এই রূপ নিশ্চয়ই ধারণ করেছে। এ নিশ্চয়ই আমার ঘোরতর অনিষ্ট করার জন্য অগ্রসর হয়েছে। অতএব এ যে শত্রু, তাকে কোন সন্দেহ নেই। আমি কত দৈত্য ও দানবকে বিনাশ করেছি, তাদেরই কোনো আত্মীয় নিশ্চয়ই আমার ক্ষতি করতে চাইছে। সুতরাং আত্মরক্ষা রক্ষা একান্ত কর্তব্য। অর্জুন মনে মনে এই বিবেচনা করে ধনুতে বাণ যোজনা করলেন।

এদিকে দেবাদিদেব মহাদেব অলক্ষ্যে থেকে দেখলেন তার একান্ত ভক্ত অর্জুনকে মূক দৈত্য আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। তিনি ভক্তকে রক্ষা ও তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য ছদ্মবেশে ইন্দ্রকীল পর্বতে নেমে এলেন। সঙ্গে এলেন তাঁর অনুচরেরা। শিব কিরকম ছদ্মবেশ ধারণ করলেন? অঙ্গে কৌপীন ধারণ করলেন,

BanglaBook.org

লতা দিয়ে নিজের জটাকে বাঁধলেন। শরীরে মৃত্তিকা নিয়ে নানা বর্ণ চিত্রিত করলেন, পিঠে নিলেন ধনুর্বাণ। শিব হলেন ব্যাধদেব রাজা, তাঁর অনুচরেরাও ব্যাধবেশ ধারণ করলেন। তখন কিরাত সেনাপতিরূপী শিব তাঁর সৈন্য নিয়ে অর্জুনের তপস্যা স্থলের দিকে অগ্রসর হলেন।

একদিকে মূক দৈত্যের গর্জন অপরদিকে কিরাত সেনাপতির সৈন্যদলের হুঙ্কারে বনতল মুখরিত হয়ে উঠল। বনের পশুপাখীরা শঙ্কিত হয়ে ভীত রবে চীৎকার শুরু করল। অর্জুনও সেই বিপুল শব্দে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, আজ দুই দিক থেকে শত্রুর আক্রমণে কবলিত, হে শিব শম্ভো, তুমি আজ আমায় রক্ষা করো। আমি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেবের মুখে শুনেছি, স্মৃতিশাস্ত্র ও বেদেও বলা হয়েছে শিবই মঙ্গলকারী। শিবই ভক্তিদাতা এবং মুক্তিদাতা তাতে কোনো সংশয় নেই। যে সব পুরুষ শিব নাম স্মরণ করে তাতে নিশ্চয় তাঁদের মঙ্গল হয়। যদি কখনও কেউ কর্মবশত দুষ্টকর্ম সম্পাদন করে তা হলে বহু দুঃখের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে স্বল্পদুঃখ লাভ করে। শিব ইচ্ছা করলে বিষকে অমৃত এবং অমৃতকে বিষ করতে পারেন। তাঁর যা ইচ্ছা তাই তিনি করতে সক্ষম। দেবাদিদেবকে কে নিবারণ করতে পারে। যেভাবে ভক্তের মঙ্গল হয়, তিনি সেইভাবেই ভক্তকে কর্মফল প্রদান করেন। শিব 'আমার ভক্তদের আমি রক্ষা করব'—এই আশ্বাস প্রদান করেছেন। আজ আমি মহাসঙ্কটের মধ্যে উপস্থিত হয়েছি। তিনি কি আজ আমাকে রক্ষা করবেন না, হে শঙ্কর, দেবী লক্ষ্মী আমার কাছে থাকুন বা না থাকুন। মৃত্যু আমার জীবন হরণ করুক বা না করুক, লোকেরা যদি আমার নিন্দায় মুখরিত হয় তো হোক। তবু আমি জানি তুমি মঙ্গলময়। তাই তোমার ভজনাকালে আমার মঙ্গল হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। '—অর্জুন যখন বাণ যোজনা করে এই চিন্তা করছেন তখন শূকররূপী মূক দৈত্য তাঁর অতি নিকটে উপস্থিত হল। এদিকে মহাদেব ও আমার ভক্তদের যেন কোনো ক্ষতি না হয়'—এই ভেবে দ্রুত নেমে এলেন, সেইসময় শিব ও অর্জুনের মধ্যে মূক দৈত্যকে দেখা যেতে লাগল। এর ফলে দেবাদিদেব ও অর্জুন একসাথে তীরবিদ্ধ করলেন শূকরকে। শিবের বাণ শূকরের পুচ্ছভাগে এবং অর্জুনের বাণ শূকরের মুখে গিয়ে লাগল। শিবের বাণ মুখ দিয়ে প্রবেশ করে পুচ্ছ দিয়ে নির্গত হল। শূকররূপী দৈত্য তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করল। শত্রু নিধনের পরেই জমে উঠল প্রকৃত অভিনয়। শিব ও অর্জুনের দ্বন্দ্ব! ব্যাধরূপী শিব ও সাধক অর্জুন।

শূকররূপী মূক দৈত্য প্রাণত্যাগ করতেই অর্জুন আনন্দের সঙ্গে জয় 'শিবশম্ভো' বলে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, একি অদ্ভুত

BanglaBook.org

মায়া, এই শূকর মৃত হয়ে হতেই এক দিব্য জয়ধ্বনিতে যেন চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল, এ নিশ্চয়ই দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপা—এইসব চিন্তা করে অর্জুন মৃত শূকরের দিকে এগিয়ে গেলেন। এদিকে শিবও তাঁর বাণ নিয়ে আসবার জন্য এক অনুচরকে পাঠালেন। ব্যাধরূপী শিবভৃত্য এবং অর্জুন একসঙ্গে শূকরের কাছে উপস্থিত হলেন। অর্জুন শিবভৃত্যকে সামান্য ব্যাধ মনে করে অবহেলা করলেন এবং তাঁকে তিরস্কার করে বাণ মাটি থেকে তুলে নিলেন। তখন শিবভৃত্য অর্জুনকে বললেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ সাধক, তুমি কি জন্য বাণ গ্রহণ করলে? এই বাণ আমাদের। তুমি এই বাণ ত্যাগ কর। আমার দলপতি এই বাণের জন্য অপেক্ষা করছেন। 'শিবভৃত্য একথা বলতেই অর্জুন বলে উঠলেন, 'হে বনেচর! তুমি মুর্খ; না জেনে কিজন্য এই সব কথা বলছ? আমি এইমাত্র এই বাণ দিয়ে শূকরকে বধ করেছি। এই বাণ কিভাবে তোমার হল? এই দেখ আমার বাণের সমস্ত চিহ্ন এর মধ্যে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে, পিছনে রয়েছে ময়ূরপুচ্ছ। এর মধ্যে আমার নাম অঙ্কিত রয়েছে, কিভাবে এই বাণ তোমাদের হল?'

অর্জুনের কথা শুনে শিবভৃত্য রেগে উঠলেন। তিনি অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, 'আরে তপস্বী, তুমি তপস্যা করছ, না কেবল তপস্যার বেশ ধারণ করেছ। তুমি দেখছি যথার্থ সন্ন্যাসী নও, একটি বাণের জন্য আমার সঙ্গে তর্ক করছ! তুমি কি মনে করেছ, আমি একাকী। আমার সেনাপতি আছেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছে বহু ব্যাধ সৈন্য। তিনি উদার, তিনি যেমন নিগ্রহ করতে পারেন, তেমনি অনুগ্রহও করতে পারেন। তোমার যদি এরকম বাণের প্রয়োজন হয়, তবে তুমি তাঁর কাছে চেয়ে নিতে পার, তিনি তোমায় অবশ্যই দান করবেন, তাঁর কাছে এরকম বাণ বহু রয়েছে। তুমি দেখছি কেবল তার্কিক নও, লোভীও। তোমাকে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হতে দেখে আমার প্রভু তোমায় রক্ষা করলেন। তোমার শত্রু বধ করলেন, তুমি অকৃতজ্ঞের মতো তা অস্বীকার করছ। তুমি কি জান না, চৌর্য্য, চাঞ্চল্য, অভিমান, বিস্ময় ও সত্যত্যাগ—এই সব থেকে তপস্যার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়! তুমি আমার প্রভুর কাছে এই বাণটি চেয়ে নাও, বিশেষভাবে জানালে তিনি ফল প্রদান করে থাকেন।'

সামান্য বনেচর এক ভূতের মুখে এই তিরস্কার বাক্য শুনে অর্জুন উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, হে ব্যাধ, তুমি আমাকে চোর বললে। জান আমি ক্ষত্রিয় সন্তান। তুমি যেমন নীচ জাতির তোমার কথাও তেমনি। একজন ব্যাধ সে রাজাই হোক, আর যাই হোক, আমি ক্ষত্রিয়পুত্র হয়ে তোর কাছে অস্ত্র ভিক্ষা করব। ক্ষত্রিয়গণ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করেন না। বনেচরগণই চৌর্য্যবৃত্তিতে একান্তে পটু। তোমার তুল্য ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতাও হতে পারে না, মিত্রতাও হতে পারে না।

BanglaBook.org

কারণ শত্রু ও মিত্র উভয়ই সমশ্রেণীভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। অতএব তোমার যদি বাণের প্রয়োজন হয়, তবে তোমার প্রভুকে আমার কাছে চাইতে বল, আমি তা আনন্দের সঙ্গে প্রদান করব। নচেৎ আমার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাণ নিয়ে সুখে বনে গমন কর।—এইভাবে অর্জুন ও শিবভৃত্য—দুজনের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হতে লাগল। অর্জুন শিবভৃত্যকে তাচ্ছিল্য করে বললেন, 'যাও তোমার সেনাপতিকে ডেকে আন, এই বনের পশুপক্ষী দেখুক, সিংহ আর শৃগালের যুদ্ধ।' অর্জুনের উপহাস শুনে শিবভৃত্য রেগে বলে উঠলেন, 'তুমি ঋষি নও, তুমি অজ্ঞ, তুমি মরণের জন্যে প্রস্তুত হও।' অর্জুন হেসে তাচ্ছিল্য করতেই, শিবের অনুচর শিবের কাছে উপস্থিত হয়ে সমস্ত কথা নিবেদন করল। অর্জুনের কথা শুনে শঙ্করের ঠোঁটের কোণে হাসি খেলে গেল। তিনি ব্যাধ সেনাপতিরূপে তাঁর সুন্দর বিশাল কান্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এবং অর্জুনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এই সময় শিব এক অনুচরকে আদেশ করলেন, 'আমি ধীরে ধীরে উপস্থিত হচ্ছি। তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তপস্বীকে বল, হে তপস্বী, আমাদের বিরাট সৈন্য তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে। একটা বাণের জন্য তুমি কেন প্রাণ দেবে। তোমার মৃত্যু হলে তোমার ভাইরা অত্যন্ত দুঃখিত হবে, তোমার স্ত্রী দুঃখিতা হবে। তোমাকেও পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে। সুতরাং তুমি যুদ্ধ করার বাসনা ত্যাগ কর।'—শিবের আদেশ শুনে এক অনুচর অর্জুনের কাছে উপস্থিত হলেন, এবং শিব যা বলে দিয়েছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করলেন। অর্জুন সেইকথা শুনে উত্তর দিলেন, 'হে ব্যাধ, তুমি যা বললে তার কোনোটাই ঠিক নয়। আমার কুল মলিন হবে যদি বিনাযুদ্ধে আমি বাণটি দিয়ে দি। আমার ভাইরা আমাকে কাপুরুষ বলে তিরস্কার করবে। এই বাণ বিনা যুদ্ধে তোমাকে দান করলে আমার সমস্ত বিদ্যা বৃথা হয়ে যাবে। আর একথা আমি কখনও শুনিনি, সিংহ শৃগালের ভয়ে ভীত হয়। হে ব্যাধ তোমাদের দলপতিকে দ্রুত আসতে বল।' অর্জুনের উত্তর অনুচরের মুখে শুনলেন শঙ্কর। তিনি আনন্দিত মনে অর্জুনের কাছে উপস্থিত হলেন।

শুরু হল শিব ও অর্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ। অর্জুন শিবের বন্দনা করে অস্ত্র তুলে নিলেন। অন্যান্য ভিল ও ব্যাধেরা নানা অস্ত্র দিয়ে অর্জুনকে আঘাত করতে চেষ্টা করলেন। শিবও যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু অর্জুন একাকী তাঁদের বাণ প্রতিহত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। অর্জুনের সাহস ও ভক্তি দেখে শিব দয়া করে অর্জুনের ভার গ্রহণ করলেন, এদিকে অর্জুন কিন্তু শিব শরীরে আঘাত করতে লাগলেন। শিব অর্জুনের সমস্ত আয়ুধই নষ্ট করে দিলেন, এবং তাঁর ধণু ছেদ করে দিলেন। এরপর অস্ত্রত্যাগ করে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল দুজনের। মাটিতে যুদ্ধ করতে

BanglaBook.org

করতে দুজনে আকাশে উঠে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। এইভাবে ভীষণ যুদ্ধের সময় অর্জুন কোন সময়ে শিবের চরণে হাত দিয়ে ধরলেন। ভক্তকে চরণ আশ্রয় করতে দেখে দেবাদিদেব মহাদেব নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেন। অর্জুন তাঁর পা দুটি ধরে তাকে মাথার উপর ঘুরিয়ে নীচে ফেলতেই দেবাদিদেব তাঁর নিজরূপ ধারণ করলেন।

যুদ্ধবেশী ভিলরূপী মহাদেবকে দেখে এবার অর্জুন লজ্জিত হলেন, হায়, হায়! আমি একি করলাম। আহা! আমি যাঁর পূজা করছি, ইনি সেই শিব। ত্রিলোকপতি মহাদেব আমার সম্মুখে। প্রভুর মায়ায় অন্ধ হয়ে আমি তাঁকেই আঘাত করলাম। আমার বোঝা উচিত ছিল দেবাদিদেবের মায়া, মায়াবীদেরও মোহ উৎপন্ন করে। আজ আমাকে কি লজ্জিত হতে হলো। তিনি বারংবার দেবাদিদেবের চরণে প্রণত হয়ে বলতে লাগলেন, 'প্রভু, আপনি ক্ষমা করুন, হে মহাদেব, আপনি মঙ্গলকারী, আমাকে ক্ষমা করে দিন। শিব অর্জুনের কথা শুনে বললেন, 'হে পুত্র! তুমি আমার ভক্ত, আমি তোমায় পরীক্ষা করাবার জেন্যই একাজ করেছি। সুতরাং তুমি শোক ত্যাগ কর। আজ আমি তোমাকে বরদান করতে চাই, 'হে পার্থ, তুমি কোন বর আমার কাছে প্রার্থনা কর। হে অর্জুন, আমার সঙ্গে তোমার এই যুদ্ধ তোমার গৌরব বৃদ্ধি করবে, তাই আমি এই অভিনয় করলাম। তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে বর চাও।'

অর্জুন দেবাদিদেবের মুখে এই বার্তা শুনে তাঁকে একটি সুন্দর স্তবমন্ত্রে বন্দনা করলেন এবৎ বললেন, 'হে দেবাদিদেব, আপনি সব কিছুই অবগত আছেন। তবু আপনাকে জানাই, আমার ভয়ানক শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি। আপনি আমাদের শত্রুবধ করুন এবং আমার যশোলাভের উপায় বলে দিন।' অর্জুনের কথা শুনে দেবাদিদেব তাঁকে 'পাশুপত' নামে এক অস্ত্র প্রদান করলেন এবং বললেন, 'হে অর্জুন তুমি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শত্রুর কাছে অজেয় হবে। তুমি পাশুপত অস্ত্রের মাধ্যমে শত্রুকে বিনাশ কর এবং কৃষ্ণের সহায়তায় সুখে রাজ্য ভোগ কর।'

শিবপুরাণে বর্ণিত শিব ও অর্জুনের এই যুদ্ধ ও পাশুপত অস্ত্রলাভের কাহিনি আরও মনোরম হয়েছে অর্জুনের শিবস্তবের মাধ্যমে। লজ্জিত অর্জুন কি বলে স্তব করেছিলেন দেবাদিদেবের? অর্জুন বলেছিলেন,—

'হে দেবদেব! তোমাকে নমস্কার। তুমি কৈলাসবাসী, তোমাকে নমস্কার। তুমি পঞ্চবক্ত্র, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সর্বদা ভক্তদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাক, তোমার মুখটি সদা হাস্যময়। হে। হে নীলকণ্ঠ! তুমি সদাজাত, তোমাকে নমস্কার করি। হে বৃষধ্বজ। তোমার বামাঙ্গ গিরিজা দুর্গা, তোমাকে নমস্কার। তুমি হে দেব! তুমি দশভূজা, তুমি পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি স্বহস্তে ডমরু এবং নরকপাল ধারণ করেছ, তুমি নরকপালের মালা গলার ভূষণ করেছ, তোমাকে

BanglaBook.org

নমস্কার। তোমারা শরীর নির্মল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ এবং কর্পূরের মতো শুক্লবর্ণ, তুমি পিনাকপাণি, তুমি ত্রিশূলধারী, তোমাকে নমস্কার করি। ব্যাঘ্রচর্ম তোমার উত্তরীয়, তুমি গজচর্ম ধারণ করেছ। তোমার অঙ্গে সর্প অবস্থিত, হে গঙ্গাধর! তোমাকে নমস্কার করি। তোমার চরণ অতি সুন্দর, তুমি মুক্তিদাতা, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি নির্গুণ, তুমি সগুণ, তোমাকে নমস্কার, এই জগতে যা কিছু রূপ দৃষ্ট হচ্ছে তা সমস্তই তোমার তেজমাত্র। হে দেব; দেবতারা তোমার গুণ বর্ণনা করতে পারেন না, হে সদাশিব! আমি মন্দবুদ্ধি, তোমাকে কিভাবে বর্ণনা করব। তুমি যে হও, সে হও, তোমাকে নমস্কার করি। হে শম্ভো, তুমি আমাকে কৃপা কর।'—অর্জুনের স্তবের মধ্য দিয়ে দেবাদিদেবের চেহারার একটি বর্ণনা আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। গজচর্মে আবৃত তুষার ধবল দেহ। কাঁধে ব্যাঘ্রচর্ম। মস্তকে জটাভার থেকে গঙ্গা উৎসারিত। —রূপকল্পনা দেখে আমাদের হিমালয়ের কথাই মনে পড়ে যায়। তুষার ধবল চূড়া নিয়ে ধূসর রঙের বিস্তার, তার মধ্যে, দিয়ে বহমান নদী ও ঝরনার ধারা।! ঠিক যেন শান্ত সমহিত শিবেরই প্রতিমূর্তি। তাই আমরা বাংরবার দেখি হিমালয়কে শিবের আবাসস্থল রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কেবল তাই নয় গিরিজা নন্দিনী পার্বতীকে তিনি বিবাহ করেছেন। সব মিলিয়ে অনার্য ও আর্য সংস্কৃতির একটি সৌরভ যেন শিবরূপের মধ্যে দিয়ে ধরা পরে। কিন্তু সাধনার দিক দিয়ে তিনিই চরম প্রাপ্তিকে ছুঁয়ে আছেন। চাওয়া পাওয়ার উর্দ্ধে আত্মভোলা শিব। কিন্তু এই আত্মভোলা শিবই সংস্কৃতি সমন্বয়ের এযক বিরাট মাধ্যমরূপে ব্যক্ত করেছেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শিবপুরাণের শিবরূপ

শিবপুরাণে পার্বতীর সঙ্গে দেবাদিদেবের বিবাহ বর্ণনায় শিবের একটি রূপ কল্পনা লাভ করি। এখানেও দেবাদিদেব বিচিত্র সংস্কৃতির ধারক। যাঁকে দেখে মা মেনকা দুঃখ করে বলেছিলেন, 'হায় হায়, এ কার হাতে আমি কন্যা প্রদান করছি। এর থেকে তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিল, নাকি আমিই গরল পান করব! দেখ দেখ, বরের চেহারা! তারপর তাঁর মাতা নেই, পিতা নেই, ভ্রাতা নেই, বন্ধু নেই। আপন গোত্রজাত কেউ নেই। কি রূপ, কি চাতুরী, বা ভাল ঘর, বস্ত্র, অলঙ্কারও তাঁর নেই। একটি ভাল বাহনও তাঁর জোটেনি। এঁর কোনো বয়সের ঠিক নেই, ধন নেই, বিদ্যা নেই—এমন একটা কিছু নেই যা দেখে আমার কন্যা দান করতে পারি। হায়, আমার পার্বতীর কপালে এই বর জুটল। কার দোষ দেব, মেয়ে নিজেই তো শিবকে স্বামীরূপে বরণ করেছে! এত দেবতা থাকতে এই ভূত প্রেত যুক্ত শ্মশানচারীকেই তাঁর পছন্দ হল? হে গিরিরাজ, তুমি আর দেবর্ষি নারদ উভয়েই তো দেবাদিদেবকে দেখেছিলে—তুমি পিতা হয়ে কি প্রাণে কন্যাকে এই ভিখারীর হাতে তুলে দেবে! —কিরকম রূপে মা মেনকা প্রথম দেবাদিদেবকে দেখতে পেলেন, ভূত-প্রেত প্রমথগণের মধ্যেখানে বৃষারূঢ় পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র, দশভূজা, চন্দ্রশেখর, পিনাকপাণি, ব্যাঘ্রচর্মের উত্তরীয়ধারী, গজচর্ম পরিহিত দেবাদিদেবকে দেখেছিলেন মেনকা। শিবপুরাণে বর্ণিত দেবাদিদেবের বর্ণনায় আমরা একটি বিশেষত্ব পাই। এখানে দেবী দূর্গা দশভূজা নন্—দশভুজ ধারণ করেছেন মহাদেব। তাঁর দশটিহাত পাঁচটি মুখ, তিনি মাথায় চন্দ্রলোকে স্থান দিয়েছেন। চারপাশে ভূতপ্রেতগণ যাঁরা দেখতে কদাকার, কালো, ভয়ঙ্কর, কেউ খঞ্জ, বহুরোমযুক্ত, কারও হাতে মুদগর, কেউবা কু-কথা উচ্চারণকারী, কেউ বা মনের সুখে ডমরু বাজাতে বাজাতে শিবের পাশে নৃত্য করছে। কারও মুখে 'বিল বিল'— এইরকম বিচিত্র শব্দ উচ্চারণ করছে। সব নিয়ে ছবিটি যে ভয়ঙ্কর তাতে সন্দেহ নেই। তার উপরে দেবাদিদেবের আগে অন্যান্য দেবতাদের দেখেছেন মেনকা, যাঁদের অঙ্গ সুরভি যুক্ত, নানা অলঙ্কার শোভিত, বিচিত্র ও সুন্দর বাহনে তাঁর উপবিষ্ট। বিশেষ করে গন্ধর্বদের রাজা বিশ্বাবসুকে দেখে অত্যন্ত ভাল লেগেছিল মা মেনকার। ভেবেছিলেন ইনিই বুঝি শিব। কিন্তু দেবর্ষি জানালেন, এ

BanglaBook.org

ব্যক্তি দেবতাদের গায়কমাত্র। দেবর্ষির কথা শুনে মেনকা ভাবলেন, 'আহা, দেবতাদের গায়কেরই যদি এত রূপ তবে দেবাদিদেব মহাদেব কত না সুন্দর হবে!'—এরপর দেবরাজ ইন্দ্র, মৃত্যুর দেবতা যমরাজ, তেজস্বী সূর্যদেব, সর্বগ্রহ সমন্বিত চন্দ্র, হাঁসে চড়া ব্রহ্মা ও সর্বশেষে পীতাম্বর ধারী, নানা মণিখচিত মুকুটাদি ভূষণে ভূষিত, অষ্ট সিদ্ধি-সমন্বিত, লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে দেখেও শিব বলে ভুল করেছিলেন মেনকা। কিন্তু তার পরিবর্তে শঙ্খের কুণ্ডলধারী দশভূজা শিবকে দেখে এবং তাঁর অনুচরদের আচরণ লক্ষ্য করে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন মেনকা। — অন্যান্য দেবতাদের বর্ণনা ও রূপকল্পনার পাশে গোত্রহীন, পিতৃ, মাতৃহীন দেবাদিদেব মহাদেবকে ভিন্ন সংস্কৃতিভূক্ত বলে মনে হয় না কি! —তবে মনে রাখতে হবে এই ভিন্ন দেবচরিত্রটি ত্যাগ, তপস্যায় ও চরিত্রে দেবতাদের শ্রেষ্ঠ। তাই তিনি উদাসীন হলেও; জগত তার উদাসীন নয়। তাই তিনি দেবাদিদেব রূপে পূজিত।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শিবরাত্রি

শৈব ভাবনার সঙ্গে আদিম জনগোষ্ঠীর সম্পর্ককে সহজে মুছে ফেলা যায় না। দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গ বর্ণনা করবার সময় আমরা বারংবার এই প্রসঙ্গটির উপস্থিতি দেখতে পাব। দেখতে পাব চেনা কাহিনিও পুরাণের পাতায় অচেনা হয়ে বিরাজমান। যেমন শিবরাত্রি ব্রতের ব্রতকথাটি ধরা যাক্ না কেন। শিবপুরাণে এই কাহিনি ভিন্নরূপ নিয়েছে।

পুরাকালে কোন এক বনে এক নিষাদের বাস ছিল। ভীল জাতীয় এই ব্যাধ সমস্ত জীবন প্রচুর প্রাণীহত্যা, চুরি ও নানা অপকর্ম করে একদিন স্ত্রীপুত্রের জন্যে প্রাণীবধ করতে গভীর বনে প্রবেশ করল। ব্যাধ জানত না, সেই দিনটি শিবরাত্রি পুণ্য তিথি। ব্যাধ সে, তিথি নক্ষত্রের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই নেই। আবার সকালে উঠেই পিতামাতার মুখে শুনেছে পুত্র আমরা ক্ষুধার্ত। তুমি শীঘ্র বনে গমন কর এবং পশুহত্যা করে আমাদের ক্ষুধা মোটাও।' পিতামাতার মুখে এই কথা শুনেই ধনুক আর তীর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে জঙ্গলের উদ্দেশে। কিন্তু হায়, সমস্ত দিন চলে গেল ব্যাধ অতি সুস্বাদু মৃগ মাংসের কোনো উপায় করতে পারল না। একটি মৃগের দেখা নেই, এদিকে সূর্য অস্তপ্রায়। শিকার না করে ঘরে ফেরার কোনো প্রশ্ন নেই। তাই অস্তমিত সূর্য দেখে ব্যাধ খুব দুঃখিত হয়ে ভাবতে লাগল, 'আমি কি করি, কোথায় যাই। কোনো ভক্ষদ্রব্য পেলাম না, ঘরে ছোট ছেলে রয়েছে, তার উপর পিতামাতা না জানি কত কষ্ট হচ্ছে। এই সময় কিছু খাদ্য নিয়ে তবেই আমার ঘরে ফেরা উচিত।' এই ভেবে ব্যাধ জঙ্গলের ভিতর এক জলাশয়ের কাছে গেল। 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে, কোনো না কোনো হরিণ জলাশয়ে জল খেতে আসবে নিশ্চয়ই।' এই চিন্তা করে জলাশয়ের পাশে একটি বেলগাছের উপর উঠে পড়ল। সঙ্গে নিল খাওয়ার জল। এইভাবে ক্ষুধার্ত ব্যাধ বেলগাছের উপর অপেক্ষা করতে লাগল। ধীরে ধীরে দিনের আলো নিভে গেল, রাত্রি হয়ে এলো। এমন সময় তৃষ্ণায় কাতর এক হরিণ লাফিয়ে লাফিয়ে জলাশয়ের কাছে উপস্থিত হল। ব্যাধ সঙ্গে সঙ্গে ধনুতে বাণ যোজনা করল। তাঁর শরীরে নড়াচড়ায় একটি বেলপাতা ও সঞ্চিত জল বিল্ববৃক্ষের নিচে এক শিবলিঙ্গের মাথায় পড়ল। শিবরাত্রির পুণ্য তিথি, শিব ব্যাধের প্রথম প্রহরের পূজা গ্রহণ করলেন। শিবের মহিমাতে ব্যাধের সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে গেল।

BanglaBook.org

এদিকে হরিণী ব্যাধের আওয়াজ শুনে ভাবতে লাগল, 'হায়, এক ব্যাধের দৃষ্টিগোচর হয়েছি। কি করে এখান থেকে পালিয়ে যাই। যাক্ একটা কৌশল অবলম্বন করি!' —এই ভেবে ব্যাধকে বলল, 'হে ব্যাধ! তুমি এখন কি করবে বলে ঠিক করেছ।' হরিণীর কথা শুনে ব্যাধ উত্তর দিলেন, 'আমার পরিবারবর্গ ক্ষুধায় কাতর হয়ে রয়েছে। তোমাকে বধ করে তাঁদের আহারের বন্দোবস্ত করব। এই নিদারুণ কথা শুনেও মৃগী হাসতে হাসতে বলল, 'হে ব্যাধ! আমার এই বৃথাদেহের মাংসে কারো যদি সুখ হয়ত আমি ধন্য হব। কারণ, ইহলোকে পরোপকারী ব্যক্তির যে পুণ্য লাভ হয়, তা একশ বছর বর্ণনা করলেও শেষ করা যায় না। সুতরাং আমার এই অসার শরীর দান করে পুণ্য লাভ করব। কিন্তু আমার ঘরে কতগুলি বাচ্চা রয়েছে। তাদেরকে আমার স্বামী আর বোনের কাছে সমর্পণ করে, তাদের সঙ্গে শেষ দেখা করে তোমার কাছে আবার ফিরে আসব। তখন তুমি আমার মাংস দিয়ে উদর পূর্তি করো।' মৃগী এইকথা বললেও ব্যাধ প্রথমে তার কথা বিশ্বাস করল না। সে মৃগীকে উদ্দেশ করে বলল, 'হে মৃগী, বিপদে পড়লে সকলেই এরকম মিথ্যে কথা বলে থাকে। তুমি কি আমাকে বোকা পেয়েছ, আমি তোমাকে ছেড়ে দিই আর তুমি পালিয়ে যাও! হে মৃগী, তুমি তোমার সন্তানদের জন্য মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করছ।'

ব্যাধের কথা শুনে মৃগী বলল, 'হে পশুঘাতক ব্যাধ, তুমি আমার কথা শোনো। এই জগতে সত্যের জয় হয়। দেখছ না, বায়ু, সপ্তসমুদ্র, নদী সব সত্যকে আশ্রয় করে নিজ পথে চলছে। তারা কখনই তাদের নিয়ম লঙ্ঘন করে না, সীমানা অতিক্রম করে না। সত্যধর্ম সে অবলম্বন করে সেই প্রতিষ্ঠালাভ করে থাকে। হে ব্যাধ, তুমি আমার কথাগুলিকে মিথ্যা বলে মনে করো না। যদি আমি তোমার কাছে ফিরে না আসি, তবে সেইসব ভয়ানক পাপ আমার মস্তকে আরোপিত হবে যে পাপ গুলিকে জীব ভয় পায়। আমি যদি ফিরে না আসি তবে ব্রাহ্মণ বেদ বিক্রয় করলে, ত্রিকালে সন্ধ্যা আহ্নিক না করলে যে পাপ অর্জন করে—আমারও সেই পাপ হবে। স্বামী আমি যদি তোমার কাছে না ফিরে আসি তবে স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করলে স্ত্রীর যে পাপ হয়, কৃতঘ্ন ব্যক্তি অকৃজ্ঞতায় যে পাপ অর্জন করে, শ্রীহরিকে আরাধনা না করলে যে পাপ হয়, পরোপকারীর স্বীয় ধর্ম পালন না করলে যে পাপ হয়, আমারও মস্তকে সেই পাপরাশি আরোপিত হবে—এ আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি। তুমি কেবল আমাকে আমার সন্তাননের কাছে একবার যেতে দাও। 'মৃগীর মুখে এই ধর্মবাক্য শুনে ব্যাধের দয়া হল। সে বলল, 'বেশ, তুমি যাও। কিন্তু দ্রুত এখানে ফিরে এসো।'—ব্যাধের কথা শুনে

Banglabook.org

মৃগী আনন্দে প্রথমে জলপান করল। তারপর বনের ভিতর সন্তাননের কাছে ছুটে চলল। আর ক্ষুধার্ত ব্যাধ সন্তান ও পিতামাতার চিন্তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মৃগীর জন্যে প্রথম প্রহর জাগরণে কাটাল।

এদিকে মৃগীর খোঁজ করতে করতে তার বোন—আরেক মৃগী সেই জলাশয়ের ধারে উপস্থিত হল। তাকে দেখে ব্যাধ আবার আনন্দে ধনুতে তীর যোজনা করল। আবার তার নড়াচড়ায় গাছ থেকে একটি বেলপাতা ও কিছু জল গাছের নীচে শিবলিঙ্গের উপর পতিত হল। শিব শিবরাত্রিতিথিতে ব্যাধের দ্বিতীয় প্রহরের পূজা গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয় হরিণীও প্রথমটির মতো ব্যাধকে বলল, 'হে ব্যাধ, আমি আমার সন্তানদের স্বামীর কাছে রেখে আসি, আমার জীবন পরোপকারে উৎসর্গ করতে আমার কোনো আপত্তিই নেই।' ব্যাধ আবার প্রথমে অরাজি হয়ে পরে সম্মত হল। দ্বিতীয় মৃগীও আনন্দে জল পান করে ছুটে চলল ঘরের দিকে। আর মৃগীর আশায় বসে থাকতে থাকতে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরও জাগরণে কাটল ব্যাধের।

এইবার রাত্রির তৃতীয় প্রহরের প্রথমে দুই পত্নীর পিছন পিছন বলবান সুন্দর কান্তিমৃগ সেই জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হল। হৃষ্টপুষ্ট মৃগকে দেখে ব্যাধ সহর্ষে বলে উঠল, 'বাঃ', এই মৃগের শরীরে প্রচুর মাংস, আমার অপেক্ষা করা সফল হল। আমি একেই বধ করব।' এই ভেবে উৎফুল্ল ব্যাধ ধনুতে শর যোজনা করল। আবার তার নড়াচড়ায় একটি বেলবাতা ও কিছু জল গাছে নীচে শিবলিঙ্গের উপর পতিত হল। মহাদেব ব্যাধের তৃতীয় প্রহরের পূজা গ্রহণ করলেন।

মৃগও মৃগীদের মতো ব্যাধকে প্রশ্ন করলেন, 'হে পশুঘাতক ব্যাধ, তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাইছ? ব্যাধ উত্তর দিল নিশ্চয়ই'। ব্যাধের কথা শুনে মৃগও আনন্দের সঙ্গে বলতে লাগল, 'আজ আমি ধন্য হলাম, আমার শরীর পোষণ করা সার্থক হল। যার শরীর পরের উপকারে লাগবে না তাঁর শরীর ধারণ বিফল। যে জীব সমর্থ হয়েও উপকার না করে তাঁরে সামর্থ্যের প্রয়োজন কি? আমার এই অনিত্য শরীর দিয়ে তোমার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হবে, এতে আমি অনন্দিত। তবে হে ব্যাধ, আমার সন্তানেরা অসহায় অবস্থায় রয়েছে। তাদেরকে রক্ষা করে তবেই আমি তোমার কাছে ফিরে আসব। তুমি আমায় কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি দাও।'

মৃগের কথা শুনে ব্যাধ উত্তর দিল, 'হে মৃগ, শোনো তোমার আগে আরও দুজনে ঠিক একই কথা বলে গিয়েছে। কিন্তু তারা ফিরে আসেনি। এখন আমি আর বঞ্চিত হব না। তুমি বিপদের সময় মিথ্যা কথা বলে পালিয়ে যাবে। কিন্তু বলো তো, আমারও তো অন্নের প্রয়োজনে। আমার জীবন বাঁচবে কি করে? আমি

BanglaBook.org

তোমায় ছাড়তে পারি না।' ব্যাধকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখেও মৃগ কিন্তু মোটেই ভয় পেল না। সে তবুও নানা ধর্ম প্রসঙ্গ করে ব্যাধের মন জয় করল। ব্যাধ তাকেও বলল, 'ঠিক আছে তুমি যাও। কিন্তু দ্রুত ফিরে এসো।' মৃগ জলপান করে ঘরের দিকে ছুটে চলল। ঘরে ফিরে মৃগ এবং দুই মৃগী পরস্পর পরস্পরের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করল। পরে তারা চিন্তা করতে লাগল, আমরা তিনজনেই ক্ষুধার্ত ব্যাধের কাছে সত্যপাশে বদ্ধ হয়েছি। সুতরাং নিশ্চয়ই আমাদের ফিরে যেতে হবে।' তখন জেষ্ঠা মৃগী স্বামীকে বলল, 'হে প্রভু, যেহেতু আমি আগে প্রতিজ্ঞা করেছি সেজন্য আমিই গমন করি। কারণ বালকেরা কিভাবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে বাস করবে।' জেষ্ঠার কথা শুনে কনিষ্ঠা বলে উঠল, 'না, আমি তোমাদের দাসী। তাই তোমরা থাক, আমি ব্যাধের কাছে ফিরে যাই।' মৃগ দুই মৃগীকে নিরস্ত করে নিজেই ব্যাধের কাছে ফিরে যেতে উদ্যত হল। মৃগীরা ভাবল 'হায়, বিধবার জীবন ধিক্, এর থেকে মৃত্যু শ্রেয়।' তারাও মৃগের পিছনে পিছনে ব্যাধের উদ্দেশ চলল।

ব্যাধ যখন তাদের প্রতীক্ষা করছে, তখন তারা তিনজনেই সত্যপাশে আবদ্ধ হয়ে ব্যাধের কাছে উপস্থিত হল। ব্যাধ তাঁদের দেখে তৎক্ষণাৎ ধনুতে বাণ যোজনা করল। এদিকে মৃগশাবকেরা, পিতামাতার যা হবে, আমাদেরও তাই হবে'—এই চিন্তা করে জলাশয়ের কাছে উপস্থিত হল। আর ব্যাধের শরীর চালনার সঙ্গে সঙ্গে জল আর বেলপাতা শিবের মাথায় পড়ল। দেবাদিদেবের এমন করুণা, তিনি তা চতুর্থ প্রহরের পূজারূপে গ্রহণ করলেন। এইভাবে শিবরাত্রির পুণ্য তিথিতে চারটি প্রহরের পূজা সুসম্পন্ন হল। ব্যাধের সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে গেল। তখন মৃগ এবং মৃগী দুজন ব্যাধকে বলল, 'হে ব্যাধসত্তম, শীঘ্র মাংস ভক্ষণ করে আমাদের দেহকে সার্থক কর। আমরা সত্যপাশে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি।' ব্যাধ তাদের মুখে এই কথা শুনে বিস্মিত হল। শিবপূজা সম্পন্ন করার ফলে ব্যাধের জ্ঞান লাভ হল। সে ভাবল, 'হায়, এই মৃগরা ধন্য। কারণ এরা নিজেদের শরীর দান করেও পরের উপকার করতে সমর্থ। আমি মনুষ্যজীবন লাভ করে কি করলাম? কেবল অপরের শরীর পীড়ন করে নিজের শরীর পোষণ করেছি। আমি অন্যকে বহু পীড়া দিয়ে নিজের আত্মীয় পোষণ করেছি, আমার কি গতি হবে? ধিক্ আমাকে।'—এই রকম চিন্তা করে ব্যাধ বাণ সংবরণ করল। এইভাবে ব্যাধের কাজে দেবাদিদেব খুশি হলেন। তিনি দয়া করে, ব্যাধকে নিজের মনোহর রূপ দর্শন করালেন এবং বললেন, হে ব্যাধ, আমি তোমার পূজায় ও কাজে সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি কি বর লাভ করতে চাও?—ব্যাধ তৎক্ষণাৎ শিবের পাদবন্দনা করে বলল, 'হে দেব, এখন আমি সমস্ত পেয়েছি, কারণ আপনার দর্শনই মানবের একান্ত কামনার

BanglaBook.org

বিষয়।' তখন দেবাদিদেব মহাদেব ব্যাধের 'গুহ' এই নামে স্থাপন করে তাকে বর প্রদান করে বললেন, 'হে ব্যাধ, শোনো, তুমি এখানে মনের সুখে রাজ্যপাট ভোগ কর। তোমার বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বংশধরেরা দেবভক্তও হয়ে উঠুক। হে ব্যাধ! কোন একসময় দশরথ পুত্র রাম তোমার গৃহে আসবেন। তুমি শ্রীরামের পূজা ও তাঁর প্রতি ভক্তিলাভ করে পণ্ডিত ও মুনিদের চিরঅভিলষিত মুক্তি লাভ করবে। তোমার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি আমার পূজাতে রত হবে। তারা হবে অত্যন্ত বলবান।'' শঙ্কর একদিকে ব্যাধকে বরদান করলেন অপরদিকে মৃগ ও মৃগীরা শিবমূর্তি দর্শন করে মৃগযোনি ত্যাগ করল ও স্বর্গে গমন করল। এইভাবে শিবরাত্রির দিন নিজের অজ্ঞাতসারে, অভক্তিতে পশুঘাতক 'রুরুদ্রহ' নামক ব্যাধের শিবপূজার ফলে অর্ব্বুদাচল পর্বতে 'ব্যাধেশ্বর' নামক শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা হল।

শিবের কৃপায় রুরুদ্রহ প্রচুর ধন ও রাজ্যলাভ করে 'গুহ' হয়ে রাজ্যপাট চালাতে লাগল। তারপর একদিন শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় শিবের সাযুজ্য প্রাপ্ত হল। এইভাবে শিবরাত্রি ব্রত জগতে প্রসিদ্ধী লাভ করল। শিবপুরাণ অনুযায়ী সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা, অনেক ধর্ম, অনুষ্ঠান, নানারকম ব্রত, নানাতীর্থে গমন এবং নানা প্রকার বিচিত্র বস্তু দান করলে যে সব ফললাভ হয়, শিবরাত্রি ব্রত করলে তার সমানই ফল লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির এই মঙ্গলজনক ব্রত পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

শিবপুরাণে রচিত শিবরাত্রি ব্রতকথার মধ্যে শিবমাহাত্ম্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। সেটি হল মৃগ এবং মৃগীর মুখ দিয়ে সত্যবদ্ধতা ও পরোপকারের জয় ঘোষণা করা হয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

গণেশ সৃষ্টির কথা

বাংলার লোক কথায় শিব হয়েছেন হিমালয় দুহিতা পার্বতীর স্বামী। তাঁর দুই কন্যা লক্ষ্মী সরস্বতীর সঙ্গে কার্ত্তিক ও গণেশ দুই পুত্রও বিরাজমান। পৌরাণিক কাহিনিতে গণেশের সঙ্গে শিবের অদ্ভুত এক বিবাদের প্রসঙ্গ কথিত হয়েছে। শিবের পুত্ররূপে গণেশের ভূমিকাও এই কাহিনিতে পরিস্ফুট। প্রথমে কাহিনিটিই শোনা যাক্।

গিরিরাজের কন্যা পার্বতীকে বিবাহ করে শিব কৈলাস উপস্থিত হলেন। কিছুদিন পর পার্বতীর দুই সখী জয়া, বিজয়া ও কৈলাসে শিবগৃহে হাজির। সখীদের সঙ্গে বড়োই আনন্দের দিনগুলি কাটে উমার। একদিন জয়া, বিজয়া তাঁদের প্রাণপ্রিয় পার্বতীকে বললেন, দেখ গিরি নন্দিনী, শিব তোমাকে সুখে রেখেছেন। কিন্তু এখানে তোমার নিজস্ব বলে কিছু নেই। এমনকি অন্দরমহলে শিবের অনুচর নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি অসংখ্য প্রমথগণ পাহারায় থাকে। তারা শিবেরই আজ্ঞাবহ, তোমার নয়। যদিও মহাদেব তোমাকে খুবই স্নেহ করেন তথাপি আমাদের মন মানছে না। হে উমা, একজন তোমার আজ্ঞাবহ, তোমার নিজস্বলোক থাকা প্রয়োজন। 'সাথীদের পরামর্শ পার্বতীর মনে ধরলেও মুখে কিছু বললেন না। একজন নিজস্ব লোক থাকলে মহাদেব যদি অসন্তুষ্ট হন!

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই দ্বারপাল নন্দীকে তিরষ্কার করে শিব স্নানরতা পার্বতীর কাছে উপস্থিত হলেন। স্নানের সময়ে স্বামীকে দেখে লজ্জিতা পার্বতী স্নান সমাপ্ত না করেই উঠে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন, জয়া বিজয়া সত্য কথাই বলেছে। আমার আজ্ঞা যাতে অণুমাত্রও বিচলিত না হয়, এমন একজন বিশ্বস্ত আত্মীয় বা সেবক থাকা প্রয়োজন। এইভেবে দেবী তৎক্ষণাৎ জল থেকে মাটি তুলে এক সর্বাঙ্গ সুন্দর এক পুত্র তৈরি করলেন। এই মৃত্তিকা থেকে পার্বতীর হাতে সৃষ্ট পুত্রই হলেন গণেশ। পার্বতী তাঁকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করে দ্বারদেশের রক্ষক করে বললেন, 'হে পুত্র; যে ব্যক্তি আমার ঘরে আসতে চাইবে তাকে তুমি নিবারণ করবে।' তুমি আমার পুত্র। একারণ তুমি আমারই; তুমি ভিন্ন আমার কেউ নেই।' এখন তুমি দ্বারপাল রূপে এখানে অবস্থান কর।' এই বলে পার্বতী গণেশের হাতে একটি লাঠি ধরিয়ে দিয়ে, তাঁর সুন্দর মুখে চুম্বন করে স্নানে চলে গেলেন।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীর কাছে যাওয়ার জন্য ঐ দ্বারে উপস্থিত হলেন। দ্বারপাল গণেশ এবার ভোলানাথকে বাধা দিলেন। পার্বতীর আদেশ মতো শিবকে ধমকে বলে উঠলেন গণেশ, 'এই, তুমি কোথায় যাচ্ছ। এখন আমার মা স্নান করছেন এখন তুমি ভিতরে যেতে পারবে না।' গণেশের চেহারা ও হাতে লাঠি দেখে খুবই বিস্মত হলেন মহাদেব। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমি শিব, আমি অন্য কেউ নই। তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন? গণেশ উত্তর দিল শিব? কে শিব? কি দরকার তোমার? এখন আমার মায়ের সঙ্গে মোটেই দেখা হবে না।' শিব ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'আরে মুর্খ। আমি পার্বতীর স্বামী। আমাকে যেতে বাধা দিচ্ছিস কেন?' গণেশ শিবের কথায় মোটেই কর্ণপাত করলেন না। বরঞ্চ লাঠি দিয়ে শিবকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। শিব দেখলেন, এতো মহা অসম্মানের ব্যাপার। স্ত্রীর অন্দরমহলে প্রবেশের জন্য যদি প্রহার জোটে তবে তাঁর দেবাদিদেব পদের অমর্যাদা হবে। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে দূরে একস্থানে বসলেন আর অনুচরদের আদেশ দিলেন, এ কোন ব্যক্তি আমার অন্দরমলের দ্বারপালরূপে নিযুক্ত হয়েছেন! এখানে দাঁড়িয়ে আমাকে অপমান করার সাহস কি করে করছে তার অনুসন্ধান কর।'

শিবের আদেশে এবার শিবের অনুচরেরা গণেশের কাছে উপস্থিত হলেন। বালক গণেশকে দেখে তারা অবাক! এ ছোট্ট ছেলেটি আমাদের প্রভুকে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। এতো বড় আশ্চর্যের ব্যাপার। তারা দলবদ্ধভাবে গণেশের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, তুমি কে? তুমি কি করতে চাও, আমাদের প্রভুকে তাঁর অন্দরমহলে প্রবেশ করতে দিচ্ছ না কেন? গণেশ প্রমথদের প্রশ্ন শুনে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, তোমরা কে? তোমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কি? তোমরা তো খুবই রূপবান দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমাদের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে দেবনা!

নিজেদের রূপ নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি শুনে প্রমথগণ একটু অবাক হয়ে গেলেন—এ ছেলেটি বলে কি? শৃগাল হয়ে কি সে সিংহের আসন গ্রহণ করতে পারে। তাঁরা গণেশকে শিব শক্তির ভয়ে ভীত করতে চাইলেও গণেশ তাতে কর্ণপাত করলেন না, উপরন্তু লাঠি দিয়ে প্রমথদের তাড়না করলেন। গণেশের ব্যবহারে শিবের অনুচরেরা খুবই অপমানিত বোধ করলেন তারা শিবের কাছে গিয়ে গণেশের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। অনুচরদের কথা শুনে মহাদেব আরও আশ্চর্য। এরা বলে কি? একটি ছোট ছেলের কাছে পরাজয়। এরা কি যুদ্ধ করতেও জানে না। তিনি প্রমথদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই ছেলেটি যেই হোক, তোমরা তাকে বলপ্রয়োগ করে সেখান থেকে সরিয়ে দাও। তোমরা পরাজিত হয়ে চলে এলে

BanglaBook.org

লোকে বলবে কি!' শিবের আদেশ পাওয়া মাত্রই প্রমথগণ হৈ হৈ করে গণেশকে প্রহার করতে ছুটলেন। এদিকে এতগুলি অনুচরকে দেখে গণেশও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। প্রমথেরা চিৎকার করতে লাগল, 'রে মূর্খ! তুই কে? কি জন্য এখানে রয়েছিস! কেন তোকে এখানে বসানো হয়েছে। আমাদের অপমান করে তুই এখানে বেঁচে থাকতে চাস? তুই শিবের প্রতিদ্বন্দ্বী হলি কিভাবে? যতই তুই গর্জন করনা কেন, এখনই তুই আমাদের পরাক্রম দেখতে পাবি।

এদিকে শিবের অনুচরদের চীৎকার ও কথোপকথন পার্বতীর কানে গেল। পার্বতী ভাবলেন নিশ্চয়ই গণেশের সঙ্গে কারো বিবাদ শুরু হয়েছে। তিনি সত্ত্বর তাঁর সখীদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠালেন। সখী এসে ঘটনার একটু অংশ দেখেই খুব আনন্দিত হল। দ্রুত পার্বতী সন্নিধামে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'দেবী, বললেন, গণেশ যদি না থাকত তবে শিব ও প্রমথগণ সকলেই বাড়ীর ভিতরে আসত, দেখ গণেশের জন্যে আজ শিবানুচরেরা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেছে। যখন তখন যদি মহাদেব উপস্থিত হন তবে আমাদের শান্তিতে বাস করা মুসকিল। গণেশ তাঁদের কাছে তিরস্কৃত হয়েও কাউকে প্রবেশ করতে দেয়নি। এখনও শিবের অনুচরেরা তোমার গণেশের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধ করছে। গণেশের কাছে বাগ্‌যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করলেই শিবানুচরদের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত। দেখ সখী, স্বামীর প্রতি মমতাবশতঃ তুমি কিন্তু নরম হয়ে যেয়ো না। গণেশকে ভর্ৎসনা করার অর্থ আমাদেরই ভর্ৎসনা করা। তুমি তোমার সিদ্ধান্তে অটল থাক।'

সাথীদের কথায় পার্বতী মানিনী হয়ে উঠলেন এবং বললেন, মহাদেব কি তাঁর অনুচরদের নিয়ে ক্ষণকাল স্থির থাকতে পারলেন না! এখন তিনি যা করেছেন তারই ফলভোগ করবেন। সখী গণেশকে বলে এসো, আমার আদেশ অনুসারে সে যেন শিবাচরদের বল প্রয়োগ করে সরিয়ে দেয়।' সখীদের মুখে মাতার আদেশ শুনে গণেশ ভাল করে কবচ ও উষ্ণীষ বাঁধলেন, এবং উরুদ্বয়ে আঘাত করে গণদের বলতে লাগলেন, 'হে প্রমথগণ! তোমরা শোনো, আমি পার্বতীর পুত্র, শিবের অনুচর। তোমরা যেমন দ্বারপাল, আমি তেমনই দ্বারপাল। তোমরা যখন এখানে থাকবে, তখন তোমাদের শিবের আজ্ঞা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এখন আমি শিবার আদেশের প্রতিপালন করব। তোমরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাকে পরাজিত করে অথবা আমার কাছে নত হয়ে এই গৃহে প্রবেশ কর। এছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই।'

শিবের অনুচরেরা গণেশের কথা দেবাদিদেবকে জানাতে শিব তাঁদের বললেন, 'হে প্রমথগণ! তোমরা বুঝতেই পারছ এস্থলে আমাদের যুদ্ধ করা ঠিক

BanglaBook.org

নয়। কারণ আমার সঙ্গে তোমাদের মত্যে বিপুল অনুচরবর্গ রয়েছে। অপরদিকে গণেশ আর গৌরী একদিকে। এইরকম দুর্বলের সঙ্গে যুদ্ধ করি কিভাবে। আবার অনুচরগণ তোমরা যদি যুদ্ধ না কর, বিনয় প্রকাশ কর তবে লোকে বলবে, স্ত্রৈণ মহাদেব স্ত্রীর বশ্যতা স্বীকার করলেন। তাই আমার মনে হয় গণেশ যখন যুদ্ধ করতে চাইছে তখন তোমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। তোমরা যুদ্ধ দক্ষ রূপে খ্যাত। পার্বতী স্ত্রীলোক, সে যদি যুদ্ধ করতে চায় তবে উচিত শিক্ষা লাভ করবে।'

শিবের আদেশ লাভ করে প্রমথরা চললেন যুদ্ধের বেশে। গণেশও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। যুদ্ধে যেন গণেশের বেশী উৎসাহ। তিনি প্রমথদের উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, 'আজ আপনার পার্বতী পুত্রের বল অবলোকন করুন। হে শিবানুচরগণ, তোমরা বহুবার যুদ্ধ করেছ, কিন্তু আমি বালক, তার উপরে আমি কখনও যুদ্ধ করিনি। এই যুদ্ধে তোমাদের পরাজয় অথবা জয় হলেও লজ্জা আছে, কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোন প্রকারের লজ্জা নেই। কিন্তু এই যুদ্ধে জয় হোক বা পরাজয়—দুইই পার্বতী ও শিবের উপর বর্তাবে। এসব ভেবে তোমাদের যুদ্ধ করা উচিত।' ছোট্ট বালকের মুখে এই সব কটুক্তি শুনে শিবানুচরগণ খুবই রেগে গেলেন। তাঁরা যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন গণেশ প্রথমে নন্দীকে পরে ভৃঙ্গীকে লাঠি আর পা দিয়ে আঘাত করলেন। নন্দী ও ভৃঙ্গী উভয়েই ধরাশায়ী হল। গণেশ দুয়ারের অর্গল ভাল করে বন্ধ করে তার সামনে বসে রইলেন। নন্দী ভৃঙ্গীর এই অবস্থা দেখে অন্যান্য অনুচরেরা ছুটে এলেন। কিন্তু কেউই গণেশের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠলেন না। গণেশ তাদের মধ্যেকারও মাথা, কারও কটি, তার জানুতে আঘাত করে ভূতলে শুইয়ে দিলেন। তাঁর এই পরম বিক্রম দেখতে পেয়ে প্রমথগণ এক একজন এক একদিকে পালিয়ে বাঁচলেন। যুদ্ধকালে গণেশকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন প্রলয়কালে মহাকালের মতো রূপ গ্রহণ করেছেন। গণেশের এই রকম বীরত্বের কথা নারদের মুখে শুনলেন দেবগণ। শিবা অনুচরও পার্বতী পুত্রের যুদ্ধ দেখতে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর শিবানুচরদের পরাজয় দেখে শিবকে বললেন, 'হে প্রভু, আজ্ঞা করুন। কি করতে হবে।' শিব ব্রহ্মাকে বললেন, 'হে ব্রহ্মা, আপনি গিয়ে ঐ মহাবল পরাক্রান্ত গণেশকে সান্ত্বনা দান করুন। যেন প্রলয় না উপস্থিত হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখুন।' শিবের আদেশ পেয়ে ব্রহ্মা চললেন গণেশের কাছে।

পার্বতী পুত্র গণেশ শিবকেই চিনতেন না। সেখানে ব্রহ্মাকে চিনতে পারার কোন প্রশ্নই নেই। পিতামহ ব্রহ্মা যে দেবতাদের শ্রদ্ধার ও পূজার পাত্র বালক গণেশ জানবেন কেমন করে! উপরন্তু ব্রহ্মার লাল গাত্রবর্ণ ও সাদা দাড়ি দেখে

BanglaBook.org

বালক গণেশের খুব মজা লাগল। ব্রহ্মাকেও শিবের অনুচর মনে করে সরাসরি দাড়ি ধরে আকর্ষণ করলেন ব্রহ্মা চীৎকার করে বললেন, 'হে দেব! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর; আমি যুদ্ধ করতে আসি নি।' কিন্তু গণেশ মোটেই তাঁর মথায় গুরুত্ব দান করল না। স্বয়ং ব্রহ্মাকে আক্রান্ত হতে দেখে দেবতাগণ আর দাঁড়িয়ে থাকলেন না। তাঁরা ছুটে পালিয়ে এলেন শিবের কাছে। বেচারা শিব, একেই তিনি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে নিজেরই অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারেন নি, উপরন্তু অভিমানে একজায়গায় বসেও তাঁর শান্তি নেই। একের পর একজন এসে পরাজয় বার্তা শুনিয়ে যাচ্ছে। আর সহ্য করতে পারলেন না মহাদেব, সময়ের আগেই সৃষ্টি ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। শিব ক্রুদ্ধ হয়েছেন দেখে পার্বতী গণেশের জন্যে দুটি অমোঘ অস্ত্র প্রস্তুত করলেন। এরমধ্যে প্রথম শক্তিটি কৃষ্ণ পর্বতের মতো অলৌকিক তেজ সম্পন্না হয়ে ভীষণ বদনবিবর বিস্তার করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় শক্তি শিবপক্ষীয়দের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রজাল নিজ মুখে গ্রহণ করে আবার তাদের দিকেই ছুঁড়তে লাগলেন। এরফলে যুদ্ধ স্থলে তাই কোনো দেবতাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। অথচ গণেশ সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হতে লাগলেন। পুরাকালে মন্দার পর্বত যেমন সমুদ্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, ঠিক তেমনই দুস্তর সৈন্য সাগরে আলোড়ন সৃষ্টি করল। গণেশ বামে, দক্ষিণে প্রবল বেগে গদা ঘুরাতে লাগলেন। স্বর্গ থেকে মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী সব অপ্সরাগণ ফুল আর চন্দন নিয়ে গণেশকে দেখতে এলেন। এই সময় দেবর্ষি নারদ মহাদেবকে গিয়ে বললেন, হে দেব! এ গণেশ জীবিত থাকলে জগৎ ধ্বংস করবে। অতএব এঁকে বধ করুন।' দেবর্ষির কথাশুনে শিব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। মহান যুদ্ধের আয়োজন করে শিব এবং বিষ্ণু গণেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন।

গণেশকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে দেখে মহাদেব পড়লেন মুসকিলে। একদিকে যুদ্ধ না করলেও নয়, আবার পার্বতীর সঙ্গে বিবাদের ইচ্ছাও তাঁর নেই। তার থেকেও বড়ো কথা এই যুদ্ধে যদি পরাজিত হন তবে আর লজ্জার সীমা থাকবে না। কিন্তু তবু যুদ্ধ আরম্ভ হল। পার্বতী পুত্র গণেশ সকলকে পরাজিত করলেও দেবাদিদেব মহাদেবকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেন না। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলেন গণেশ। কেবল পরাজিত নন, গণেশের মস্তক ছেদন করলেন শিব। মস্তক হীন গণেশকে দেখে পার্বতী ক্রোধে আগুন। কোনো দেবতার সাহস হল না তাঁর কাছে যাওয়ার। গণেশকে পরাজিত করেও শিব এবার পড়লেন মুসকিলে। কি হবে, কি করে এর সমাধান হবে। দেবতারা স্তবের মাধ্যমে দেবীকে তুষ্ট করলেন আর দেবাদিদেব মহাদেব গণেশের মাথায় হস্তীর মুণ্ড স্থাপন করলেন। সেই সঙ্গে গণেশকে পুত্র রূপে স্বীকার করে নিলেন।

BanglaBook.org

মল্লিকার্জুন তীর্থ

যুদ্ধ জয়ের পর গণেশ শিব ও পার্বতীর খুব প্রিয় হয়ে উঠলেন। মাতৃভক্ত গণেশ সর্বদাই মায়ের কোল আলো করে বসে থাকেন। শিবও তাঁর শুঁড়ে হাত বুলিয়ে আদর করেন। কিন্তু কার্তিকের মন একটু খারাপ। তিনিও জন্মগ্রহণ করা অবধি কেবলই যুদ্ধ করছেন। কাজের অন্ত নেই। দেবসেনাপতি তিনি। শিব ও পার্বতী তাঁকে স্নেহ করেন না তা নয়! তবে গণেশের মতো নয়! ইঁদুর চড়া গণেশ আর ময়ূর বাহন কার্ত্তিকের দিকে তাকিয়ে একদিন শিব ও শিবা পরস্পর আলোচনা করতে লাগলেন, দুই পুত্রের বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন। তাঁদের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আর ষড়ানন কার্ত্তিক আর গজানন গণেশ সবসময়ই নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে; এ বলে' আমি আগে বিবাহ করব,' আরেকজন বলে না আমি আগে বউ আনব'। তাঁদের এই বিবাদ দেখে হরপার্বতী চিন্তিত হন। কাকে আগে বিবাহ দেওয়া যায়। দুজনেই আমাদের সমান প্রিয়! একজনকে আগে বিবাহ দিলে অপরজনের মন খারাপ হবে! পিতামাতা রূপে এটা কখনই তাঁদের কাম্য নয়। তবে কি করা যায়? অনেক ভেবে শিব পার্বতী ঠিক করলেন, দুই পুত্রকে একটি বিষয়ে পরীক্ষা করতে হবে, যে পরীক্ষায় জয়ী হবে, তাঁর কণ্ঠেই বরমাল্য আগে পরানো হবে। এই চিন্তাকরে হর-পার্বতী কার্ত্তিক ও গণেশকে ডেকে বললেন, 'হে পুত্রদ্বয়! আমরা একটি যুক্তি স্থির করেছি, তোমরা দুজনেই আমাদের কাছে সমান। তাই তোমাদের মধ্যে সে আগে পৃথিবী, পরিক্রমা করে আমাদের কাছে ফিরে আসবে তাঁকে আমরা আগে বিবাহ দেব।'

পিতামাতার এই আদেশ শুনে কার্ত্তিক ময়ূর নিয়ে দ্রুত পৃথিবী ভ্রমণে নির্গত হলেন। যাওয়ার আগে তিনি তির্যক দৃষ্টি হানলেন গণেশের স্থূল দেহের প্রতি। গণেশ তখন মনে মনে ভাবতে লাগলেন, 'এখন কি করি! ক্রোশমাত্র গিয়েই আমি হাঁপিয়ে উঠি, সেক্ষেত্রে দ্রুত পৃথিবী পরিক্রমণ আমার পক্ষে অসম্ভব! সুতরাং অন্য উপায় চিন্তা করতে হবে, এই ভেবে বুদ্ধিমান গণেশ ধীরে ধীরে যথাবিহিত স্নান অর্পণ করে, শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করে হর-পার্বতী যেখানে বিরাজ করছেন, সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর তিনি দুটি আসন যত্নসহকারে বিছিয়ে দিয়ে বললেন, 'হে পিতঃ! হে মাতঃ! আপনাদের পূজার জন্য এই আসনদ্বয় স্থাপন করেছি। আপনারা এই আসন গ্রহণ করুন।' গণেশের কথায় হর-পার্বতী সেই আসন গ্রহণ করলেন এবং গণেশ

BanglaBook.org

তাঁদের যথা বিহিত উপাচারে পূজা করে পিতামাতাকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করলেন। এইভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ করে কৃতাঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন, 'হে মাতঃ হে পিতঃ এখন দ্রুত আমার বিবাহের আয়োজন করুন।'—গণেশের এই কথা শুনে হর-পার্বতী অবাক! —'সে কি পুত্র, তুমি সসাগরা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ কর। কার্ত্তিক অনেকক্ষণ প্রদক্ষিণের জন্য বেরিয়ে গিয়েছে। তুমিও শীঘ্র যাও। যদি সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে আসতে তবেই আমি তোমার বিবাহ দেব।' গণেশ তখন ক্রোধভরে বলে উঠলেন, কেন আমি সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলাম, আর আপনারা আমার বিবাহের কথায় বিস্মিত হচ্ছেন কেন?

—তুমি সাতবার পৃথিবী কখন ভ্রমণ করলে পুত্র!

—কেন মাতঃ যাঁরা আপনাদের প্রদক্ষিণ করে তাঁরা কি পৃথিবী পরিভ্রমণ করে না! ধর্মপ্রবর্ত্তক বেদে ঐরূপ কথাই লেখা হয়েছে, তবে কি তা সত্য নয়, সেখানে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি পিতামাতার পূজা করে তাঁদের প্রদক্ষিণ করে, তাঁদের পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল হয়। এতে কোন সংশয় নেই। যে ব্যক্তি গৃহে পিতামাতাকে ত্যাগ করে তীর্থে গমন করে, তাঁর পিতৃমাতৃ হত্যাজনিত পাপ হয়। পিতামাতার পাদপদ্মই পুত্রের প্রধান তীর্থ; পুত্রের কাছে পিতা মাতা এবং স্ত্রীর কাছে স্বামীই সকল তীর্থ স্বরূপ'—বেদের এই কথা কি সত্য নয়। আপনাদের প্রদক্ষিণ করা যদি পৃথিবী প্রদক্ষিণ না হয় তবে বেদবাক্যকে মিথ্যা বলতে হয়। এক্ষেত্রে বেদোক্ত আপনাদের স্বরূপ ও মিথ্যা বলে বিবেচিত হবে। হয় আমার যাতে শীঘ্র শুভবিবাহ হয়, তার আয়োজন করুন, অথবা বেদকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করুন।

গণেশবাক্য শুনে হর-পার্বতী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তারপর তাঁরা গণেশকে বললেন, 'হে সুবুদ্ধিমান গণেশ। তুমি মহাত্মা, তোমার বুদ্ধি নির্মল। এতক্ষণ তুমি যা বললেন তার সবই সত্য। দুঃখ উপস্থিত হলে অথবা বিপদে পড়লে যাঁর বুদ্ধি অধিকতর বিকশিত হয় তার দুঃখ সূর্য্য প্রকাশে অন্ধকারের মতো বিনষ্ট হয়। বেদ ও পুরাণশাস্ত্রে যা কথিত আছে, তাই তুমি করেছ। পিতামাতাকে প্রদক্ষিণ করলে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হয়, একথা বেদাদি নানাশাস্ত্রে নির্ণিত আছে। একথা সত্য, সুতরাং আমরা তোমার বিবাহের প্রস্তুতি করতে লাগালে। গণেশের বিবাহের কথা চিন্তা করা মাত্র বিশ্বরূপের 'সিদ্ধি' ও 'ঋদ্ধি' নামে সর্বাঙ্গসুন্দরী সুলক্ষণা। দুই কন্যা উপস্থিত হলেন। হর-পার্বতী এই দুই কন্যার সঙ্গে গণেশের বিবাহ দিলেন। গজানন বরবেশে উপস্থিত হলেন, হর-পার্বতীর ইচ্ছামতো বিশ্বকর্মা বিবাহের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী, সভাগৃহ, অলঙ্কার প্রভৃতি তৈরি করেছিলেন। এই বিবাহ অনুষ্ঠানে দেবগণ ও ঋষিগণ যেমন পরমানন্দ লাভ করেছিলেন, তেমন গণেশও

BanglaBook.org

পত্নীদ্বয় লাভে অচিন্তনীয় সুখ লাভ করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে গণেশের পত্নী সিদ্ধির গর্ভে লক্ষ্য নামে ও ঋদ্ধির গর্ভে পরমসুন্দর 'লাভ' নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করল। গণেশ পুত্র নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

এদিকে কার্ত্তিক পৃথিবী পরিভ্রমণ করে এসে দেখলেন গণেশ মনের আনন্দে স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘর সংসার পেতেছে। এসময়ে অঘটন ঘটন পটীয়সী নারদ উপস্থিত হলেন কার্ত্তিকের সম্মুখে কার্ত্তিককে কিছু ভাবনা চিন্তা করতে না দিয়েই বলতে লাগলেন, 'হে কুমার তোমার পিতামাতা তোমাকে ছল করে পৃথিবী প্রদক্ষিণের জন্য প্রেরণ করে গণেশের বিবাহ দিয়েছেন। গণেশ এখন দুই স্ত্রী ও দুই পুত্র সঙ্গে সুখে দিনযাপন করছে। তুমি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে গণেশেরই ভাল করেছ। পিতামাতা যদি এইরকম অন্যায় করেন তবে আর কি বলা যাবে! শাস্ত্রে আছে যদি মাতা বিষ দান করেন, পিতা সন্তানকে বিক্রয় করে দেন, এবং রাজা সর্বস্ব অপহরণ করেন—তবে সেই মাতা পিতা ও রাজার মুখদর্শন না করাই শ্রেয়। এই কথা আমি তোমাকে বললাম, এবার তোমার যা খুশি হয় কর।' নারদের কথা শুনে প্রচণ্ড রেগে গেলেন কুমার কার্ত্তিকেয়। পিতা মাতাকে ক্রোধভরে প্রণাম করে চললেন ক্রৌঞ্চ পর্বতের দিকে। হর-পার্বতী কুমারকে বললেন, হে পুত্র তুমি কোথায় যাচ্ছ? তোমার বিবাহের জন্য আমরা বাগ্‌দান করেছি। এখন তুমি কোথায় চললে? কার্ত্তিক বললেন, আপনারা পিতামাতা হয়ে আমার সঙ্গে কাপট্য করেছেন। আমার এখানে থাকার কোন প্রশ্নই নেই।' এই বলে কার্ত্তিক ক্রৌঞ্চ পর্বতে তপস্যা করতে থাকলেন। পুরাণ অনুযায়ী দেবসেনাপতি কার্ত্তিক আজও অবিবাহিত হয়ে ঐ পর্বতে অধিষ্ঠান করছেন। তিনি ক্রৌঞ্চ পর্বতে অবিবাহিত রূপে অধিষ্ঠিত রয়েছেন বলে তিনি কুমার নামে খ্যাত। এই স্থানে তাঁকে প্রণাম করা শুভপ্রদ। শিবপুরাণ অনুযায়ী কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন ক্রৌঞ্চ পর্বতে গিয়ে কুমার কার্ত্তিকের পূজা করে তাঁর সব রকমের পাপ দগ্ধ হয় ও সে সর্বাভীষ্ট লাভ করে।

এদিকে ক্রৌঞ্চ পর্বতে কুমার কার্ত্তিকেয় তপস্যায় মগ্ন হলে হর-পার্বতীর মনে খুব দুঃখ হল। পুত্রের দুঃখে কাতরা দেবীকে সন্তুষ্ট করতে দেবাদিদেব মহাদেব সেই ক্রৌঞ্চ পর্বতে জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে বর্তমান আছেন। দেবাদিদেব মহাদেব জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে বিরাজিত থাকায়, দেবী পার্বতীও সেই স্থানে স্থায়ীভাবে বিরাজিত। কার্ত্তিক ক্রৌঞ্চ পর্বতে পিতামাতার উপস্থিতি টের পেয়ে তাঁর নিজতপস্যা স্থল থেকে তিন মাইল দূরে সরে এলেন। মহাদেব প্রতি অমবাস্যায় তাঁর সঙ্গে আজও দেখা করতে যান, আর পার্বতী পুত্রকে দেখতে যান প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে। দেবাদিদেব মহাদেবের এই জ্যোতির্লিঙ্গ তীর্থ 'মল্লিকার্জ্জুন' তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ।

BanglaBook.org

শিবকথা

শিবপুরাণ অনুযায়ী জ্যোতির্লিঙ্গের মাহাত্ম্য অপরিসীম। এখানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এই লিঙ্গের মহাত্ম্য শ্রবণ করলে মনের ক্ষণকাল মধ্যে পাপমুক্ত হয়। এই দ্বাদশ লিঙ্গ কি কি? শিবপুরাণ অনুযায়ী সৌরাষ্ট্র দেশে সোমনাথ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন নামক লিঙ্গ অধিষ্ঠিত। উজ্জয়নীতে মহাকাল ও ওঙ্কাররূপী লিঙ্গ আছেন। হিমালয় পার্শ্বে কেদারলিঙ্গ, ডাকিনীপুরে ভীমশঙ্কর লিঙ্গ অধিষ্ঠিত। বারাণসী পুরীতে বিশ্বনাথ নামক লিঙ্গ, গোদাবরীতীরে এ্যম্বক লিঙ্গ, চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথলিঙ্গ, দারুকাবনে নাগেশলিঙ্গ, সেতুবন্ধে রামেশ্বরলিঙ্গ, শিবালয়ে ঘুশ্মেশ নামক লিঙ্গ। —শিবের এই দ্বাদশ লিঙ্গের নাম সকালে উঠে যে পাঠ করে, সে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং তাঁর সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। কেউ যদি বিশেষ কিছু কামনা করে এই দ্বাদশ লিঙ্গের নাম উচ্চারণ করে তবে তাঁর সেই বিশেষ উদ্দেশ্য সফল হয়। কেবল তাই নয় যে সকালে উঠে দ্বাদশ লিঙ্গের অর্চনা করে তাঁকে দর্শনেও মঙ্গল। আর যে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করেছে তাকে আর জননী গর্ভে বাস করতে হয় না। জ্যোতির্লিঙ্গ সকলেই পূজা করতে পারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারবর্ণই পূজা করতে সক্ষম। দ্বাদশলিঙ্গের পূজায় অতি সাবধানে নৈবেদ্যপ্রদান করতে হয়। যে জ্যোতির্লিঙ্গের পূজায় নৈবেদ্য প্রদান করে সেই নৈবদ্য গ্রহণ করে তার তৎক্ষণাৎ তাঁর সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। হীনবর্ণের মানুষ যখন শিবপূজা করে তখন তাঁর হীন জন্মদূর হয়ে উচ্চবর্ণে জন্মলাভ হয়।

শিবপুরাণে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উপলিঙ্গের কথা বলা হয়েছে। এই উপলিঙ্গ গুলি কি কি? —সাগরে সঙ্গমস্থলে সোমেশ্বর লিঙ্গের উপলিঙ্গ অন্ধকেশ। পর্ব্বততটে ভৃগু কচ্ছ প্রদেশে মল্লিকার্জ্জুন লিঙ্গ থেকে রুদ্রক নামক উপলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছেন। মহাকালের উপলিঙ্গ দুগ্ধেশ নামে প্রসিদ্ধ। ওঁঙ্কারলিঙ্গ সম্ভূত কর্দ্দমেশ নামক উপলিঙ্গ, যমুনাতটে কেদারেশ্বর লিঙ্গ থেকে উদ্ভূত সংজ্ঞক উপলিঙ্গ উদ্ভুত। ভীমাশঙ্কর লিঙ্গের উপলিঙ্গ ভীমেশ্বর নামে খ্যাত। বিশ্বেশ্বর থেকে উপলিঙ্গের উৎপত্তি হয়েছে, তিনি শরণেশ্বের নামে খ্যাত। ত্র্যম্বকের উপলিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর সম্ভূত উপলিঙ্গ। তাঁর দর্শনে পাপ নষ্ট হয়। ঘুশ্মেশ মহাদেব

BanglaBook.org

থেকে জাত উপলিঙ্গ ব্যাঘ্রেশ্বর নামে কথিত। —এগুলি হল জ্যোতির্লিঙ্গের উপলিঙ্গ রূপে পূজিত ও প্রতিষ্ঠিত।

এই উপলিঙ্গগুলি ছাড়া আরও বিখ্যাত লিঙ্গের উল্লেখ বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। এই লিঙ্গ স্থানও জাগ্রত ও ফলপ্রদ। শিবপুরাণে বিশেষ লিঙ্গ গুলির মধ্যে গঙ্গাতীরস্থ মুক্তিদাতা শিবের নাম কৃত্তিবাসেশ্বর। এই রকম বারাণসীধামে উল্লেখযোগ্য হলেন তিলভাণ্ডেশ্বর। এই লিঙ্গ দশাশ্বমেধধামে অধিষ্ঠিত। এছাড়া গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে সঙ্গমেশ্বর নামক লিঙ্গ অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যমুনা তীরস্থ লিঙ্গ গোধূমেশ্বর নামে খ্যাত। বৃন্দাবনে নীলেশ্বর নামক মহাদেব অধিষ্ঠিত। কৌশিকী নদীর কাছে ভূতেশ্বর ও নাটীশ্বর নামক মহাদেব আছেন। গণ্ডকি নদীতটে বটুকেশ্বর নামক লিঙ্গ বর্তমান। পুষ্কর তীর্থে পুরেশ্বর দেব প্রসিদ্ধ। ফল্গু নদীর তীরে মণ্ডকেশ সদাশিব বিখ্যাত। ইনি সর্ব সিদ্ধি প্রদান করেন বলে সিদ্ধনাথেশ্বর নামে খ্যাত। উত্তরপাত্তনে দূরেশ্বর লিঙ্গ, তারও উত্তরে মৃগেশ্বর ও জননাথ লিঙ্গ অবস্থিত। নর্মদা নদীর তীরে বহুলিঙ্গ রয়েছে,। নর্মদা নদী রুদ্রস্বরূপা হয়ে মানবের পাপ হরণ করছেন। নর্মদা নদীর মধ্যে যে সব পাথর রয়েছে তার প্রতিটিই শঙ্কর রূপে পূজিতা। তবু এই পুণ্যপবিত্র শিবস্থানে যেসব লিঙ্গ প্রসিদ্ধ সেইসব লিঙ্গগুলির মধ্যে পাপহারক আবত্তেশ্বর লিঙ্গ, পদ্মেশ্বর লিঙ্গ ও সিংশ্বের লিঙ্গ, সুমেরুশ্বর মহাদেব, কুমারেশ্বর মহাদেব, পুণ্ডরীক লিঙ্গ, মণ্ডপোশ্বর নামক লিঙ্গ বিরাজমান। সেই নর্মদাতীরে, তীক্ষেশ নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁকে দর্শন করলেই পাপ নষ্ট হয়। নর্মদাতীরে পূলেশ্বর ও কুন্তেশ্বর লিঙ্গ প্রসিদ্ধ। নর্মদাতীরের মঙ্গলেশ্বর ও নীলকণ্ঠ লিঙ্গ সকল মঙ্গলের কারণ স্বরূপ। এই নদীতীরে কোটি হত্যা নিবারক নন্দিকদেব বিরাজিত রয়েছেন। নন্দিকেশ্বরকে যে আনন্দিত মনে পূজা করে, তার সমস্ত রকম কার্য সিদ্ধ হয় এই তীর্থে যে স্থান করে, তাঁর পাপ নাশ হয়।

নর্মদার তীরবর্তী অঞ্চলে শিবলিঙ্গের অবিস্থিত আমরা স্কন্দপুরাণের মধ্যে বিস্তৃতভাবে দেখতে পাই। সুতরাং নর্মদা তীরস্থ শিব-মহাত্ম্য বর্ণনায় আমরা স্কন্দপুরাণকেই অনুসরণ করব। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ এবং প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, সেই মঙ্গলময় শিব, জগন্মাতা পার্বতী, গণেশ, কার্ত্তিকেয় ও প্রমথগণকে নমস্কার।

পুরাকালে মহাতেজা মুনিগণ হিমালয়শৃঙ্গে তপস্যা করতে করতে হঠাৎ বারাণসী যাওয়ার সঙ্কল্প করলেন। তাঁরা হিমগিরি থেকে নির্গত হয়ে একেবারে কাশীধামে উপস্থিত হয়ে স্নান করব' এই সঙ্কল্প করে মণি-কর্ণিকায় উপস্থিত হলেন। বারাণসীর মণিকর্ণিকার ঘাট অতি প্রসিদ্ধ। বেদপারগ সেই মুনীন্দ্রগণ

BanglaBook.org

সেখানে স্নান করে দেবতাদের অর্পণ শেষ করে, গঙ্গাজল নিয়ে দেবদেব বিশ্বেশ্বরকে পরম ভক্তি ভরে পূজা করলেন। পুরাণে বর্ণিত আছে ঋষিরা এই সময় দেবাদিদেবর রুদ্রাধ্যায় স্তোত্রের মাধ্যমে স্তব বন্দনা করেছিলেন। এই সময় মহর্ষি সূত ও কাশী দর্শনের ইচ্ছায় বারাণসীতে উপস্থিত হলেন, ঋষিরা সূতকে দর্শন করে খুবই অনন্দিত হলেন। সুতোও সাক্ষাৎ ভাবানীপতি দেবদেব বিশ্বনাথকে নমস্কার করে তাঁদের সঙ্গে মুক্তি মণ্ডপে প্রবেশ করলেন। সূত ও ঋষিগণ পরস্পর পরস্পরকে কুশল জিজ্ঞাসা করে একত্রে উপবেশন করলে মুনীরা সূতকে বললেন, 'হে পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ ব্যাসশিষ্য, মহাত্মন্ সূত! বিশ্বপূজিত ভগবান ব্যাসদেব আপনাকেই পুরাণগুলির গুরুরূপে অভিষিক্ত করেছেন। অতএব পৌরাণিক বিদ্যা আপনার হৃদয়ে বিরাজিত আছে। আজ আমরা দেবদেব মহাদেবকে রুদ্রধ্যায় স্তোত্র বন্দনা করলাম, আপনি আমাদের শিবের রুদ্ররূপ সম্বন্ধে কিছু বলুন।' সূত তখন তাঁদের বললেন, পুরাকালে, স্বারোচিষ মন্বন্তরে ঋষিগণ কঠোর ব্রত অবলম্বন করে নৈমিষারণ্যে তপস্যা করতেন। একসময়ে তাঁরা বহুকাল সাধ্য যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়ে যজ্ঞেশ্বর ভগবান রুদ্রদেবের প্রীতি সাধন ইচ্ছায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন এবং জগতগুরু ব্যাসদেবের কাছে শিবত্ব শোনবার আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করছিলেন। এই ঋষিদের মধ্যে পরাশর ঋিষির তপঃপ্রভাব অধিক ছিল। তাঁর তপস্যার তীব্রতায় ব্যাসদেব বা বাদারায়ণ অবিভূত হলেন। ব্যাসদেবকে দেখে ঋষিগণ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, ব্যাসদেব যজ্ঞস্থলে বসে ঋষিদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে যজ্ঞহোতাগণ, আপনারা কুশল তো? আপনারা ভগবান যজ্ঞস্বামীর যথাবিধি পূজা করেছেন তো? অমিত তেজা মহর্ষি ব্যাস এই কথা বললে, নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ মহাত্মা ব্যাসদেবকে প্রণাম করে বললেন, হে সাক্ষাৎ নারায়ণ অংশ সম্ভূত ভগবান্। আপনিই ভবানীপতি প্রমথ নাথ, ত্রিভুবন-নায়ক, স্রষ্টা মহাদেবের কৃপার পাত্র। আমাদের মনরূপ ভ্রমর আপনার চরণপদ্ম লাভে উন্মুক্ত। আপনি আমাদের সকল সংশয়ের ছেদন করুন। হে কৃপানিধে, আমরা অনন্ত গম্ভীর অজ্ঞান সমুদ্রে নিমগ্ন, আমাদের সেই অজ্ঞান সমুদ্র থেকে 'শিবতত্ত্বজ্ঞানরূপ' ভেলায় উত্তীর্ণ করুন। আজ আমরা নৈমিষারণ্যের পুণ্য ভূমিতে বসে শিবশম্ভুর আরেকরূপ 'প্রণব' মন্ত্র সম্বন্ধে জানতে চাই।' মুনিদের জিজ্ঞেসার উত্তরে ব্যাসদেব 'ওঙ্কার' বা 'প্রণব' মন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করতে লাগলেন।

'শিব পুরাণের কৈলাস সংহিতায়' ব্যাসদেব নৈমিষারণ্যবাসী মুনিদের যে তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন সেই তত্ত্বভিত্তিক কাহিনিটি হল এইরকম।— জগন্মাতা সতী দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা সহ্য করতে না পেরে তপোবলে দেহ পরিত্যাগ করলেন। এর

BanglaBook.org

পরের জন্মে তিনি হিমালয় কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই পর্বতরাজ হিমালয়ে মহাদেব স্বয়ংবর-বিধি মতে দেবীর পাণিগ্রহণ করলে দেবী তাঁকে বললেন, 'হে সর্বজ্ঞ! ভক্তিসুলভ! অবিনাশদেহ। সৃষ্টিস্থিতি প্রভৃতি পঞ্চকার্য্যের বিধায়ক! ভগবান্! পরমেশ্বর আপনি কি আমায় চিনতে পেরেছেন, আমি সেই দাক্ষায়নী, দেহ পরিত্যাগ করে হিমবান্ পর্বতের পুত্রী হয়েছি। হে মহেশ্বর! আজ আমাকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করুন এবং সেই মন্ত্রের প্রভাবে আমি আত্মতত্ত্বস্থ হতে পারি'। দেবী এই প্রার্থনা করলে চন্দ্রশেখর বললেন, দেবী, তোমার যদি এই ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে কৈলাসশিখরে গিয়ে তোমায় মন্ত্রপ্রদান করব। সেখানেই তুমি আত্মতত্ত্বস্থ হতে সক্ষম হবে।' —এই বলে মহাদেব হিমালয় পর্বত থেকে কৈলাসে গমন করে দেবীকে প্রণবাদি মন্ত্রে দীক্ষিত করে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বস্থ করলেন, পরে দেবীসহ নন্দনকাননে সমুপস্থিত হলেন।

নন্দনকাননে উপস্থিত হয়ে শিব সুমালিনী প্রভৃতি দেবীর প্রিয় সখীদের ডেকে কল্পতরু পুষ্পে দেবীকে ভূষিত করলেন এবং আভরণে ভূষিত দেবীকে নিজের ক্রোড়ে বসিয়ে দেবীর প্রফুল্ল মুখ অবলোকন করতে লাগলেন। দেবী তখন স্বামীকে এবং তাঁর গুরুরূপে মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে দেব! আপনি প্রণব প্রমুখ মন্ত্র আমাকে প্রদান করেছেন। তার মধ্যে আমি প্রথমে প্রণবের নিশ্চিত অর্থ শুনতে ইচ্ছা করি। প্রণবের উৎপত্তি কিভাবে হল? তাহাকে প্রণবই বা বলে কেন? মন্ত্র কত প্রকার। কেনই বা প্রণবকে বেদের আদি বলা হয়ে থাকে। দেবতা কতপ্রকার! সেই দেবতাদের চিন্তন কিভাবে করা হয়? ক্রিয়া কত প্রকার? মন্ত্রবর্ণ কাকে বলে? এই প্রণব মন্ত্রে যথাক্রমে পঞ্চব্রহ্ম অবস্থান করছেন—কিভাবে প্রণবে পঞ্চব্রহ্মের অবস্থান? হে মঙ্গলময়! এই প্রণব উপাসনার অধিকারী কে? হে ঈশান! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে এই মহান তত্ত্বগুলির রহস্য আমার সম্মুখে উন্মোচিত করুণ।'

মহেশ্বরীর অধ্যাত্ম প্রশ্ন শুনে দেবাদিদেব বললেন, 'হে দেবী! তুমি আমায় আজ যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তর শোনামাত্রই তুমি শিবত্ব প্রাপ্ত হবে। প্রণবের অর্থ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হলেই আমার স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যাবে। প্রণব নামক মন্ত্র সকল বিদ্যার বীজ। প্রণব বটবীজের মতো অতি সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু এর মহান অর্থ আছে! 'ওঁ' এই একাক্ষর মন্ত্রে ত্রিগুণাতীত, সর্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বস্রষ্টা, প্রভু দ্যুতিমান শিব বর্তমান আছেন। প্রণব শব্দের মাধ্যমে সেই বিরাট পুরুষকে বোঝায়, আবার স্থাবর-জঙ্গমকেও বোঝায়। অতএব 'ওঁ' এই অক্ষরই সর্বার্থ-সাধক এক ব্রহ্ম। এই 'ওঁ'-কারের মধ্যেই সব্বার্থ সাধকত্ব থাকায় আমি সেই প্রণব থেকেই প্রথম জগৎ সৃষ্টি করি। তাই মহাজনেরা আমাকে প্রণব

BanglaBook.org

বা প্রণবমন্ত্রকে 'স্বয়ং শিব' বলে থাকেন। হে পরমেশ্বরী, যে ব্যক্তি অধ্যাত্ম তত্ত্ব লাভ করতে চায়। সেই মুমুক্ষ ব্যক্তির প্রধান অবলম্বন হবে প্রণবমন্ত্র। প্রথমে 'অ-কার' পরে 'উ-কার' এবং তারপরে 'মকার' নিয়ে প্রণব উচ্চারিত হয়। অ, উ ও মকারের সঙ্গে চন্দ্রবিন্দু ও নাদধ্বনি সংযুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ পঞ্চবর্ণের সমাহারে 'ওঁ' কারের সৃষ্টি। এই প্রণবই ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত সকল জীবের প্রাণ। জীবের প্রাণস্বরূপ বলেই এই একাক্ষর মন্ত্রকে 'প্রণব' মন্ত্র বলা হয়।

প্রণব মন্ত্রের 'অ-কার' সৃষ্টি সাধন বীজ স্বরূপ। এছাড়াও রজোগুণ, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাস্বরূপ। আবার, উ-কার প্রকৃতি, সৃষ্টির আধার সত্ত্বগুণ। পালনকর্ত্তা বিষ্ণুস্বরূপ। ম-কার পুরুষের সৃষ্টিসাধন বীজ সম্পন্ন, তমোগুণ, সংহার কর্ত্তা রুদ্র স্বরূপ। চন্দ্রবিন্দু সাক্ষাৎ মহেশ্বর, এবং নাদ সদাশিবের স্বরূপ। এই সদাশিবই সকলের অনুগ্রহ কর্ত্তা বলে অভিহিত হয়। এই অকারদি পঞ্চবর্ণে সদ্য বামদেব, অঘোর, পুরুষ ও ঈশান এই পঞ্চব্রহ্মের অবস্থিত। এই পঞ্চব্রহ্ম আমারই ভিন্ন মূর্তি। হে শিবে! আমি তোমাকে আরও বিস্তৃতভাবে প্রণব মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করছি। প্রণবের পঞ্চবর্ণের মধ্যে আকারে অষ্টকলা, উকারে বামরূপিনী ত্রয়োদশ কলা, ম-কারে অঘোররূপিনী অষ্ট কলা, বিন্দুতে পুরুষ গোচর চারকলা ও নাদে ঈশান জাত তোমায়, মন্ত্র, যন্ত্র, দেবতা, প্রপঞ্চ, গুরু ও শিষ্যা—এই ছয় পদার্থের নিগুঢ় তত্ত্ব প্রদান করব। মন্ত্রবল পঞ্চবর্ণের সমবায়। যা আগেই উচ্চারিত হয়েছে। এই মন্ত্রই যন্ত্র মূর্তি ধারণ করেছে। যন্ত্র দেবতার রূপ। দেবতা হলেন বিশ্বমূর্ত্তি। গুরু হলেন বিশ্বরূপ। আর শিষ্য গুরু দেহস্বরূপ বলে কথিত। সুতরাং যিনি গুরু, তিনিই শিব, যিনি শিব, তিনিই গুরু বলে জানবে। মনে মনে গুরুকে শিবস্বরূপ জেনে গুরুর কাছে আপন মত ব্যক্ত করবে। পরে তাঁরই অনুমতিক্রমে দ্বাদশ দিন কেবলমাত্র দুধ পান করে সমুদ্র বা নদী তীরে, পর্বতে বা শিবমন্দিরে অবস্থান করবে। শুক্লপক্ষের পঞ্চমী অথবা একাদশী তিথিতে প্রাতঃ স্নান ও নিত্যকর্ম সমাধন করে গুরু পূজা করবে। গুরুকে আহ্বান করে 'নন্দীশ্রাদ্ধ' করবে। এরপরে চুল, দড়ি, নখ ইত্যাদি ভাল করে কেটে আবার স্নান করে ছাতু খেয়ে গুরুর আরতি ও পূজা দিয়ে ব্রত সম্পূর্ণ করবে। এই ভাবেই গুরুরূপী শিবের পূজা সুসম্পন্ন হবে। শিবপূজার মহাস্থান বারাণসীকে 'অবিমুক্তকাশী' বলা হয়। শিবস্থানকে 'অবিমুক্ত' নামে চিহ্নিত করা হয় কেন? শিবপুরাণে দেবী পার্বতীকে দেবাদিদেব বলেছেন, "যে মহাক্ষেত্রকে আমি কখন মোচন বা ত্যাগ করিনি, বা ত্যাগ করব না, সেই ক্ষেত্রকে 'অবিমুক্ত' নামে চিহ্নিত করা হয়। নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, পুষ্করের মতো পবিত্র তীর্থগুলিতে মৃত্যু হলে মানুষ মুক্তিলাভ করে না, কিন্তু এই অবিমুক্ত স্থানে মৃত্যু হলে জীব মুক্তিলাভ করে। এইজন্য তীর্থরাজ

BanglaBook.org

প্রয়াগের থেকে ও এই ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ। মহাতপা জৈগীষব্য পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন, এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে। এই ক্ষেত্রে বসে আমার চিন্তা ও আমার ভক্তি করে মহাশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্য যোগিগম্য জ্ঞানলিপ্সু হয়েছেন এবং সেই অবিমুক্ত স্থানে ধ্যানে লিপ্ত রয়েছেন।"

শিব পার্বতীকে অবিমুক্ত তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন করে জানিয়েছিলেন যে অব্যক্তলিঙ্গ দেবদুর্লভ পরমকৈবল্য প্রাপ্তি এই স্থানে হয়। সর্বসিদ্ধান্তবেত্তা মুনিগণ অন্যস্থানের দুর্লভ মুক্তি এই স্থানে লাভ করেন। মহাযক্ষ কুবের এই অবিমুক্ত কাশীতে তপস্যা করে গণেশত্ব লাভ করেছেন। এছাড়া সংবর্ত্ত ঋষি ও ভাবিতার্থঋষি ভক্তিসহকারে এই কাশীধামেই শিবের আরাধনা সিদ্ধি লাভ করেছেন।

বারাণসী তীর্থের কথা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু শিবপুরাণে বর্ণিত বারাণসী উত্তরভাগে পঞ্চায়তন নামে যে তীর্থ আছে সেই তীর্থও শিবের অধীনস্থ। পঞ্চায়তনে মহাদেব ওঙ্কারনাথ রূপে বিরাজিত। পুরাকালে এই পঞ্চায়তন তীর্থে এক মণ্ডুকী অর্থাৎ মেয়ে ব্যাঙ বাস করত। ব্যাঙটি ওঙ্কার দেবের কাছে থেকে তাঁর নির্মাল্য খাওয়ার ফলে অনেক পুণ্য অর্জন করল। মৃত্যুর পরে সেই পুণ্যের ফলে সুমনা নামে এক রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করল।

রাজকন্যারূপে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলে সুমনা রাজ কন্যাকে বিবাহ দানে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু রাজকন্যা বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। তিনি শিবআরাধনার জন্য বারাণসীতে উপস্থিত হলেন। রাজকন্যারূপেও পঞ্চায়তনবাসী ওঙ্কারনাথকে দর্শন করে কলেবর পরিত্যাগ করলেন এবং শিবলোক প্রাপ্ত হলেন। আর তাকে জন্মগ্রহণ করতে হল না।

এই পঞ্চায়তন তীর্থে প্রতাপমুকুট নামে পরম ধার্মিক এক রাজা ছিলেন। প্রতাপমুকুটের পুত্রও ছিলেন ধর্মাত্মা এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্না। কিছুকাল পরে রাজা পুত্রকে বললেন, পুত্র! তোমার এবার বিবাহের সময় হয়েছে। তুমি সংসারী হলে আমি বৈরাগ্য অবলম্বন করে পরম সুখে থাকব।' রাজপুত্র পিতার কথা শুনে বললেন, পিতা, আমি আপনার এই আজ্ঞা পালন করতে পারব না। বিবাহে আমার রুচি নেই। আমি ঈশ্বরাধনা করেই জীবন কাটিয়ে দিতে চাই।' পুত্রের মুখে বৈরাগ্যের বাণী ভাল লাগল না প্রতাপমুকুটের। তিনি রাজপুত্রকে বললেন, 'হে পুত্র, আমি তোমার পিতা, তোমার উপর আমার এখনও প্রভুত্ব আছে।' আমার বংশকে নরকে পতিত করো না। তুমি বিবাহ করে বংশবৃদ্ধি কর!' পিতার মুখে এই কথা শুনে রাজকুমার সংসারের বিচিত্র গতি সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, আমি সহস্র সহস্র বার জন্মগ্রহণ করেছি, সহস্র সহস্র বার

BanglaBook.org

জরাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছি। বহুশত বার আমার স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে সংযোগ হয়েছে। তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ করেছি, তাঁদের বিচ্ছেদে দুঃখিত হয়েছি। আমি তৃণ, গুল্ম, লতা, সরীসৃপ, পক্ষী ও পশু যোনি এবং স্ত্রী পুরুষ জন্ম প্রাপ্ত হয়েছি। গণ, কিন্নর, গান্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস গুহ্যকে, দানব ও অপ্সরা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। হে পিতা, আমি পুনঃ পুন সৃষ্ট হয়েছি, আবার সংহারকালে সংহত হয়েছি। তাই আমি মনে করি বিবাহকরা বিড়ম্বনামাত্র। কেবল রাজত্ব অভিমান ত্যাগ করলেই সিদ্ধি লাভ হয় না। প্রতিটি জীবের সিদ্ধিলাভের প্রথম শর্ত শরীরাভিমান ত্যাগ। দ্রব্যে যাঁর মমতা আছে, ইন্দ্রিয়কে অনুশরণ করা যার স্বভাব সে ব্যক্তি কখনই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মলাভ করে সেই কেবল মৃত্যুরূপ মহৎভয় থেকে পরিত্রাণ পায়। কেউ কেউ সকাম কর্মের মাধ্যমে তপস্যা করে থাকে, কেউ বা মুক্তির জন্যে তপস্যা করে থাকে। তীর্থযাত্রা ও বেদ অধ্যয়নের কিছু অভ্যাস আমার আছে, সুতরাং আমি সেই বারাণসী ক্ষেত্রে ওঙ্কার দেবের আরাধনার জন্য পঞ্চায়তন তীর্থে গমন করব। হে পিতা, আমার এক পূর্বজন্মের কাহিনি আপনাকে শোনাই। এই বলে রাজপুত্র প্রতাপমুকুট রাজাকে তাঁর পূর্বজন্মের কাহিনি বর্ণনা করতে লাগলেন। রাজপুত্র বললেন, 'হে রাজন্, কোন এক জন্মে আমি পবিত্র বৈশ্যবংশে উৎপন্ন হয়েছিলাম। সেই জন্ম মঙ্গলনিদান ত্রিপুরারি মহাদেবের প্রতি আমার অচলা ভক্তি ছিল, আমি ব্রত—নিয়মাদি ও স্তবপাঠের মাধ্যমে শূলধারীকে সন্তুষ্ট করতাম। সেই বৈশ্য জন্মে আমি অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীর কিছু দূরে পঞ্চায়তন শিব ওঙ্কার দেবকে দর্শন করি। এই তীর্থে শিবব্রত পালন করে সমস্ত বৈশাখ মাস রাত্রি জাগরণ করি। আমার ব্রত ও শিবের প্রতি ভক্তি সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব ও কিন্নরেরা অবলোকন করেন। আমার সেই পূজা ও ব্রতের ফলেই আমি আপনার গৃহে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার মন থেকে সেই পবিত্র ওঙ্কারদেবের মাহাত্ম্য ও ভক্তি লোপ পায়নি, তাই আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি যেন সেই স্থানে, সেই অধিমুক্ত ক্ষেত্রে ঈশ্বর দর্শনে গমন করি। হে পিতা, আমি জানি পঞ্চায়তনবাসী ওঙ্কারদেব নিষ্কল ব্রহ্মস্বরূপ। তাঁকে দর্শন করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।'

পুত্রের কথা শুনে রাজা প্রতাপমুকুটের মনেও পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগ্রত হল। তিনি বললেন, 'হে পুত্র, তোমার মুখে পঞ্চায়তন ওঙ্কারদেবের কথা শুনে পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগ্রত হল। আমি পূর্বজন্মে কপোত হয়ে সেই তীর্থে বাস করে ওঁঙ্কারদেবকে প্রদক্ষিণ করতাম। আমার মনে তখন ওঙ্কার দেবের নানা স্তবমন্ত্র ধ্বনিত হত। এই পূণ্যে আমি রাজত্ব লাভ করেছি। হে পুণ্যাত্মা, তুমি সে স্থানে

BanglaBook.org

গমন করবে, আমি সেই স্থানে গমন করব। জাতিস্মরতা আমার মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। সংসারে থেকে পুরুষের যখনই বৈরাগ্য আসবে তখনই বংশমূলক, জাতিমূলক বৃত্তি ত্যাগ করে, সব রকমের প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে মায়া, মমতা ও অহঙ্কার শূন্য হয়ে আত্মমুক্তির চেষ্টা করবে। আত্মশুদ্ধির চেষ্টায় সকল কর্ম ত্যাগ করে অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যাবে। এই স্থানে অব্যক্তলিঙ্গী নামে একপ্রকার সন্ন্যাসী উপাসনা করে পরমপদ ওঙ্কারদেবে লীন হয়ে থাকেন। চল্ পুত্র, আমরাও ওঁঙ্কারদেবের পূজায় নিজেকে নিয়োজিত করি।'—এই বলে রাজা কনিষ্ঠপুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করলেন এবং জেষ্ঠ্য পুত্রকে নিয়ে ওঁঙ্কারদেবে গমন করলেন। উভয়েই পূর্বজন্মের সংস্কারবশতঃ শিবপদ প্রাপ্ত হলেন।

যে স্তব রাজা ও রাজপুত্র ওঁকারেশ্বর দেবকে পূজা করেছিলেন, সেই স্তবের অর্থ ছিল এই রকম, হে পঞ্চবক্ত্র, বৃষাকর, সকলের আশ্রয় সর্বদা মঙ্গলদাতা, বিরূপলোচন, শূল ও জটাধারী, অবিমুক্ত ক্ষেত্রস্থিত ওঁঙ্কারেশ্বর মহাদেবকে নমস্কার।

হে ওঁঙ্কারেশ্বর, তুমি সকলের কারণ, ভাব ও অভাবের স্বরূপ। সৃষ্টি ও প্রলয় এঁর স্বভাব তোমাকে চিন্তা করা দুষ্কর। তুমি মুক্তিস্বরূপ। তোমার ভয় বা পাপ নেই। তুমি নিরপেক্ষ ও অনাশ্রয়, তোমার স্তুতি নেই, নমস্কার নেই, সঙ্গ নেই, উপদ্রব নেই, মালিন্য নেই, উপমা নেই। তুমি মঙ্গল ও অপবর্গস্বরূপ। তোমা অপেক্ষা আর নিত্যবস্তু নেই। তুমি সকলের কারণ, তুমি সর্বত্র পরিব্যপ্ত করে আছ, কিন্তু কোন স্থানে আসক্ত নও। যিনি তোমার পবিত্র ও জ্ঞাননির্মল স্বভাবকে চিন্তা করেন, তিনি ধন্য। তুমি সকল বস্তুর স্বরূপ অথবা সকলের আত্মস্বরূপ, সূক্ষ্ম, অনাদি, মঙ্গলময় এবং ওঁঙ্কারস্বরূপ। তোমার শব্দ নেই, স্পন্দন নেই, শরীর নেই, তুমি সুন্দর, তুমি নিশ্চলভাবে একরূপেই অবস্থান করছ। তুমি তোমার অনন্ত চক্ষুর মাধ্যমে দর্শন কর। অচ্যুত ও পরম মহৎ।'—অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে সংযত হয়ে যে ব্যক্তি এই ওঁঙ্কার নির্দিষ্ট শম্ভু স্তব পাঠ করবে, তাঁর সিদ্ধি করতলগত। এই স্তব শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র—সেই পাঠ করুক, সে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়। সূর্যসমদ্যুতি এই মহৎপুরুষকে জানলে আর সংসারে আসতে হয় না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

যজ্ঞেশ্বর

দেবাদিদেব মহাদেবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রায় প্রতিটির পিছনেই একটি করে সুন্দর ঘটনা বা কাহিনী রয়েছে। এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম একটি ক্ষেত্র হল যজ্ঞেশ্বর। শিবপুরাণের মধ্যে এই তীর্থ গড়ে উঠবার একটি চমৎকার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতে দেব নামে এক পর্বতের ধারে ভরদ্বাজ বংশীয় ব্রহ্মপরায়ণ সুধর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। সুধর্মার ব্রাহ্মণী ছিলেন, সুদেহা। সুদেহা অত্যন্ত ধর্মশীলা ও পতিপরায়ণা হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণতুল্য জ্ঞানের অধিকারিনী ছিলেন না। ব্রাহ্মণ সুধর্মা সর্বদা দেবপূজা, অতিথি সৎকার, অগ্নিসেবা ও বেদমার্গের অনুসরণ করতেন। এই ব্রাহ্মণ সূর্যের মতো কান্তিশালী ছিলেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে ত্রিসন্ধ্যা বন্দনা করতেন। সৌজন্যগুণের আধার সুধর্মা বেদশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন ও শিষ্যদের বেদ পাঠ করিয়ে আনন্দলাভ করতেন।

এইভাবে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ পত্নীর বহুকাল গত হল। ধর্মানুষ্ঠানে শান্তি এলেও একটি অতৃপ্তি সুদেহার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত। তিনি পুত্রবতী ছিলেন না। সুধর্মার মনে সন্তানহীনতার জন্য কোন দুঃখ ছিল না। তিনি জানতেন নিজেকে পবিত্র করা ও আত্মার উন্নতি লাভই মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। পুত্র মানবের কোনো উন্নতিতে সাহায্য করতে সক্ষম হয় না। আত্মাই আমার উদ্ধারক—এ তত্ত্ব জেনে তিনি নিশ্চিন্ত মনে জীবন কাটাতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী সুদেহা, পুত্রমুখ দর্শন করতে না পাবার জন্য সব সময়ই স্বামীকে বলতেন, 'হে স্বামীন, আপনি পুত্রের জন্য বিশেষ যত্ন করুন।' সুধর্মা স্ত্রীকে উত্তরে বলতেন, দেবী! পুত্র তোমার কি করবে! এ জগতে কে পিতা, কে মাতা, কে বন্ধু? কোন ব্যক্তিই বা তোমার প্রিয়তম। সকলেই স্বার্থের সম্বন্ধে আবদ্ধ জানবে। প্রিয়ে একারণে তুমি দুঃখ ত্যাগ কর। শুভব্রতে জীবন উৎসর্গ করে শান্ত হও। দ্বিতীয়বার সন্তানের জন্য কোনো আক্ষেপ আমি যেন না শুনি।' —ব্রাহ্মণীকে মৃদু ভর্ৎসনা করে সুধর্মা শীত উষ্ণ, দ্বন্দ্ব দুঃখ ত্যাগ করে সন্তুষ্টভাবে জীবনযাপন করতে লাগলেন। সুদেহা ও স্বামীর নির্দেশ মতো কিছুটা শান্ত হলেন।

কিন্তু সুদেহার ভাগ্যে অশান্তি লেখা ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই শান্তির আচ্ছাদন খসে পড়ল তাঁর জীবন থেকে। একদিন সামান্য কারণে সুদেহার সঙ্গে তাঁর প্রতিবেশী

BanglaBook.org

পত্নীর তীব্র কলহ সৃষ্টি হল। সেই নারী বহু কটুবাক্যের পর সুদেহাকে বললেন, তোমার এত গর্ব কিসের? তুমি আমার মতো পুত্রবতী তো নও। আমার সম্পত্তি আমার পুত্র ভোগ করবে, তোমার সম্পত্তি কে ভোগ করবে? যখন রাজা তোমার সব সম্পত্তি হরণ করবে তখন তোমার সব সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে। হে বন্ধ্যা নারী, তুমি কারো কাছেই মুখ দেখাবার যোগ্য নও।' প্রতিবেশির স্ত্রীর কাছে এই কটুবাক্য শুনে দুঃখে ভেঙে পড়লেন সুদেহা। ঘরে ফিরে সুধর্মাকে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে বললেন, 'পুত্রহীনতার জন্যই আমাকে আজ এইভাবে তিরস্কৃত হতে হয়েছে।' জ্ঞানী ব্রাহ্মণ সুধর্মা সমস্ত কথা শুনে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হে প্রিয়ে! যে যা বলছে বলুক, যা ভবিতব্য তার অন্যথা হওয়ার নয়। তুমি দুঃখ করো না।' —এবার সুদেহা স্বামীর কথায় তুষ্ট হলেন না। তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হে নাথ! আপনি আমার স্বামী, যেমন করে হোক পুত্র উৎপাদন করুন। হে নরোত্তম, এ বিষয়ে যদি আপনি যত্নবান না হন-তবে আমি দেহত্যাগ করব।'

স্ত্রীর জেদে সুধর্মা খুশি হলেন না। তবু পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য দুটি পদ্মের কোরক হাতে তুলে নিলেন। একটি পদ্মকে 'পুত্র সন্তান হোক' বলে নির্দিষ্ট করলেন। অপরিটতে 'সন্তানহীনতার' কথা আরোপ করে সুদেহাকে বললেন, 'হে প্রিয়ে, তুমি এই দুটি পুষ্পের একটিকে স্পর্শ করো। তোমার স্পর্শ করা ফুলে যে সংকল্প করা হয়েছে আমাদের ভাগ্যও সেই সংকল্পকে অনুসরণ করবে।' স্বামীর কথা শুনে সুদেহা মনে মনে শিব ও অগ্নিকে প্রণাম করে একটি ফুলকে স্পর্শ করলেন। হায়, সুধর্মা যেটি পুত্রলাভের জন্য স্থির করে রেখেছিলেন সুদেহা তার বিপরীত পুষ্পকে স্পর্শ করলেন। সুধর্মা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে বললেন, 'হে প্রিয়ে তোমার পুত্রলাভ হবে না। এটাই বিধাতার লিখন। এর অন্যথা হবে না জেনে পুত্রলাভের আশা পরিত্যাগ করে ঈশ্বরসেবায় মগ্ন হও।'

ব্রাহ্মণ এই কথা বলে নিজেও হতাশ হয়ে ধর্মচর্চায় মনে দিলেন। সুদেহা কিন্তু পুত্রবতী হওয়ার বাসনা পরিত্যাগ কলেন না। তিনি সুধর্মাকে বললেন, 'হে নাথ। যদি আমাতে পুত্র উৎপাদন সম্ভব না হয়, তবে আপনাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে হবে। যেনতেনভাবে আমার পুত্র চাই।' সুধর্মা বুঝলেন তীব্র ঈর্ষার দহনে ক্লিষ্ট হয়েছে সুদেহার মন। তিনি বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, 'ঠিক আছে, যদি তাতে তোমার ও আমার দুঃখ দূর হয়, তবে তাই হবে। এখন তুমি আমার ধর্মকার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করো না।'

সুধর্মা চুপ করে গেলেও সুদেহা তাঁর সংকল্পে স্থির থাকলেন। কিছুদিন পর নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে এনে স্বামীকে বললেন, 'নাথ, একে আপনি বিবাহ করুণ।' সুধর্মা স্ত্রীকে নিরস্ত্র করার জন্য বোঝালেন, 'আজ তুমি বলছ বটে, কিন্তু এই নারী

BanglaBook.org

যখন পুত্র প্রসব করবেন তখন তোমার মনে অশান্তির সৃষ্টি হবে। এই অশান্তি কলহের জন্ম দেবে। স্বামীর এই কথা বললে সুদেহা প্রতিজ্ঞা করে বললেন, 'হে স্বামী, এই ঘুশ্মা আমারই ভাই-এর কন্যা। ঘুশ্মা আমারই কন্যার মতো। আমি তাঁকে স্নেহ করি। তার সঙ্গে কখনই বিরোধিতা হব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি এঁর দাসীরূপে সংসারে থাকব।'

সুদেহার কথায় ব্রাহ্মণের মন চঞ্চল হল। তিনি বিবাহে রাজী হলেন। সুদেহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ঘুশ্মাকে বিবাহ করে প্রথমা স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে পুণ্য-শীলে! এই ঘুশ্মা তোমার আত্মীয়া; অতএব সর্বদা এঁকে তুমি পালন করবে।' এরপর ব্রাহ্মণ ধর্মসঞ্চয় করতে লাগলেন। সুদেহাও ভ্রাতুষ্পুত্রীর কাছে দাসীর মতো রইলেন। ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় ঘুশ্মা প্রতিদিন একোত্তরশত পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করতে লাগলেন। সকালে উঠে যথাবিধি পূজা সম্পন্ন করে সামনের এক পুকুরে নিক্ষেপ করতেন। এইভাবে প্রতিদিন একশ একাত্তরটি শিবলিঙ্গ নিক্ষেপের ফলে পুকুরের মধ্যে একলক্ষ শিবলিঙ্গ জমা হল। এই তপস্যায় ঘুশ্মা সিদ্ধি লাভ করলেন। তিনি শিবের কৃপায় এক সুন্দর পুত্রের জন্মদান করলেন। সুধর্মা পুত্রমুখ দেখে আনন্দিত হলেন, কিন্তু ঈশ্বরই এঁকে দিয়েছেন—এই ভাবনায় কোন আসক্তির সৃষ্টি না করে আনন্দে ধর্মাচরণ করতে লাগলেন।

এদিকে ঘুশ্মার পুত্রলাভের সঙ্গে সঙ্গে সুদেহার মনের পরিবর্তন দেখা দিল। আগে তাঁর মন কোমল ছিল এবং পুত্রলাভের পর সেই মনই শাণিত অস্ত্রের রূপ ধারণ করল। এরপর থেকে জ্যেষ্ঠা পত্নী কনিষ্ঠার মুখ দর্শন করতে দুঃখবোধ করতেন। সকলের মুখে পুত্রপ্রসবিনীর নিরন্তর প্রশংসা এবং শিশুর রূপের প্রশংসা সুদেহার মনকে ঈর্ষায় দগ্ধ করতে লাগল। ধীরে ধীরে এই অবস্থার মধ্য দিয়েই পুত্রটি বড় হয়ে উঠল। নানাজনের কাছ থেকে পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ এলে সুধর্মা এক শুভক্ষণে পুত্রের বিবাহ দিলেন। পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হলে ব্রাহ্মণ সুধর্মা ও ঘুশ্মা পরম আনন্দ ভোগ করতে লাগলেন। আত্মীয় স্বজন, কুটুম্বেরা ঘুশ্মার সম্মান করতে লাগল, তা দেখে সুদেহার অন্তর ঈর্ষার তীব্র বিষে জ্বলে যেতে লাগল। সুধর্মা ঘরে ফিরে পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখে আনন্দিত হতেন। তাঁর আনন্দ দেখে সুদেহার মনে তীব্র জ্বলনের সৃষ্টি হল। সুংসারে ঘুশ্মা আনন্দিতা এবং সুদেহা দুঃখিতা হয়ে বাস করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুদেহার মনের ভাব তার শরীরের মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল। ঘুশ্মা তাঁর মনের কষ্ট দেখে একদিন বললেন, 'হে আর্য্যে, এই বধূ আপনারই, আমার নয়।' ঘুশ্মার কথানুযায়ী পুত্র, পুত্রবধূ তাঁদের জ্যেষ্ঠমাতার সেবা ও আদর করতে লাগলেন। সুধর্মাও সুদেহাকে স্নেহ দেখাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সুদেহা তাতে শান্ত না হয়ে, ভিতর ভিতর আরও ক্রুদ্ধ হয়ে

BanglaBook.org

উঠলেন। ঈর্ষা করা তার স্বভাব, তাই মনে মনে ভাবলেন, 'আমার এই দুঃখ কেবলমাত্র, ঘুশ্মার চোখের জলেই শান্ত হতে পারে। অন্যথা এর শান্ত হওয়ার কোন উপায় দেখছি না। যদি আমি ঘুশ্মার পুত্রকে বধ করতে পারি তবেই তার সমস্ত সুখ দূর হবে। এই পুত্রের জন্যই আমার এত যন্ত্রণা। আগে এই পুত্রকে বধ করি, তারপর যা ভবিতব্য তাই হবে।'

কদর্য ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য বিচার ঠিক থাকে না। রাত্রের অন্ধকারে ঘুশ্মার সুখসুপ্ত পুত্রকে বধ করলেন সুদেহা। তারপর তার দেহকে টুকরো টুকরো করে রাত্রির অন্ধকারে সেই পুকুরে ফেলে দিয়ে আসলেন সেখানে ঘুশ্মা শিবপূজা করে প্রতিদিন শিবলিঙ্গ বিসর্জন দিতেন। পুত্র বধ করে সুখে নিদ্রা মগ্ন হলেন সুদেহা।

ভয়ানক রাত্রির শেষে সকাল এল। ঘুশ্মা ও সুধর্মা যথারীতি সকালে স্নান সমাপন করে শিব পূজায় মগ্ন হলেন। এদিকে জ্যেষ্ঠা দ্বিজপত্নী সুদেহা মনের আনন্দে ঘরের কাজে মন দিলেন। পুত্রবধূ ঘুম থেকে উঠে কোথাও স্বামীকে দেখতে পেলেন না, উপরন্তু ঘরের মধ্যে রক্তের দাগ দেখে ভীত স্বন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। সে দ্রুত সুদেহার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'মা, তোমার পুত্র কোথায় গেলেন। শয্যায় রক্ত ও ছিন্ন অঙ্গ রয়েছে। তিনি কোথায় গেলেন।' — পুত্রবধূর ব্যাকুলতা দেখে দুষ্ট সুদেহা মনে মনে আনন্দিতা হয়েও কপট দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'হে সুব্রতে। হায় আমি বোধহয় মারা পড়লাম। কে এই কাজ করল। আমাদের জীবনে কে এই দুঃখ এনে দিল।' —সুদেহার এই কপট কান্না, পুত্রবধূর আর্তনাদ ঘুশ্মার কানে গেল, কিন্তু এতবড় ঘটনা তাকে বিচলিত করতে পারল না। সে তখন শিবপূজায় রত। তাই তাঁর মন কিছুমাত্র চঞ্চল হল না। ঘুশ্মার মতো ব্রাহ্মণ সুধর্মাও এই দুঃসংবাদ শুনে অনাসক্ত রইলেন। যিনি দিয়েছেন তিনিই নিয়েছেন-এই ভাবনাকে দৃঢ় করে শিবপূজায় মগ্ন থাকলেন। ক্রমে সকাল গড়িয়ে দুপুর এল, ঘুশ্মা রক্তময়ী শয্য। দর্শন করেও বিচলিত হলেন না। তিনি ভাবলেন, জগৎপতি জগদীশ্বর বিচ্ছিন্ন ফুলের চয়ন করে মালা গাঁথার মতোই ভিন্ন ভিন্ন আত্মাকে এক আত্মীয়তা সূত্রে বন্ধন দান করেন। সময় হলে তিনিই আবার গ্রন্থি মোচন করেন। এ বিষয়ে চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। —এইরূপ অসাধারণ ভক্তিপূর্ণ মনে ঘুশ্মা চললেন সরোবরের তীরে সেখানে প্রতিদিন তিনি শিবলিঙ্গ বিসর্জন দিতেন। জলে শিবলিঙ্গ নিক্ষেপ করে ঘুশ্মা যখন পিছন ফিরেছেন তখন হঠাৎ শোনেন, পুত্রের কণ্ঠস্বর। পুত্র তাকে সম্বোধন করে বলছেন, 'মা আপনি আমার কাছে আসুন। আমি মৃত্যুমুখ থেকে আবার জীবন লাভ করেছি। আপনার পূজিত শিব আমায় জীবন দান করেছেন, আপনি আমায় ঘরে নিয়ে চলুন।' পুত্রের

BanglaBook.org

মুখে কথা শুনে তার দেখা পেয়ে ঘুশ্মা কিন্তু আনন্দে বিহ্বল হলেন না। শান্ত চিত্তে এ-ও ঈশ্বরের দান-এ ভগবানের এক আশ্চর্য ঘটনা! মৃত্যুর গহ্বর থেকে কি কেউ ফিরে আসে! —এইভাবে ঈশ্বরের স্তবগানে হৃদয়কে মথিত করলেন। ভক্তের আকুলতা, একান্ত নির্ভরতা, সুখ দুঃখে সমজ্ঞান শিবের করুণা সমুদ্রকে প্লাবিত করল। তিনি ঘুশ্মার সম্মুখে উপস্থিত হলেন জ্যোতিরূপে। জ্যোতিরূপী মহেশ্বর বললেন, 'হে বরাননে। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা কর। তোমার পুত্রকে ঐ সুদেহা নিধন করেছিল। আমি তাঁকে ত্রিশূলাঘাতে বিনাশ করব।' —দেবাদিদেবের কথা শুনে ঘুশ্মা বর প্রার্থনা করলেন, 'হে প্রভু, আমার ভগিনীতুল্য সুদেহাকে আপনি রক্ষা করুন। হে নাথ! সুদেহী আপনার অপকার করেছে, আপনি কি জন্যে তার অপকার করবেন? কারণ, আপনাকে দেখলেই সকল পাপ দূর হয়। হে দেবাদিদেব, হে শিব এইস্থানে লোকরক্ষার জন্য এই স্থানে আপনি সর্বদা অবস্থান করুন।' জ্যোতিরূপী মহাদেব ঘুশ্মাকে বললেন, 'হে ভদ্রে, যে অপকারীর উপকার করে তাঁকে দেখলে সকল পাপ দূর হয়। তুমি সুদেহার অপকার ভুলে তাঁর উপকার করলে,তাই তোমাকে দেখলেই সুদেহার সমস্ত পাপ দূর হবে। তবে তুমি আমার এস্থানে অবস্থান ছাড়া অন্য কোন বর গ্রহণ কর।' —ঘুশ্মা বললেন, হে নাথ! যদি আমাকে বরই দেবেন, তবে অনুগ্রহ করে লোকরক্ষার জন্য এই স্থানে অবস্থান করুন। আমার অন্য বরে কাজ নেই।' এই কথা শুনে মহাদেব বললেন, 'হে ঘুশ্মে! আমি আজ থেকে এখানে বিরাজ করব এবং তোমার নামে ঘুশ্মেশ্বর' বলে খ্যাত হব। এই সরোবর আমার অসংখ্য লিঙ্গের আধারে পরিণতি হয়েছে। পুত্রী, তোমার পূজায় এই তীর্থ শিবালয় নামে খ্যাত হবে। এখন থেকে জগতে যতকাল পুরুষ জাতি থাকবে ততকাল তোমার বংশে একটি করে পুত্র থাকবে। অর্থাৎ তোমার বংশলোপ হবে না। কেবল তাই নয় তোমার বংশের সমস্ত পুত্রেরা তোমার এই পুত্রের মতো ধার্মিক, বিচক্ষণ, আয়ুষ্মান, সাগ্নিক, বিদ্বান, ধনবান, সুভার্যার অধিকারী স্বর্গ ও মুক্তি ফলান্বেষী হবে। তোমার বংশে কখনই সন্তান বিচ্ছেদ হবে না। এই আমার আশীর্বাদ।' —সেই থেকে দেবাদিদেবের আশীর্বাদে ঘুশ্মা তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং নিজের নামে অক্ষয় শৈবতীর্থের জন্ম দিলেন। এই শিবলিঙ্গ দর্শনে সুদেহার ঈর্ষাপরায়ণ মনের মালিন্য দূর হয়েছিল, তাই এই লিঙ্গ দর্শন করলে মানবমনের মালিন্য দূর হয়। শিব পুরাণের জ্ঞানসংহিতায় এ তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বর্তমানে এই তীর্থকে গৃশ্মেশ্বরও অনেকে বলেন। ঔরাঙ্গাবাদ, ইলোরার বৌদ্ধগুহার কিছু দূরেই এই শৈবতীর্থ আজও বিরাজিত। জ্যোতির্লিঙ্গগুলির মধ্যে এই তীর্থই সর্বাধিক প্রাচীন বলে পুরাণকারণগণ মনে করেন।

BanglaBook.org

প্রতিটি শৈবতীর্থের সঙ্গে একটি সুগভীর ধর্মভাবনা জড়িয়ে রয়েছে। শিবপুরাণে বর্ণিত এই সুধর্মা নামক ব্রাহ্মণের কাহিনীর মধ্যে ভক্তের একটি সুমহান ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে। যে ভাবনা শিবের প্রতি একান্ত নির্ভরতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সুখ ও দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণের শিক্ষা দেয়। মূল শিক্ষা এটাই। এই শৈবতীর্থের মাহাত্ম্যে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, এই শিবলিঙ্গ দর্শন করলে মনের সকল মালিন্য দূর হয়। কেমন করে মালিন্য মুক্ত হয়ে মন পূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন শুক্লপক্ষের চাঁদ প্রতিদিন একটু একটু করে এক এক কলায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অবশেষে পূর্ণিমার সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। তাই এই তীর্থ মহাত্ম্যে দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রণাম জানিয়ে বলা হয়।

"ঈদৃশঞ্চৈব লিঙ্গহত দৃষ্ট্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে
সুখং সংবর্দ্ধতে নিত্যং শুক্লপথে যথা শশী।"

শিবভাবনার মধ্যে, শিবের রূপকল্পনার মধ্যে আমরা একটি অতি নিস্পৃহ দেবভাবনাকে দেখতে পাই। শিব নিজে যেমন উদাসীন, আত্মমগ্ন, ঠিক তেমনই তিনি সেই ভক্তের ভক্তিতে তুষ্ট হন, যিনি জাগতিক ক্ষেত্রে উদাসীন, আত্মমগ্ন। যাঁর জগতের থেকে চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। তাই মনের মালিন্যকে মুক্ত করার আকুতি জানিয়ে ভক্তকুল দেবাদিদেব মহাদেবকে বন্দনা করে এই স্তব মন্ত্রে, 'হর হর মহাদেব'—হে মহান দেবতা তুমি আমার মনের সকল মালিন্যকে হরণ কর। শুদ্ধ কর, পূর্ণ কর। শিব এক অদ্ভুত দেবতা, তিনি নিজে আচরণ করে তাঁর ভক্তকে ধর্মশিক্ষা প্রদান করেন। ভক্তের প্রতি তিনি সদা প্রসন্ন, তুষ্টে। তিনি কণ্ঠে বিষ ধারণ করেন কিন্তু ভক্তের কাছে তিনি মৃত্যুঞ্জেয়। তিনি স্বয়ং দিগম্বর, কিন্তু ভক্তজনের স্থির সম্পদ বিধাতা। তাঁর নিজের সৈন্য হল ভূত, প্রেত, পিশাচ। কিন্তু তাঁর ভক্তদের চতুরঙ্গিনী সেনা। তাঁর শুভ্র অঙ্গে নরমুণ্ডমালা কিন্তু ভক্তের গলায় মুক্তমালার শোভা। তিনি অঙ্গে চিতা ভস্ম মাখেন, কিন্তু ভক্তদের চন্দন দান করেন। বৃষ তাঁর নিজের বাহন, কিন্তু ভক্তের বাহন হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি। গালবাদ্য তাঁর নিজবাদ্য, কিন্তু ভক্তজনকে পাটহবাদ্য দিয়ে থাকেন। তার নিজের মাথায় দিব্য জটা, কিন্তু তাঁর ভক্তের মাথায় মুকুটাদি শোভা পেতে পারে। তাঁর নিজভূষণ সর্প, কিন্তু তাঁর ভক্তের ভূষণ কুণ্ডলাদি। তাঁর নিজ পরিধেয় বস্ত্র বলতে বাঘের চামড়া। কিন্তু ভক্তজনকে সুন্দর পট্টবস্ত্র দিয়ে থাকেন। তিনি নিজের জন্য একপ্রকার বিধান করেন, ভক্তের জন্য আরেক প্রকার বিধান করে থাকেন। ভক্তরা যা যা কামনা করে, তাঁকে তিনি তাই দিয়ে থাকেন। —দেবাদিদেব মহাদেব এরকমই ভক্তবৎসল।

BanglaBook.org

অবিমুক্ত কাশী

শিবপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, বেশীরভাগ শৈবতীর্থগুলির মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে শিব ও পার্বতীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বিশ্বেশ্বরের কাশীও এর ব্যতিক্রম নয়। শিবপুরাণে এই তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, একসময় পার্বতী লোককল্যাণের জন্য দেবাদিদেব মহাদেবকে পঞ্চকোশীর মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, ভগবান বৃষধ্বজ! আমার প্রতি কৃপা করে এই বারাণসী ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সবিস্তারে বলুন।' পার্বতীর কথা শুনে দেবদেব জগৎপতি জীবের মঙ্গলের জন্য বললেন, 'দেবী, এই বারাণসী ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অতি গোপনীয়। তবুও আমি তোমাকে লোকের সুখনিদানের জন্য তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করছি। পার্বতী, তুমি সর্বদা জানবে আমার বারাণসীক্ষেত্র সর্বকালে সর্বজীবের মুক্তিহেতু। ভদ্রে! এই তীর্থে সংযতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধগণ, ত্রিপুণ্ড্রাদি চিহ্ন ধারণ করে আমার ব্রত অবলম্বন করে নিয়ত পরমযোগ অভ্যাস করেন। এই ক্ষেত্রে বিবিধ সুন্দর বৃক্ষ শোভা পায়, তাতে পাখীরা কলরব করে। পুষ্করিণীতে পদ্ম ফুটে থাকে। গন্ধর্ব্ব, নাগ ও অপ্সরাগণ এই তীর্থকে সর্বদা আশ্রয় করে থাকে। কিন্তু আমি সে কারণে এই তীর্থে বাস করতে ভালবাসি তা তুমি শোনো, এই তীর্থে ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বদর্শী আমার ভক্তলোক; রাগ, ভয়, ক্রোধ, দ্বন্দ্ব ও আমার জন্য সব কিছু ত্যাগ করে সব কর্ম আমায় সমর্পণ করে এবং এই জগতের সব কিছুই আমার প্রকাশ এই চিন্তাকে ধারণ করে তীর্থবাস করে-সেই ভক্তদের আশ্রয়স্থল এই বারাণসী ধাম। এই ভক্তদের সঙ্গে আমার কোনো ভেদ নেই জানবে। আমি ও সেই ভক্ত এক, কারণ তাঁরা সব সময় আমার কথা চিন্তা করে। হে সুন্দরী, এই তীর্থে বিশেষ কিছু আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যদি, কুমার, বালক ও যুবা অশুচি হোক, শুচি হোক নিষ্পাপ হোক, পাপী হোক, বা কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হোক-এই তীর্থে মৃত্যু হলে সংশয়হীন ভাবে মুক্তিজ্ঞান হবে। বালিকা, কুমারী, পতিতা, বিধবা, বন্ধ্যা, রজস্বলা, প্রসবকালে মৃতা বা সংস্কারশূন্যা—যে-ই হোক, এই তীর্থে মৃত্যু হলে মুক্তি পাবে।কেবল জরায়ুজ প্রাণী নয়। এই তীর্থে মৃত্যু হলে স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ প্রাণীও মুক্তি লাভ করে। হে দেবী, এই তীর্থে কর্মে আবদ্ধ জীবও মুক্তিলাভ করে বলে—এই ক্ষেত্রকে তাই

BanglaBook.org

জ্ঞানের ক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত করা হয়। এই দিব্য নগর গোপনীয় থেকেও গোপনীয়তম। সিদ্ধ, মুমুক্ষ ও ব্রহ্মাদি কেবল এই তীর্থের মহিমা জানেন। এই তীর্থে মৃত্যু হলে আত্মার সদ্‌গতি হয় বলেই, এই তীর্থ আমার এত প্রিয়। এই তীর্থকে আমি কখনই ত্যাগ করব না। এর জন্য এই মহান তীর্থ 'অবিমুক্ত কাশী' নামে প্রসিদ্ধ। নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার ও পুষ্কর-এই চার তীর্থে প্রতিদিন স্নান ও পূজা করলে অর্থাৎ এই তীর্থে শুদ্ধভাবে জীবন কাটালে মুক্তি সম্ভব। কিন্তু কাশীতে যথেচ্ছ ভোজন, ক্রীড়া, নিদ্রাদি বিভিন্ন ভোগবিলাসের পর মুক্তিলাভ সম্ভব। ধর্মের রহস্য যেমন সত্য, মোক্ষের রহস্য শান্তি, ঠিক তেমনি পণ্ডিতেরা অবিমুক্তক্ষেত্রকে সেরাক্ষেত্র ও তীর্থের রহস্য স্বরূপ বলে মনে করেন। এই তীর্থ আমি প্রতিষ্ঠা করেছি, সুতরাং এখানে হাজার হাজার পাপ করে পিশাচ হওয়াও ভাল, মোক্ষের জন্য ঐ ক্ষেত্রের সেবা করবে।' এইভাবে দেবাদিদেব মহাদেব তীর্থরাজের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করতে লাগলেন। তিনি দেবীকে বললেন, 'হে শুভে, সাধারণ মানুষের কথা কি বলব দেবতারাও এই তীর্থের সেবা করেন। যক্ষরাজ কুবের আমায় সব কর্মফল সমর্পণ করে এই ক্ষেত্র সেবা করায় গণাধিপত্য পদ লাভ করেছেন। যোগী পরাশর ও মহাতপা ব্যাস এই ক্ষেত্রসেবা বলেই ভবিষ্যতে বেদাদি-সংস্থাপনে সমর্থ হবেন। বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, দেবর্ষিগণ, অষ্টবসু, দিবাকর, দেবরাজ ইন্দ্রও অপরাপর দেবগণ—এই ক্ষেত্রে আমার উপাসনা করছেন। যোগী সহস্র সহস্র জন্মান্তরে যে মুক্তি লাভ করতে অসমর্থ, —এই ক্ষেত্রে মরণমাত্রেই তা লাভ করা যায়। আমার মহিমা খ্যাপনে একটি কাহিনি তোমাকে শোনাব।' —এই বলে শিবশম্ভু নিজমুখে নিজ কীর্তি বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, বহুদিন আগে ব্রহ্মা কপিলা নামে এক হ্রদ স্থাপন করেছিলেন। এই হ্রদে ব্রহ্মা রুদ্ররূপী আমার লিঙ্গ স্থাপন করেন এবং পূজা রাগ, ভোগের মাধ্যমে আমার তুষ্ট করেন। এই তীর্থে দর্শন করলেও মানুষ পাপমুক্ত হয়। কপিলা তীর্থে রুদ্ররূপী শিবকে ব্রহ্মা প্রথমে স্থাপন করলেও, পরে বিষ্ণু আমাকে পুনরায় স্থাপন করেন। এর ফলে ব্রহ্মা দুঃখিত হয়ে বলেন, 'হে নারায়ণ, এই লিঙ্গকে আমি প্রথমে স্থাপন করেছি। আবার আপনি কেন একে স্থাপন করলেন? এই লিঙ্গ আমিই এখানে এনেছিলাম।' ব্রহ্মাকে দুঃখিত হতে দেখে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বললেন, রুদ্রদেবের প্রতি অত্যন্ত ভক্তির ফলে আমি পুনরায় এই লিঙ্গকে স্থাপন করলাম বটে, কিন্তু আজ থেকে আপনার নামে এই লিঙ্গের নাম হবে হিরণ্যগর্ভেশ্বর।' বিষ্ণুর কথায় ব্রহ্মার মন ভরল না। তিনি আবার এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলেন—এই লিঙ্গের নাম দিলেন সলীলেশ্বর। সেই থেকে আমি 'সলীলেশ্বর' নামে খ্যাত হলাম। এই সলীলেশ্বর ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করলে মানুষের

BanglaBook.org

পুর্ণজন্ম হয় না। এই তীর্থে আমি ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করে দেবশত্রু নামে এক দৈত্যকে বধ করেছিলাম। তাতেই আমি ব্যাঘ্রেশ্বর নামে খ্যাত হয়েছি। এই শিবলিঙ্গকে দর্শন করলে মহাপাতক নাশ হয়। এছাড়াও তোমার পিতা হিমালয় আমার প্রিয়তম স্থানে স্বয়ং শৈলেশ্বর নামে এক লিঙ্গ স্থাপন করে রেখেছেন। আবার যেখানে পাপনাশিনী পবিত্র বারাণসী পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেখানে ব্রহ্মা সঙ্গমেশ্বর নামে এক অদ্ভুত লিঙ্গ স্থাপন করেছেন। এসবই আমার প্রিয় তীর্থস্থান। কিন্তু দেবী এই পঞ্চক্রোশী বারাণসী তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এই ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে পঞ্চক্রোশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। এই পঞ্চক্রোশের মধ্যে যাঁরই মৃত্যু হবে সেই মুক্তিলাভ করবে।' —দেবাদিদেবের মুখে বারাণসী বা কাশীক্ষেত্রের তীর্থ মাহাত্ম্য শুনতে শুনতে পার্বতী হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'হে ব্রাহ্মণ! আপনার কথায় আমি খুব বিস্ময় বোধ করছি। একজন সন্ন্যাসী আর একজন গৃহী, আবার একজন সৎকর্মধারী পুণ্যবান ও অপর একজন কর্মবর্জিত পাপী সকলেরই এক গতি প্রাপ্ত হয় কেন? হে শঙ্কর, একথা শোনা আছে, মৃত্যুকোলে যে যে ভাবনার মনকে আচ্ছাদিত করে রাখে সেই গতিপ্রাপ্ত হয়। —কিন্তু এখানে মৃত্যুকোলে যদি অন্য কিছু চিন্তা করা হয় তবুও মুক্তিলাভ হবে? —এ কিরকম ভাবে হয়! আমার এই প্রশ্নের মীমাংসা করে দিন!'

পার্বতীর কথায় দেবাদিদেব আরও তুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি প্রকৃত শিষ্যের মতোই প্রশ্ন করছ। তবে শোন, যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে নিষ্পাপ হয়ে মরে, সে তৎক্ষণাৎ মোক্ষ পায়। আর যে পাপী তার কি হয়? —সে মৃত্যুর পর কায়রূপ যে ব্যূহ রয়েছে তাকে সূক্ষ্মভাবে পরিগ্রহ করে এবং কিছু যাতনা সহ্য করে তবে তাঁর মুক্তি হয়, হে দেবী, যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে পাপকাজ করে, সে পিশাচ হয়। মরণান্তে দশহাজার বছর ভৈরবী নামে এক যাতনা ভোগ করে তবেই মোক্ষ লাভ করবে।' —শিবপুরাণে উল্লিখিত শিবপার্বতীর কথোপকথনে বারাণসী তীর্থের মোক্ষসংক্রান্ত তত্ত্ব এক বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত। এখানে বলা হয়েছে সকলেই মোক্ষলাভ করবে বটে কিন্তু পুণ্যবান এবং পাপীর ক্ষেত্রে মোক্ষলাভের পন্থা একটু পৃথক। শিবপুরাণে এইভাবে বারাণসীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত হলেও অন্যান্য শাস্ত্রে বারাণসী ক্ষেত্রকে সকল প্রাণীর মুক্তিলাভের তীর্থ এবং পৃথিবীর থেকে যেন ভিন্ন এক স্থান বলে বর্ণনা করেছেন। এই তীর্থের তীর্থ কাহিনীও বিচিত্র।

হরিকেশ নামে বিখ্যাত ব্রহ্মনিষ্ঠ ধার্মিক এক যক্ষ ছিলেন। যক্ষদের মধ্যে তার ছিল প্রবল প্রতাপ। হরিকেশের পিতার নাম পূর্ণভদ্র। হরিকেশ জন্মাবধি শিবের প্রতি মহাভক্তিপ্রবণ ছিলেন। তিনি শিবনিষ্ঠ, শিবপ্রণত, শিবভক্ত এবং শিবপরায়ণ এক যক্ষ। আসন, শয়ন, গমন, অবস্থান, অনুগমন, ভোজন এবং ধাবন সময়েও

BanglaBook.org

হরিকেশ শিবরূপ চিন্তায় তৎপর থাকতেন। হরিকেশের এই শিবভক্তি দেখে যক্ষ পূর্ণভদ্র একদিন বললেন, 'হে পুত্র আমরা যক্ষবংশীয় গুহ্যক। আমরা এরকম অহিংসক নই। গুহ্যক, স্বভাবতঃ ক্রূরচেতা, হিংস্রক, মাংশাসী হবে। হে পুত্র, তুই যে বৃত্তি অবলম্বন করেছিস তা তোমার কর্ত্তব্য নয়। তুমি সবসময় শিবচিন্তায় মগ্ন থাক, আমার কথা শোন না। যখন তুমি এরকম হয়ে গিয়েছ, তখন তোমাকে আর আমি পুত্র বলেই মনে করি না। মানুষেরা বিভিন্ন আশ্রমের নির্দিষ্ট কর্ম সঠিকভাবে পালন করেন। আমরা নানা সৎকর্ম পালন করে দেবযোনিত্ব রূপ শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করেছি। তুমি দেবত্ব লাভ করেও সাধারণ মানুষের মতো শিবপূজায় সর্বদাই মগ্ন থাক। আমরা এইরকম ধর্মপ্রাপ্তি চাই না, ঐরূপ কর্মও করি না। তোমাকে বহুবার বারণ করা সত্ত্বেও তুমি আমার কোন কথা শোনোনি। তুমি আমার গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হও। অন্যান্য যক্ষদের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারছি না।'

পূর্ণভদ্র এইরকম কথা বললে হরিকেশ গৃহত্যাগ করে মহাদেবের প্রিয় তীর্থ বারাণসীতে উপস্থিত হলেন। বংশ ও জাতির বৃত্তি পরিত্যাগ করে গভীর তপস্যায় মগ্ন হলেন। তপস্যার প্রভাবে শুকনো কাঠের মতো শরীর হয়ে গেল। যোগীশ্বর গোকর্ণ মহাদেবের আরাধনা করে ইন্দ্রিয়গুলি এমনভাবে নিশ্চল করে রাখলেন— সমস্ত দেহে বল্মীকের আচ্ছাদন পড়ে গেল। পিপীলিকা আর নানা ধরণের কীট হরিকেশের কাঠের মতো দেহ থেকে মাংস খেতে লাগল। দেবচিন্তাপরায়ণ অবস্থাতে তার দেহ এইভাবে রক্তমাংস বর্জিত হল কিন্তু একদিকে মুখমণ্ডল কুন্দফুল চন্দ্রের শোভা ও শঙ্খের মতো প্রভাসম্পন্ন হয়ে উঠল। এই অস্থিসার শরীর দেখে হরিকেশের কোন ভাবনার উদয় হল না। রক্ষাকর্তা আছেন, সব কিছুই ঠিকভাবে হবে। এইভাবে হাজার বছর অতিবাহিত হল। দেবাদিদেব মহাদেব শিব তার উপর অনুরক্ত হয়ে উঠলেন। এমন তপস্বী, শুধু তপস্বী নয়, শিব তন্ময়তায় ধীর স্থির—এমন ভক্তকে দেখা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন মহাদেব। ঠিক এইসময় দেবীপার্বতী দেবাদিদেব মহাদেবকে বললেন, হে পূজ্য! আপনার উদ্যান-দর্শনে আবার অভিলাষিণী হয়েছি। আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। শিব পার্বতীর সঙ্গে বারাণসীর মনোরম উদ্যানে বেড়াতে চললেন। বারাণসীতে এসে মহাদেব পার্বতীকে বললেন, 'হে শৈলসূতে চল আমার ভক্ত হরিকেশের কাছে যাই। তার দুশ্চর তপস্যা শেষ হয়েছে।' —এই বলে মহাদেব ভক্ত শ্রেষ্ঠ যক্ষের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে বৎস! তোমাকে আমি ত্রিলোক দুর্লভ বর দেব, তুমি আজ থেকে তোমার সমস্ত শরীরের সঙ্গে আমাকে লাভ কর।' বৃষাকর দেবাদিদেবের এই কথা শুনে যক্ষ প্রফুল্ল মনে তাঁর পদতলে পতিত হল। 'ভগবন্! আপনার প্রতি আমার অনন্য সাধারণ ভক্তি যেন অবিচলিত থাকে এবং অক্ষয়

BanglaBook.org

গাণপত্য পদ লাভ করি। এই তীর্থে আমি যেন সকলের অন্নদাতা রূপে অবস্থান করি এবং এই অবিমুক্তকাশীর ধুতুরা বনে যেন আমার বাস হয়। আমাকে এই বরদান করুন।' হরিকেশের বাক্যে তুষ্ট মহাদেব বললেন 'হে পুত্র, তুমি জরা, মৃত্যু ও সর্বদুঃখবিহীন হয়ে আমার গণপতি হবে এবং সকলের পূজ্য ও বরদাতা হবে। তোমাকে কেউ কখনও পরাভূত করতে পারবে না। তুমি যোগবল ও ঐশ্বর্য্যমুক্ত হয়ে লোকের অন্নদাতা ও ক্ষেত্রপাল হবে। তুমি মহাবল পরাক্রান্ত বলে ব্রহ্মা ও আমার প্রিয়পাত্র হবে। তুমি যক্ষ, তুমি দত্তপাণি এবং মহাযোগী। উদ্‌ভ্রম ও সম্ভ্রম—নামে দুই সহচর তোমার পরিচারক হয়ে তোমার আজ্ঞায় সর্বদা কাজ করবে। এইভাবে মহাদেব যক্ষকে কাশীর গণপতি করলেন।

শিবপুরাণে উল্লিখিত হরিকেশ ও মহাদেবের কাহিনীতে অবিমুক্ত কাশীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের এক সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। মহাদেব পার্বতীকে এই তীর্থ পরিক্রমা করাচ্ছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে পুরাণকার ব্যক্ত করেছেন কাশীর এক চিত্র। কাশী কেবল মন্দিরময় নয়, বৃক্ষময়ও বটে! উজ্জ্বল নানা বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ফুলে ভরা। কেতকী বৃক্ষ, কোথাও সুগন্ধি তমাল, ফুলে ভরা বকুল, অশোক, পুন্নাগ বনে অলিকুলের গুঞ্জন। এই সুগন্ধী ফুলভারে অবনত উদ্যানে বিদ্যাধর ও চারণেরা গান করছে। অপ্সরারা নৃত্য করছে। কোথাও মৃগগণ দলবদ্ধ হয়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও বা ফুল্ল কমলবন শোভিত জলাশয় আনন্দ প্রদান করছে। হাতীর দল যূথবদ্ধ হয়ে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। তার পাশে ময়ূরেরা পেখম তুলে আনন্দ করছে, মদমত্ত বিহঙ্গ কূল মনোহর স্বরে গান গাইছে। সুন্দর লতায় আচ্ছাদিত বৃক্ষগুলি আনন্দে আন্দোলিত হচ্ছে। দেবমন্দিরের চূড়াগুলিতে পারাবতের দল কলধ্বনি করছে। এই তীর্থে কুসুমিত তিলবৃক্ষের শোভায় আনত হয়ে রয়েছে। বিশাল জলাশয়ের স্বচ্ছজল এবং পদ্মবনে হংস-হংসী আনন্দ করছে। সুন্দর অবিমুক্তকাশী দেখে ভবানী দেবী বললেন, 'হে দেব, পরম শোভাপ্রসন্ন এই উদ্যান দেখা যাচ্ছে। এখন আবার আমায় ক্ষেত্র গুণকীর্তন করুন। আমি অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যকথা শুনছি বটে, কিন্তু আশা মিটছে না। আমাকে আবার এই ক্ষেত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।' মহাদেব শুনলেন, বারাণসী আমার গুহ্যতের সনাতন ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র সর্বপ্রাণীর সতত মুক্তির কারণ। হে দেবি! এখানে আমার লোক অর্থাৎ শিবলোকপ্রাপ্তিকামী সিদ্ধগণ নানা চিহ্ন ধারণ করে শিবব্রত পালন করে যুক্তচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে সতত পরমযোগ অভ্যাস করছে। নানা বৃক্ষ সমাকীর্ণ নানা পক্ষি বিরাজিত গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ সর্বদা এই ক্ষেত্রে বাস করে। এখানে যেমন লোকে সমর্পিত চিত্ত, আমার ভক্ত এবং আমাতে অর্পিতকর্মা হয়ে মুক্তিলাভ করতে পারে, অন্য কোথাও সেরূপ করতে পারে না। এই আমার দিব্যপুর গোপনীয় থেকেও গোপনীয়।

BanglaBook.org

ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মুমুক্ষ সিদ্ধগণ একথা জানেন। যেহেতু এই মহাক্ষেত্রকে আমি কখন ত্যাগ করিনা। ঋষিগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে এই তীর্থে উপাসনা করেন। অন্য সিদ্ধযোগীগণও এইস্থানে প্রচ্ছন্নরূপে মহাব্রত অবলম্বন করে আমার উপাসনা করেন। যে ব্যক্তি আমার প্রসাদে এই ভূষণভূতা নগরী প্রাপ্ত হয়, সেই মানব চতুর্বর্ণ সঙ্কুল জনপাদাকীর্ণ স্ফীত রাজ্য প্রথমে প্রাপ্ত হয়, পরে আমাতে প্রাণাপণ সমর্পণ করে আমাকেই লাভ করে। এইক্ষেত্র নিবাসী গৃহস্থ বা ব্রহ্মচারী মদ্ভক্ত ও মৎপরায়ণ হয়ে আমার প্রসাদে পরে দুর্লভ মুক্তিলাভ করবে। যে মানব, বিষয়াসক্ত চিত্ত এবং ধর্মত্যাগী, এই স্থানে মৃত্যু হলে তাকেও আর সংসারে প্রবেশ করতে হবে না। মায়া মমতা-বিহীন, সত্ত্বগুণাবলম্বী, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যারা ব্রতধারণ করে এই বিজন প্রদেশে আশ্রয় করে সর্বদা আমাকে চিন্তা করে, সেই সঙ্গত্যাগী জ্ঞানীরা আমাকে প্রসাদে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। হে দেবী! তোমার কাছে ক্ষেত্রের এই পরম রহস্য সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম, এই তীর্থ মাহাত্ম্য আশ্রমিকদের জন্য অশেষ ফলজনক।

হে দেবী! যারা পূর্বজন্মে আমাকে আরাধনা করেছে, কেবল তারাই জানতে পারে-এই অভিমুক্ত ক্ষেত্র পরমতীর্থ স্থান। হে সুব্রতে! ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সব সাধু আছেন তাঁরা বৈশাখী চতুর্দশী তিথিতে বারাণসীক্ষেত্রে গিয়ে পঞ্চায়তনবাসী মহাদেবকে দেখবেন-এই হল তীর্থের মাহাত্ম্য।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উজ্জয়নী

বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যে নানা শৈবতীর্থ বর্তমান। স্কন্দপুরাণের অবন্তীখণ্ড বহু শৈবতীর্থের উল্লেখ রয়েছে, উপস্থিত সেই তীর্থের কাহিনীও। দেবরাজ ইন্দ্রের অংশে জন্মগ্রহণ করেন উজ্জয়িনীর রাজা গন্ধর্বসেন। তাঁর দুই পুত্র, ভর্ত্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্য। কন্যার নাম মৈনাবতী। সংস্কৃত সাহিত্যে ভর্ত্তৃহরি এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ কাহিনী রয়েছে। কোন একসময় জয়ন্ত নামে একজন তপস্বী ইন্দ্রকে প্রসন্ন করে একটি অমৃতফল লাভ করেছিলেন। তপস্বী এই ফলটি লাভ করে ভাবলেন, আমার অমৃতফলের প্রয়োজন কি? এই অমৃতফল প্রজানুরঞ্জক রাজা ভর্ত্তৃহরিকে দিলে মানুষের উপকার হয়। এই ভেবে তিনি সেই ফলটি পরম শিবভক্ত রাজা ভর্ত্তৃহরিকে উপহার দিয়ে বললেন, 'হে রাজন, এই ফলটি খেলে আপনার যৌবন অটুট থাকবে এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারবেন।' রাজা তাপস জয়ন্তের দেওয়া ফলটি নিজে না গ্রহণ করে পরমপ্রিয় রাজ্ঞীকে উপহার দিলেন। রানীকে ফলটি দেওয়ার সময় ভর্ত্তৃহরি ফলের গুণটিও স্ত্রীকে জানালেন। এদিকে পরমাসুন্দরী রাণীর একজন উপপতি ছিলেন, রাণী সেই ফলটি নিজে না খেয়ে সেই উপপতিকে দিলেন। সেই উপপতী আবার এক বারাঙ্গনার প্রতি আসক্ত ছিলেন, ফলটির গুণাবলী শুনে বারাঙ্গনা ভাবলেন, আমার এই অভিশপ্ত জীবন দীর্ঘ করে কি হবে, তার থেকে দেশের পিতা সমান রাজাকে এই অমৃতফল প্রদান করলে ফলটি উপযুক্ত পাত্রে প্রদান করা হবে। তিনি রাজা ভর্ত্তৃহরির কাছে সেই অমৃতফল নিয়ে গেলেন। অমৃতফলটি দেখে অবাক, এই ফলটি তো তিনিই রাণীকে দিয়েছিলেন, সেই ফল এক বারাঙ্গনার কাছে গেল কি করে? প্রজাবৎসল দয়ালু রাজা জিজ্ঞাসাবাদ করতেই প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হল। রাণীর এই বিশ্বাসঘাতকতা দেখে রাজা ভর্ত্তৃহরির মনে চরম বৈরাগ্যের সৃষ্টি হল। তিনি রাজ্যপাট ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শিবসাধনায় মগ্ন হলেন। নর্মদার তীরে এইরকমই বৈরাগ্যবান সাধক শিবসাধনায় মগ্ন হয়েছেন এবং বিচিত্র শিবলিঙ্গের বন্দনা করছেন।

নর্মদার তীরে তীরে শিবলিঙ্গের সে বর্ণনা রয়েছে তাঁর মধ্যে প্রায় আঠাশ রকমের লিঙ্গের দেখা পাওয়া যায়। এই লিঙ্গগুলি হল বর্ধমান লিঙ্গ, অর্ধনারী

BanglaBook.org

লিঙ্গ, ওঁকার লিঙ্গ, জ্যোর্তিলিঙ্গ, ধারালিঙ্গ, সর্পীলিঙ্গ, মুখ্যলিঙ্গ, সহস্রলিঙ্গ, চন্দ্রমৌলী লিঙ্গ, আর্যকলিঙ্গ লিঙ্গ, স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, পুষ্পলিঙ্গ, নর্মদেশ্বর লিঙ্গ, শিখরলিঙ্গ, ভৈরবলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, কৈলাসলিঙ্গ, তিলকলিঙ্গ, উর্দ্ধলিঙ্গ, দৈবিকলিঙ্গ গাণপত্যলিঙ্গ, গুণ্ডীমল্ললিঙ্গ, কাষ্ঠলিঙ্গ, কর্পূরলিঙ্গ, পারদলিঙ্গ, ক্ষণিকলিঙ্গ। বৃহৎসংহিতা ও শৈবশাস্ত্রে এই সমস্ত শিবলিঙ্গে রূপভেদের বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রকৃতির আশ্চর্য নিয়মে যে লিঙ্গ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাকে বলে বর্ধমান লিঙ্গ। যে লিঙ্গের অর্ধেক অংশ সাদা আর অর্ধেক অংশ কৃষ্ণবর্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ হয়। এক লিঙ্গের মধ্যে দুটি বর্ণের সমাবেশ হয় বলে এই লিঙ্গকে অর্ধনারীশ্বর লিঙ্গ বলে চিহ্নিত করা হয়। যে শিবলিঙ্গের চারপাশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধরা চিহ্ন রেখার মতো নিচের দিকে নেমে এসেছে সেই লিঙ্গকে ধারালিঙ্গ বলে। অন্য মতে এই লিঙ্গ সহস্রলিঙ্গ নামে পরিচিত। কোনো কোনো লিঙ্গে হাজারটি ধারা দেখা যায়, এই লিঙ্গকে বলা হয় সহস্রলিঙ্গ। 'দৈহিক লিঙ্গ' রূপে সেই লিঙ্গকে চিহ্নিত করা হয়। যে লিঙ্গ স্থাপনের ক্ষেত্রে পৌরাণিক কাহিনী রূপে কোনো দেবতা লিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করেছেন—এরূপ বলা হয়। আর্যকলিঙ্গ কোনো ঋষির মাধ্যমে স্থাপিত। এর মধ্যে পুষ্প বা ফুলের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। 'গাণপত্যলিঙ্গে' গণেশ্বরের কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। 'মুখলিঙ্গ' সেই লিঙ্গকে বলে যে লিঙ্গের মধ্যে প্রকৃতিই চোখ নাক মুখ চিত্রিত করে দিয়েছে। 'বাণলিঙ্গ' কালো বা স্ফটিক স্বচ্ছ জাম রঙের হয়। এই লিঙ্গ নর্মদা নদীর ধাবড়ী কুণ্ড সৃষ্টি হয়। দেবতারূপে মহাদেব চন্দ্রমৌলী নামে বিখ্যাত কারণ তিনি অর্ধচন্দ্রকে নিজের জটায় স্থান দিয়েছেন। নর্মদা তরীর তীরে দৈববশতঃ কোনো লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়, যাঁর মস্তকে চাঁদ শোভা পাচ্ছেন। এইপ্রকার লিঙ্গকেই চন্দ্রমৌলী নামে চিহ্নিত করা হয়। 'চন্দ্রমৌলী'র সঙ্গে সঙ্গে কৈলাস লিঙ্গের কথাও বলা হয়েছে। এই লিঙ্গ একদম দুধ সাদা রঙের হয়। আর তার উপরের অংশ এমনভাবে চিত্রিত থাকে যে মনে হয় কৈলাসের দুধ সাদা চূড়া এর ভিতর প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

একসময় সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলে 'উর্দ্ধলিঙ্গে'র আরাধনা করা হত। যে লিঙ্গের ব্যাস নিচের দিকে মোটা হয়ে ক্রমে সরু হয়ে এসেছে সেই লিঙ্গকে উর্ধ্বলিঙ্গ বলে। এর মধ্যে ত্রিশূল, সর্প, নদী, চাঁদ ইত্যাদি চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। বৃহৎসারে জ্যোর্তিলিঙ্গ বলতে সেই সব লিঙ্গকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলি স্ফটিক স্বচ্ছ গা দিয়ে এক জ্যোতির্বিন্দু নির্গত হয়। এছাড়া 'ক্ষণিকলিঙ্গ' ও 'কর্পূরলিঙ্গে'র কথা বলা হয়েছে। মাটি বা পাথরের অভাবে দুধ সাদা কর্পূর দিয়ে

BanglaBook.org

লিঙ্গ রচনা করা হয় এবং পূজার পর এই লিঙ্গকে নষ্ট করেও ফেলা হয়। এইভাবে ফুল, বালুকা ও মাটি দিয়ে তৈরি শিবলিঙ্গকে ক্ষণিকলিঙ্গ নামে চিহ্নিত করা হয়।

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা যে সব শিবলিঙ্গগুলির আলোচনা করলাম, সাধারণ শিবলিঙ্গের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য রয়েছে। যদিও বাণলিঙ্গের দেখা আমরা পাই তবু অন্যান্য লিঙ্গ মূলত নর্মদা নদীর তীরেই সৃষ্টি হয় এবং নর্মদার স্রোত ও মার্বেল পাথরের বিশেষত্বে এইখানে নানা অদ্ভুত প্রকৃতির শিবলিঙ্গের দেখা পাওয়া যায়। আমরা দ্বাদশজ্যোর্তিলিঙ্গ বলতে যে সব শিবলিঙ্গকে বুঝি তাদের মধ্যে জ্যোতির চমকের দেখা মেলে না। উপরন্তু কালো পাথরের ছোটলিঙ্গই আমরা দেখি ও এর মধ্যে রামেশ্বরের জ্যোর্তিলিঙ্গকে বৃহৎসার অনুসারে ক্ষণিকলিঙ্গও বলা যায়। কারণ এই শিবলিঙ্গ বালুকা দিয়ে তৈরী। রামেশ্বরের জ্যোর্তিলিঙ্গের সঙ্গে জড়িত আছে রামায়ণের এক কাহিনি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

রামেশ্বর

রামায়ণের কাহিনী হলেও রামেশ্বরমের তীর্থ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে স্কন্দপুরাণের মধ্যে। সীতা উদ্ধারের পর পুষ্পক রথে করে অযোধ্যা ফিরবার পথে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে নেমেছিলেন রাম। সেখানে তখন অগস্ত্যমুনি তপস্যা করছেন। তিনি রামচন্দ্রকে জানান, ঋষি বিশ্রবার পুত্র রাবণকে বধ করে ব্রহ্মহত্যার পাপ গ্রহণ করেছেন রাম। এর জন্য তাঁর শিবপূজা সম্পন্ন করতে হবে। অগস্তের আদেশ অনুসারে শিবপূজার আয়োজন করলেন। হনুমানকে আদেশ করলেন কৈলাস থেকে শিবলিঙ্গ আনতে। হনুমান শিবলিঙ্গের জন্য কৈলাস গেলেন বটে কিন্তু ফিরতে দেরি হতে লাগল। এদিকে শুভমুহূর্ত চলে যায় আর কি! ইতিমধ্যে সীতা সমুদ্রের তীরে বালুকা দিয়ে খেলার ছলেই একটি শিবলিঙ্গ গড়েছিলেন। সীতার হাতের স্পর্শে সেই বালুকাময় লিঙ্গ শক্ত আকার ধারণ করতে রামচন্দ্র হনুমানের জন্য অপেক্ষা না করেই শুভমুহূর্ত অতিক্রান্ত হওয়ার আগে সীতার বালুকাময় লিঙ্গটির অর্চনা করলেন।

এদিকে হনুমান কৈলাস থেকে শিবলিঙ্গ নিয়ে এসে দেখেন শ্রীরাম সীতা নির্মিত শিবলিঙ্গের অর্চনা করছেন। রামের এই কাজে ভক্ত হনুমানের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হল, তিনি রাগের চোটে লেজ দিয়ে সীতানির্মিত লিঙ্গটি উৎপাটিত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু শিবলিঙ্গের বিন্দুমাত্র স্থানচ্যুতি সম্ভব হয় না। সীতাদেবী নির্মিত এই বালুকাময় লিঙ্গ রামেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত হল। যেহেতু মূল লিঙ্গটি বালুনির্মিত তাই ভক্তদের গর্ভমন্দিরে প্রবেশ ও পূজার অধিকার দেওয়া হয় না। সারা বছরই সোনার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গের মধ্যে রামেশ্বর হল একটি শৈবতীর্থ। বালুকাময় এই ক্ষুদ্র লিঙ্গটি আকারে দেড়হাতের মতো লম্বা, সোনার মুকুট তার উপর দেওয়া থাকে, দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা এই শিবলিঙ্গের পূজা করে থাকেন। এই তীর্থের কাছে ধনুষ্কোটি তীর্থ। এখানে সমুদ্রকে ধনুক ও বাণ দিয়ে পূজা করা হয়।

স্পন্দপুরাণে সীতা রামেশ্বর লিঙ্গ তৈরি করেছিলেন একথা বলা হলেও রামেশ্বর তীর্থ গড়ে ওঠার কাহিনী শিবপুরাণে ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই পুরাণ অনুসারে সীতা হরণের পর একদিন রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সুগ্রীবাদী মহাবলবান অষ্টাদশ পঞ্চসংখ্যক বানরদের সঙ্গে করে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলেন। দক্ষিণ দিকে লবণ

BanglaBook.org

সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, জানকী কোথায় গেলেন? কবেই বা ফিরে আসবেন? তাঁকে কি রাক্ষসদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারব? এইসব চিন্তা করতে করতে রাম লক্ষ্মণ, অঙ্গদ ইত্যাদির সঙ্গে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে পিপাসার্ত হলেন রাম, তিনি লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে লক্ষ্মণ, আমার অত্যন্ত পিপাসা পেয়েছে তুমি আমার তৃষ্ণার জন্য জল এনে দাও।' রামের কথা শেষ হওয়া মাত্র বানরগণ দশদিকে দশজন জল আনতে ছুটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা জল এনে রামের সম্মুখে ধরে বলল, 'হে প্রভু, আপনার আদেশে জল এনেছি আপনি গ্রহণ করুন।' শ্রীরাম জল পান করতে উদ্যত হতেই তাঁর স্মরণে এল, আজ তো শিবদর্শন হয়নি, তবে কিভাবে জল গ্রহণ করব। এই সমুদ্রের তীরে শিবমন্দিরই বা কোথায়? জল ত্যাগ করে শ্রীরাম সেই সমুদ্রতীরেই 'পার্থিব শিবলিঙ্গ' গঠন করলেন। গন্ধপুষ্প নানা উপাচার দিয়ে পূজা সম্পন্ন হল। তারপর রামচন্দ্র শিবের স্তব করে বললেন, 'হে প্রভু, এই সমুদ্রের জল অগাধ, ঐ রাক্ষস রাবণ অত্যন্ত বলবান। আমার সঙ্গে রয়েছে চপলমতি বানরকুল। হে শম্ভু, এ কারণে আমি আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি জানি রাবণ আপনার ভক্ত, সে অত্যন্ত বলবান ও আপনার বরে অজেয়। তবুও হে শিব, আমি জানি আপনি সর্বদা ধর্মের পক্ষে থাকবেন। জানকীহরণের ফলে রাবণ যে কীর্তি করেছে তাকে আপনি নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন না। হে শিব শম্ভু আমাকে সাহায্য করুন।' এইভাবে শিবের স্তব করে 'জয় জয় শঙ্কর শঙ্কর'—নাম উচ্চারণ ও প্রদক্ষিণ করতে থাকলেন। শ্রীরামচন্দ্রের শিবপূজার ফলে দেবশঙ্কর জ্যোতির্ময় রূপধারণ করে পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে সেই বালুকাবেলায় আবির্ভূত হলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'হে রাম তোমার মঙ্গল হোক।' পরমশৈব রঘুনাথ, ঐ শিবরূপ দর্শন করে আবার সমস্ত উপাচার সহযোগে দেবাদিদেবের পূজা করলেন এবং পূজার শেষে শিবপ্রদত্ত জলগ্রহণ করে বললেন, 'হে মহাদেব, আপনি দয়াময়, হে দেব, লোকের মঙ্গলের জন্য ও জগৎ পবিত্র করবার জন্য এই স্থানে চিরকাল আপনি অবস্থান করুন।' মহাদেব শ্রীরামের অনুরোধে লিঙ্গ রূপে আবদ্ধ হলেন, শ্রীরাম কর্তৃক পূজিত হয়েছিলেন বলে এই শৈবতীর্থের নাম হল রামেশ্বর।

শিবপুরাণে উল্লিখিত এই শৈবতীর্থকে 'পার্থিব লিঙ্গ' বলা হয়েছে। এই পুরাণের মধ্যেই আমরা 'পার্থিব লিঙ্গে'র পূজাবিধি ও স্তবমালার বর্ণনা পাই। শিবপুরাণ উল্লিখিত এই পূজাবিধি অনুসারেই সাধারণত আমরা শিবপূজা সম্পন্ন করি। কারণ প্রকৃতিতে উৎপন্ন বিশেষ চিহ্ন সম্পন্ন লিঙ্গাদি আমাদের কাছে সবসময় সহজলভ্য হয়ে ওঠে না, তাই শিব গড়ে পূজার বিধি শিবপুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

BanglaBook.org

বটুক ভৈরব

শিবপূজায় আমরা 'বটুক ভৈরবের' কথা শুনি। শিব আরাধনার আগে 'বটুক ভৈরব'দের পূজা করতে হয়। এই বটুক ভৈরবদের উৎপত্তি কাহিনী ব্যক্ত করা হয়েছে শিবপুরাণে। এই পুরাণ অনুযায়ী, দধীচি নামে এক ধর্মিষ্ঠ বেদ পরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ছিলেন শিবভক্ত ও শিবশাস্ত্র পরায়ণ। নিত্য নৈমিত্তিক কাজে তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল। দধীচির পুত্র ছিলেন সুদর্শন। সুদর্শনের দুষ্কলা নামে স্ত্রী ছিল দুষ্টকুলের মেয়ে। ফলে সে স্বামীকে নিজের মতো আচারবিহীন করে তুলেছিল। সুদর্শন সবসময় স্ত্রীর কথায় উঠত বসত। দুষ্কলা ও সুদর্শনের চারটি পুত্র ছিল। ব্রহ্মার পুত্র দধীচি যেমন শিবপূজা করতেন। দধীচি সুদর্শনকে কিভাবে কর্ম করতে হয় তা ভাল করে শেখাতে চেষ্টা করতেন। এইভাবে কিছুদিন গত হলে দধীচি ঋষি হঠাৎ আশ্রম থেকে গ্রামে গেলেন, এক গৃহস্থ তাঁকে কিছুদিন অতিথিরূপে থাকবার জন্য অনুরোধ করলে দধীচি সেই গৃহে আতিথ্য স্বীকার করলেন। তিনি পুত্রকে শিবভক্ত হতে শিখিয়েছিলেন, পুত্রও প্রতিদিন শিবপূজা করতে লাগলেন। এইভাবে একটা একটা দিন চলে গেল, অবশেষে শিবভক্তের গৃহে শিবরাত্রি তিথি উপস্থিত হল। পিতার আদেশ অনুসারে সকলে মিলে শিবরাত্রির উপবাস ও পূজা করলেন সুদর্শন। কিন্তু রাত্রের শেষ প্রহরে পূজার স্ত্রীসঙ্গ করে আচারবিহীন হয়ে, অশুচি বস্ত্রে নিষ্পন্ন করতে উদ্যত হল।

স্নান না করে পূজা সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই দেবাদিদেব তাঁকে দর্শন দান করে ভীষণ ভর্ৎসনা করে বললেন, 'হে সুদর্শন, অশুচি, অস্নাত অবস্থায় আমার পূজা করলে? ক্রিয়াকর্ম, শুচি, অশুচির জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তুমি আমার পবিত্রতা নষ্ট করলে। নিজের ভোগের প্রতি তোমার এত আসক্তি! তুমি আজ থেকে জড়ত্ব লাভ কর। তুমি আর আমাকে কখনও স্পর্শ করবে না। আমার দৃষ্টির সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।' শঙ্কর যা উচ্চারণ করলেন তৎক্ষণাৎ তা হল। সেই সময় দধীচি মুনি এসে এই ব্যাপার শুনলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে নানা ভাষায় খেদ করতে লাগলেন। সুদর্শনকে বললেন, তুমি আমার কুপুত্র, আমার কুলকে নষ্ট করেছ। আজ আমি অসহায় বোধ করছি। এদিকে যে স্ত্রীর জন্য সুদর্শন গর্হিত কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল, সেই স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হল।

স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শনের উপর থেকে কুপ্রভাব অপসারিত হল। পিতা ও শিব কর্তৃক ভর্ৎসিত হয়ে সুদর্শন এবার শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য

BanglaBook.org

শিবপূজা আরম্ভ করল। আর মৃতা পত্নীকে অভিশাপ প্রদান করল, 'তুই পরজন্মে অসতী হবি।' স্ত্রীকে যতই অভিশপ্ত করুন না কেন, সুদর্শনের পূজায় দেবাদিদেব মোটেই তুষ্ট হলেন না। সুদর্শন কিছুতেই দেবাদিদেবকে তুষ্ট করতে না পেরে শিব শক্তি গিরিজার পূজা শুরু করলেন। পূজার উপাচার সাজিয়ে কেঁদে কেঁদে বললেন, হে মাতঃ আমাকে তোমার পুত্ররূপে স্বীকার কর। আজ দেবাদিদেবের ক্রোধে আমি সব কিছু হারিয়েছি। হে মাতঃ, অধম সন্তানকে তোমার পায়ে ঠাঁই দাও। এইভাবে সুদর্শন বারবার দেবীকে প্রণাম জানালে দেবী গিরিজা 'চন্ডী' রূপে সন্তুষ্ট হলেন।

চন্ডী সুদর্শনের পূজাতে প্রসন্ন হয়ে স্বয়ং পুত্রের নিমিত্ত মহাদেবকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করলেন। তিনি বৃষধ্বজ ঈশ্বর মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে বললেন, হে চন্ডরূপী শিব, আমি তোমার শক্তি চন্ডী বা শিবা। দধীচি পুত্র সুদর্শনকে আমি নিজপুত্র রূপে স্বীকার করেছি। হে বৃষধ্বজ, আমার পুত্র তোমারও পুত্র। সুতরাং তার অপরাধ ভুলে আদর করে কোলে স্থাপন কর। এই বলে চন্ডরূপ শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য গিরিজা ঘি দিয়ে পুত্র সুদর্শনকে স্নান করালেন। ত্রিরাবৃত্ত গ্রন্থি যুক্ত উপবীত ধারণ করালেন। এর সঙ্গে ষোড়শাক্ষর শিবমন্ত্র প্রদান করলেন। শিবগায়ত্রী শিখিয়ে 'ওঁ নমঃ শিবায়ঃ' এই মন্ত্র ষোড়শবার জপ করিয়ে ষোড়শপচারে মন্ত্রোচ্চারণ করতে আদেশ করলেন। গিরিজার কথামতো সুদর্শন ব্রাহ্মণ মহাদেবকে যথাবিধির সঙ্গে পূজা করল। এর ফলে মহাদেব তুষ্ট হয়ে বললেন, হে সুদর্শন, আমি তুষ্ট হয়েছি। আজ থেকে তুমি আমার কাজে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। বিশেষতঃ চন্ড ও চন্ডীরূপে একত্র যখন আমরা পূজিত হব তখন তোমার পূজা আবশ্যিক হবে। তুমি সেখানে পূজিত না হবে সেখানে সব কাজই নিষ্ফল হবে। তুমি যেখানে থাকবে, সেখানে আমার পূজা সম্পূর্ণ হবে। এই বলে পরমাত্মা শিব, মহাত্মা সুদর্শনের চার পুত্রকে চারদিকে অভিষিক্ত করলেন এবং সুদর্শনকে উপদেশ দিলেন, তুমি সর্বদা বর্ত্তুলাকার তিলক ধারণ করবে, স্নান করবে, শিবসন্ধ্যা করবে, শিবগায়ত্রী জপ করবে। এইভাবে পূজা করে তোমার অন্যান্য কূলাচার পালন করবে। কিন্তু হে পুত্র, মনে রেখ কখনই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করবে না। শিবগায়ত্রীই তোমার যোগ্য মন্ত্র তাই তুমি পাঠ করবে। এইভাবে চন্ডী ও চন্ড শিব এইভাবে সুদর্শনকে পুত্রভাবে অনুগ্রহ করলেন। সুদর্শনের চারপুত্রের নাম হল 'বটুক'। শিব বললেন, হে বটুকগণ উভয়পক্ষের সৈন্যের মধ্যে যে পক্ষে তোমরা থাকবে, সেই পক্ষের জয় হবে। আজ থেকে তোমরা যেখানে পূজিত হবে সেখানেই আমার পূজা হবে-এতে কোনো সন্দেহ নেই। বেদমন্ত্র ব্যতীত আমি তোমাদের যথাযোগ্য আচার পালনের অনুমতি প্রদান করলাম। এইভাবে শিব ও

BanglaBook.org

শিবা কর্ত্তৃক 'বটুক' নামে সুদর্শন পুত্রেরা খ্যাত হয়েছিল। 'তপোভ্রষ্ট' থেকে তপস্যার জোড়ে দেবাদিদেবের কাছে বর লাভ করেছিল বলে এরা 'তপোধন' নামে চিহ্নিত হল।

এই থেকে বটুকের পূজা আগে করে পরে মহাত্মা শঙ্করের পূজা করতে হয়। ব্রাহ্মণ ভোজনের ক্ষেত্রে এই বটুককে ভোজন করালে অধিক ফল লাভ করা যায়। বটুক, শুভ বা অশুভ—যাই হোক না কেন। কোনোভাবেই পরিত্যাজ্য নয়। এ বিষয়ে একটি কাহিনী শিবপুরাণে বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটি এইরকম, অন্ধকেশ নগরের কাছাকাছি কোন এক নগরে ভদ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শিবপূজার 'প্রজাপত্য ব্রত' উদ্‌যাপিত করতেন। এই ব্রতের নিয়ম ছিল, প্রতিদিন সকলে উঠে ব্রত শুরুর আগে ধ্বজ উড়িয়ে দেওয়া হত। ব্রত সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হলে ধ্বজ আপনা আপনি নীচে নেমে আসত। কিন্তু ব্রত সঠিকভাবে পালিত না হলে, কোনভাবেই ধ্বজ নেমে আসত না। ভদ্র রাজাকে ব্রত সম্পন্ন করার জন্য ধ্বজটি স্বয়ং মহাদেব দান করেছিলেন। সুতরাং রাজা ভদ্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। এই ব্রতের শেষ অংশে ব্রাহ্মণ ভোজন করানোর প্রথা ছিল। রাজা ভদ্র একদিন এই ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্বেই বটুক ভোজন করালেন। বটুক ভোজন শেষ হয়ে ব্রাহ্মণেরা আহার গ্রহণ করতে বসা মাত্রই ধ্বজ আপনা আপনি পতিত হল। রাজা অবাক হয়ে ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের আহার এখনও সম্পন্ন হয়নি। এখনও ব্রত শেষ হয়নি, তবে কি করে ধ্বজ পতিত হল। এখনও উত্থিত থাকাই তো উচিত। হে ব্রাহ্মণগণ, এর কারণ কি? সত্য করে আমাকে বলুন। রাজার কথা শুনে ব্রাহ্মণগণ বললেন রাজন্, আপনি আমাদের আগেই বটুক ভৈরবকে ভোজন করিয়েছেন, তাঁরা চন্ডী ও শিবের পুত্র। তাঁরা সকলের আগে শিবপূজা করবেন এবং সকলের শেষে প্রার্থনা করবেন যে পূজা পূর্ণ হোক। এছাড়া তাঁদের আর কোন কাজ নেই। সুতরাং বটুক ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ব্রত সমাপন করেছে। তাই উত্থিত ধ্বজা পতিত হয়েছে। এইভাবে ব্রাহ্মণেরা বটুক ভৈরবদের মহিমা কীর্ত্তন করলেন।

বটুক ভৈরবদের কাহিনীতে আমরা এক অদ্ভুত বিবর্তনের ধারা দেখি। এখানে দেবাদিদেব মহাদেব ও গিরিজা দেবী চন্ড ও চন্ডীতে রূপান্তরিত। এই চন্ড ও চন্ডী দেবতা তাঁদের কাহিনী স্বরূপ বটুক ভৈরবদের পূজার অগ্রে স্থান দিলেও বেদপাঠের অধিকার প্রদান করলেন না। শিব সাধনার মধ্যে এত বৈচিত্র্য রয়েছে, এত বিবর্তনের ধারাপথ এসে মিলেছে যে ভাবতে আশ্চর্য লাগে। এই কাহিনী যে কোনো উপজাতি বা গোষ্ঠীর চন্ডী বা চন্ড পূজার স্বীকৃতি দান করা হয়েছে—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

BanglaBook.org

রুদ্রাক্ষ

শিবপুরাণে বটুক ভৈরবদের সঙ্গে রুদ্রাক্ষ পূজার বর্ণনা রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে দেবাদিদেবের চোখের জলবিন্দুই রুদ্রাক্ষ রূপ ধারণ করেছে। তাই রুদ্রাক্ষ অতি পবিত্র বস্তু। শিবপুরাণ অনুযায়ী, যে শিবনাম, ভস্মধারণ ও কল্যাণময় রুদ্রাক্ষ ধারণ করে তাঁকে দর্শন করা মাত্র প্রয়াগস্থানের ফল হয়। কোন মানুষ একাদশ পতি রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে রুদ্রতুল্যা হয়। যে ব্যক্তি শত শতার্দ্ধ বা পঞ্চসংখ্যক রুদ্রাক্ষের মাধ্যমে মুকুট তৈরি করে ধারণ করে, সে স্বয়ং শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ঐ মালায় নিত্য জপ করে, তাঁর শত নাম জপে সহস্র নাম জপের ফল হয়। যে কোন দেবতার ভক্তই রুদ্রাক্ষ মালায় ফললাভ করে। ভোগার্থী, পুত্রার্থী, বিদ্যার্থী, ধনার্থী, কন্যার্থী, যশোর্থী—এমন কি মুক্তিকামীরা নিরন্তর এই ইষ্টমন্ত্র জপ করলে তা ফলপ্রদ হয়। দেবতাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে প্রীতি। অর্থের দেবী লক্ষ্মী সুবর্ণগুলিকা দিয়ে জপ করলে খুশী হন। সূর্য্যমন্ত্র জপে স্ফটিক মালা শ্রেষ্ঠ। চন্ডী মুক্তা ও প্রবাল মালায় প্রীত হন। গণেশ প্রবাল মালায় তুষ্ট। বিষ্ণু আবার মুক্তাযুদ্ধ রুদ্রাক্ষে বিশেষ সন্তুষ্ট হন। বাস্তবে রুদ্রাক্ষ একটি ফল বিশেষ হলেও ব্যাসাদি ঋষিরা শাস্ত্রবিচার করেই বিভিন্ন রকমের রুদ্রাক্ষকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুভদায়ক বলে চিহ্নিত করেছেন। একমুখী রুদ্রাক্ষ সকল সিদ্ধিদায়ক। যে স্থানে ঐ রুদ্রাক্ষ অবস্থিতি করে, সেইস্থানে অষ্টসিদ্ধি সর্বদা বিরাজমান। দ্বিমুখী রুদ্রাক্ষ থাকলে লক্ষ্মী নিকটবর্তীনি হন। যে স্থানে তিনমুখ রুদ্রাক্ষ, সেখানে সকল বিদ্যা অধিষ্ঠিত হন। চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষ চতুবর্গ ফল দান করেন। যেখানে পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ সেখানে পাপ ধ্বংস হয়। কিন্তু একমুখী রুদ্রাক্ষ দুর্লভ, সেই রুদ্রাক্ষ যদি কুলফলের মতো হয় তাহলে সুখ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে। যে রুদ্রাক্ষ আমলক সদৃশ, সেই রুদ্রাক্ষ সব রকমের বিঘ্ন দূর করে। ছোট ও গোল রুদ্রাক্ষ শুভ ফলদায়ক ও বহুমুল্য। রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করলে অবশ্যই তার মূল্য দিতে হয়। মূল্য দান না করলে সেই মালা বিপরীত ফল দান করে। পণ্ডিতদের মতে রুদ্রাক্ষ যত ক্ষুদ্র হবে, ততই বেশি ফলদায়ক হবে।

যে একমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, তার জলনিমজ্জনে ভয় থাকে না। যে দ্বিমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, তার অগ্নি ভয় থাকে না। ত্রিমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে শস্ত্রঘাতাদির ভয় নিবারণ হয়। চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষধারী ঘরে চোর ঢুকলে, সেই চোর অন্ধ হয়। শুভচিহ্নযুক্ত চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষ জলে ফেললে ডুবে যায়। পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষধারীর সব রকমের অনর্থ নষ্ট হয়। রুদ্রাক্ষ ধারণের এই রকম ফল জেনে ধর্মবৃদ্ধির আশঙ্কায় রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করবে। কেবল জনম মরণাশৌচের সময় মল মূত্র ত্যাগের সময় ও ভোজনকালে রুদ্রাক্ষ ধারণ করা অনুচিত। স্নান সময়ে জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পনকালে বিষ্ণু ও শিবপূজায় রুদ্রাক্ষ ধারণ আবশ্যিক। সুতরাং শিবপূজার সঙ্গে রুদ্রাক্ষ ও বটুক ভৈরব ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

BanglaBook.org

সোমেশ্বর

নৈমিষারণ্যে ঋষিরা সুতকে বললেন, হে সুত, তুমি আমাদের জ্যোতির্লিঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনা কর। ঋষিদের অনুরোধে সূত সোমেশ্বর লিঙ্গের কাহিনী বর্ণনা করতে লাগলেন। শিবপুরাণ অনুযায়ী দক্ষের সাতাশটি কন্যা ছিল। প্রজাপতি দক্ষ তাঁদের সঙ্গে চন্দ্রের বিবাহ প্রদান করলেন। সাতাশ জন স্ত্রী লাভ করেও চন্দ্র কিন্তু একজনের প্রতি আসক্ত হয়ে রইলেন। চন্দ্রের সাতাশ কন্যার মধ্যে রোহিনী ছিলেন সব থেকে সুন্দরী। চন্দ্র রোহিনীর প্রতি বেশী অনুরক্ত হলেন, এর ফলে দক্ষের অন্য মেয়েরা দুঃখিত হলেন। তাঁরা পিতার কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন, 'হে পিতা, আপনি আমাদের কার সঙ্গে বিবাহ দিলেন? তিনি কীর্তি ও সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হলেও কেবলমাত্র রোহিনীর প্রতি পক্ষপাত করেন। এর ফলে আমাদের জীবন একপ্রকার পতিহীন হয়ে রইল। আপনি এর প্রতিকার করুন।'

পিতা দক্ষ তাঁদের কথা শুনে চন্দ্রের কাছে উপস্থিত হলেন। চন্দ্র তাঁর যথাযথ অভ্যর্থনা করলে, তিনি চন্দ্রকে বলতে লাগলেন, 'হে কলানিধে। নির্মল কুলে তোমার জন্ম, আশ্রিতদের প্রতি তোমার পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়, তাদের প্রতি সমানভাবে রাখা উচিত।' জামাতাকে তাঁর ব্যবহারের প্রতি সচেতন করিয়ে দিয়ে দক্ষ নিশ্চিন্ত মনে নিজ গৃহে গমন করলেন। কিন্তু বিমূঢ় চন্দ্র, মোটেই তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন করলেন না। আসলে যখন যার শুভ হবে, তখন সে শুভ রোধ করা কারও সাধ্য নয় এবং যখন যার অশুভ হবে, তখন তাও কেউ খণ্ডন করতে পারে না। সেই জন্য চন্দ্রও অবশ্যম্ভাবী ফলের বশবর্তী হয়ে শ্বশুরের বাক্য রক্ষা করলেন না। রোহিনীতে আসক্ত হয়ে অন্যান্য স্ত্রীকে অবজ্ঞা করতে লাগলেন। তখন দক্ষ অতি দুঃখিত হয়ে আবার চন্দ্রের কাছে এলেন এবং চন্দ্রকে বললেন, শোনো চন্দ্র, তোমাকে অনেকবার অনুরোধ করেছি, তা তুমি অবজ্ঞা করেছ। আমি তোমায় অভিশাপ দিলাম আজ থেকে তুমি ক্ষয়রোগগ্রস্ত হও।' গুরুজনের কথা অমান্য করার জন্য তুমি ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁর সুন্দর চন্দ্রমা মলিন হয়ে গেল, তিনি মলিন ও রুগ্ন দেহ নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। কি করি, কোথায় যাই, কিভাবে এই রোগ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি। চন্দ্রের ক্ষয়রোগ হলে দেবতা, প্রাচীন ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরাগণ দুঃখিত হলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে বলতে

BanglaBook.org

লাগলেন, হায় পৃথিবীর সুষমাই নষ্ট হয়ে গেল। চন্দ্র বিনা শোভা নেই। কি করলে চন্দ্রমা রোগমুক্ত হতে পারে? এইভাবে দুঃখিত ঋষি ও দেবগণ চন্দ্রের অনুরোধে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। সকল কথা বৃত্তান্ত জানতে পেরে ব্রহ্মা বললেন, চন্দ্র ত অতি মন্দস্বভাব, কিন্তু দক্ষ এ কাজ করলেন কেন? পূর্বে এই দুষ্ট চন্দ্র অনেক মন্দ কর্ম করেছে।' ব্রহ্মার কথা শুনে ঋষিগণ বললেন, 'চন্দ্রের পূর্বকর্ম কি ছিল, যা সকলের বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হয়েছে?' ঋষিদের প্রশ্নে ব্রহ্মা উত্তর দিলেন, 'হে ঋষিগণ, এই দুষ্ট চন্দ্র বৃহস্পতির পত্নীর তারাকে হরণ করেছিলেন। এই অকার্য্য করেও চন্দ্র লজ্জিত হলেন না। দৈত্যদের সঙ্গী করে তিনি দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমি ও অত্রি ঋষি তারা গ্রহণ করতে নিষেধ করলে তবে চন্দ্র তারাকে ফিরিয়ে দেন। বৃহস্পতিও তারাকে গর্ভবতী জেনে গ্রহণ করতে স্বীকার করলেন না। তিনি বললেন, তারা যদি গর্ভত্যাগ করতে পারে, তবে তাঁকে গ্রহণ করব। হে ঋষিগণ! তখন আমি তারার গর্ভত্যাগ করিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, এই গর্ভ কে সৃষ্টি করেছে?' তারা উত্তর দিল, চন্দ্র,। এর পরে বৃহস্পতি তারাকে গ্রহণ করে। —এইরকম চন্দ্রের বহু খল কর্ম রয়েছে। কিন্তু এখন সে সব কথা ব্যক্ত করে কি হবে? দক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভের জন্য চন্দ্র প্রভাস ক্ষেত্রে মঙ্গলপ্রদ, লোককর্ত্তা, দেবদেব দ্যুতিমান শিবকে আরাধনা করুক। শিব প্রসন্ন হলে তার ক্ষয়রোগ নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে। ব্রহ্মার মুখে এই কথা শুনে ইন্দ্রাদি দেবতা ও পুরাতন ঋষিরা চন্দ্রকে নিয়ে প্রভাসে গমন করলেন। চন্দ্র সেখানে সরস্বতী নদী তীরে একটি গর্ত নির্মাণ করে সেখানে তীর্থ সকলকে আবাহন করে পার্থিব লিঙ্গ মৃত্যুঞ্জয়ের পূজা করতে লাগলেন।

এইভাবে চন্দ্র ছয়মাস 'মৃত্যুঞ্জয়' মন্ত্রের মাধ্যমে বৃষধ্বজ শঙ্করকে পূজা করলেন। ছয়মাসে চন্দ্র দশকোটি মন্ত্র জপ করলেন। তখন লোক মঙ্গলকারক ভগবান বৃষধ্বজ শঙ্কর প্রসন্ন মনে চন্দ্রকে বললেন, 'হে চন্দ্র! বর প্রার্থনা কর, তোমার যা ইচ্ছা হয়, সেই বরই আমি প্রদান করব। চন্দ্র দেবাদিদেবের কথা শুনে বললেন, 'হে দেবেশ! যখন আপনি প্রসন্ন হয়েছেন, তখন আমার কিছুই অসাধ্য নেই। তবুও আমি প্রার্থনা করছি, দক্ষের অভিশাপে আমার শরীরে যে ক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে। তা আপনি নিবারণ করুন। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, শুভ ফল প্রদান করুন।' চন্দ্র এইভাবে আকুতি করলে শিব বললেন, 'হে চন্দ্র! কৃষ্ণপক্ষে তোমার কলার প্রতিদিন ক্ষয় হবে। শুক্লপক্ষে সেই কলার নিরন্তর বৃদ্ধি হবে।' মহাদেব এই বর প্রদান করলে দেবতা ও ঋষিগণ আনন্দিত হলেন। তারা চন্দ্রকে আশীর্বাদ করে ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা করলেন, 'হে স্বামিন্! উমার সঙ্গে আপনি চন্দ্রের তপস্যাস্থলে অবস্থিতি করুন। চন্দ্রযজ্ঞের মাধ্যমে তাঁর প্রতিষ্ঠা করলেন। চন্দ্রের

BanglaBook.org

অনুরোধে দেবাদিদেব নিরাকার হয়েও সাকার হলেন এবং সেই ক্ষেত্রকে উত্তম যজ্ঞীয় স্থান রূপে চিহ্নিত করবার জন্য এবং চন্দ্রের যশের জন্য চন্দ্রেরই নাম অনুসারে সোমেশ্বর নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হলেন। এইজন্য ধন্য ও কৃতকৃত্য, যেহেতু শঙ্কর তারই নামে জগৎ পবিত্র করার জন্য পৃথিবীতে অবস্থান করছেন।

এই পাপনাশক তীর্থে চন্দ্রকুণ্ড স্থাপন করলে মহাদেব জানালেন, এই পাপনাশক প্রসিদ্ধ চন্দ্রকুণ্ডে যে স্নান করে, সে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয় ও তার দুরারোগ্য রোগের উপশম হয়। এই কুণ্ডে ছয় মাস স্নান করলে অসাধ্য রোগও নষ্ট হয়। এমনকি কুষ্ঠের মতো ক্ষতও সুস্থ হয়ে যায়। প্রভাসতীর্থ প্রদক্ষিণ করলে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল পাওয়া যায়। ঋষিরা ও দেবতারা এইপ্রকার তীর্থ ফল অবলোকন করে চন্দ্রের সঙ্গে সহর্ষে শিবকে প্রণাম করে, সেই তীর্থ প্রদক্ষিণ করলেন এবং প্রশংসা করতে করতে স্বস্থানে গমন করলেন। এই তীর্থ কথা যে শ্রবণ করে সে পাপমুক্ত হয়। দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে এই লিঙ্গ অন্যতম।

শিবপুরাণে বর্ণিত এই কাহিনির মাধ্যমে শৈবতীর্থ প্রভাসের উৎপত্তি বর্ণনা করা হলেও, শিবের চন্দ্রশেখর রূপটি নিয়ে কিন্তু বহু কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। শিবের জটায় শোভা পাচ্ছেন দ্বিতীয়ার একফালি চন্দ্র। এই চন্দ্রকে মস্তকে ধারণ করে দেবাদিদেব হয়েছেন চন্দ্রশেখর। স্তবমালায় তাই দেবাদিদেবকে বন্দনা করে বলা হয়েছে, 'চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম'—হে চন্দ্রশেখর আমাকে রক্ষা কর। রক্ষা কর। চন্দ্রের রোগমুক্তির জন্য দেবাদিদেব তাঁকে জটায় ঠাঁই দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে পৌরাণিক সূত্র নেই, লোককথা থেকে তাকে গ্রহণ করা হয়েছে।

শোনা যায়, শিবপুত্র গণেশ খুবই পেটুক ছিলেন। ভক্তের প্রদত্ত লাড্ডু একদিন এত বেশী পরিমাণে গ্রহণ করলেন যে গণেশ বাবাজীর পেটে আর ধরল না। পেট ফেটে লাড্ডুগুলি মাটিতে গড়াগড়ি খেতে থাকল। গণেশ একহাতে পেটটি ধরে অন্য হাতে লাড্ডুগুলি আবার তুলতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে আকাশের চাঁদমামার পেল ভারি হাসি। তিনি ফিক্ করে হেসে ফেলতেই গণেশ গেলেন রেগে। এত বড় সাহস!' পার্বতী তনয় গণেশের পেটফাটা দেখে হাসি! রক্তবর্ণের মুখ রেগে আরও লাল হয়ে উঠল। উমার আদরের পুত্র চন্দ্রের উপহাস সহ্য করতে পারলেন না। কিন্তু এক হাতে পেট ধরা, কি করে অস্ত্র সংগ্রহ করবেন। অবশেষে রাগের চোটে এক দাঁত ভেঙে ফেললেন গণেশ, সেই থেকে তিনি হলেন একদন্ত। নিজের ভাঙা দাঁতটি চাঁদের দিকে ছুঁড়ে মারতেই চাঁদ পড়লেন মুশকিলে। গণেশের ক্রোধ থেকে এবার রক্ষা পাবেন কি করে?চন্দ্র ভয় পেয়ে ছুটতে লাগলেন। পিছনে পিছনে চলে গণেশের ভাঙা দাঁতের টুকরো। চন্দ্রদেব বহুক্ষণ পালাতে চেষ্টা

BanglaBook.org

করে অবশেষে ধ্যানমগ্ন শিবের কাছে উপস্থিত হলেন। 'হে, দেবাদিদেব। আপনার পুত্র গণেশ আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আপনি আমায় রক্ষা করুন।' গণেশের দুষ্টুমির কথা শুনে ধ্যানগম্ভীর দেবাদিদেবের ঠোঁটের কোণায় মৃদু হাসি খেলে গেল। তিনি দ্বিতীয়ার চাঁদকে নিজের জটায় স্থান দিয়ে আবার ধ্যানমগ্ন হলেন। সেই থেকে চাঁদ শিবজটাকে উজ্জ্বল শোভায় আলোকিত করে রইলেন। শিব সন্নিধানে থাকার ফলে গণেশ আর চন্দ্রকে স্পর্শ করতে সক্ষম হলেন না। চাঁদ আর গণেশের দ্বন্দ্বের ফলেই চন্দ্রশেখর শিবের সৃষ্টি হল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পুষ্পবাহন

পুরাকালে রথন্তর নামে কোন এক কল্পে পুষ্পবাহন নামে এক রাজা ছিলেন। সূর্যসদৃশ্য তেজস্বী রাজা দেবাদিদেব মহাদেবের মহাভক্ত ছিলেন তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব এক অদ্ভুত সোনার পদ্ম দান করেছিলেন। এই পদ্মের শোভা ও গুণ বিচিত্র। দেখতে পদ্মের মতো হলেও এটি একটি বায়ুযান। এই পদ্মকে বাহন করে যেখানে খুশি গমন করা যায়। রাজা সেই পদ্মকে বাহন করে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এবং সপ্তদ্বীপে বিচরণ করতে লাগলেন। পুষ্পকে বাহন করেছিলেন বলে রাজা পুষ্পবাহন নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। কল্পপ্রারম্ভে পুষ্করবাসী সেই রাজার নামেই সপ্তদ্বীপের অন্যতম দ্বীপ পুষ্কর তীর্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুষ্কর তীর্থ হিন্দু ভাবনায় অতি পবিত্র স্থান।

পুষ্পবাহন রাজার রাণী ছিলেন লাবণ্যবতী। মহাদেবের পাশে যেমন পার্বতী শোভা পান, ঠিক তেমনি পুষ্পবাহনের পাশে লাবণ্যবতী শোভা পেতেন।। পুষ্পবাহনের ছিল অযুত সংখ্যক পুত্র। তাঁরা প্রত্যেকেই ধনুর্ধারী ও ধর্মাত্মা। রাণী ও অসংখ্য পুত্র নিয়ে রাজা ত্রিজগতের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। নিজের অদ্ভুত বাহন, অপূর্ব লাবণ্যময়ী স্ত্রী ও অসংখ্য পুত্রকে দেখে পুষ্পবাহন মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যেতেন। একদিন প্রচেতা মুনির সঙ্গে দেখা হতে পুষ্পবাহন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে মুনিবর, বিধাতা কি জন্য আমার অল্প তপস্যায় তুষ্ট হয়ে সেই রকম স্ত্রী, অদ্ভুত বিভূতি, পদ্মবাহন, পদ্মের মতো গৃহ প্রদান করেছিলেন। আমার কোন কোন সময় মনে হয় আমার পূর্ব জন্মের কর্মফলের দরুণ এই সব সম্ভব হয়েছে। এ জন্মে আমি এমন কিছু করিনি যার পুণ্যে এত সমৃদ্ধি হতে পারে। যদি কর্মফলের জন্যই সমৃদ্ধি হয়ে থাকে তবে আমায় আমার পূর্বজন্মের পুণ্যকথা ব্যক্ত করুন।'

রাজার কৌতূহল দেখে প্রচেতা মুনি তাঁকে বললেন, 'হে পৃথিবীপতে, আগের জন্মে তুমি ব্যাধকুলে উৎপন্ন হয়েছিলে। সেই জন্মে তোমার মন ব্যধের মতোই নির্দয়, নিষ্ঠুর ছিল। লোকহিংসায় তোমার দিন কাটত। পূর্বজন্মে তোমার পিতামাতা, পুত্র-কন্যা কেউ ছিল না। কেবল ভার্য্যা ছিল। তোমার যেখানে বাস করতে সেই স্থানে একবার দারুণ অনাবৃষ্টি হল। জলের হাহাকারের সঙ্গে আহারের অভাব দেখা দিল। তোমার আহারের অভাবে পীড়িত হয়ে নানা স্থানে গমন করলে, কোথাও একটু বুনোফলও জুটল না। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে

BanglaBook.org

তুমি পদ্মবহুল এক সরোবর দেখতে পেলে। সেখান থেকে প্রচুর পদ্ম সংগ্রহ করে অবিমুক্ত নামে এক নগরে উপস্থিত হলে। সেই নগরে ফুলগুলি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বহুক্ষণ ব্যয় করলে। কিন্তু কোথাও একটি ফুলও বিক্রি হল না। স্ত্রীর সঙ্গে সমস্ত পুরী ভ্রমণ করলে, অবিমুক্ত শিবের পুরী। ক্লান্ত অসহায় হয়ে তোমরা সেই নগরেরই এক স্থানে বসে রইলে। গভীর রাত্রে মঙ্গলধ্বনি তে মন্দির মুখরিত হল। তোমরা সেই মঙ্গলধ্বনি শুনে আনন্দিত হলে। তীর্থমাহাত্ম্যের ফলে তোমরা বুঝতে পারলে সেই তীর্থ গন্ধর্ব, কিন্নর, বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাঁদের হৃদয় পদ্মকোশে মহাদেবকে ধারণ করে রয়েছেন। তখন তোমার ও তোমার স্ত্রীর শিবের প্রতি ভক্তি হল। তোমরা ভাবলে, এই পদ্মগুলো নিয়ে কি হবে? এগুলো দিয়ে শম্ভুকে অর্চনা করা যাক্। —এইভেবে তোমরা অবিমুক্ত নগরবাসী মহাদেবকে পদ্মফুল দিয়ে পূজা করলে। এক অদ্ভুত অনুভূতিতে তোমার মন পূর্ণ হল। সেই রাত্রে তোমরা দুজনে আর বাড়িতে ফিরে গেলে না। সমস্ত রাত্রি মন্দিরে কাটিয়ে পরদিন ভোর বেলায় ভক্তি সহকারে মন্দির পরিষ্কার করলে। সুগন্ধ দিয়ে মন্দির লেপন করলে। মধ্যাহ্নে অনাহারে কিন্তু শান্তিতে তুমি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে তোমার স্ত্রী তোমার মৃতদেহে অগ্নিপ্রয়োগ করল। তুমি ব্যাধ হয়েও মহাদেবের পূজার জন্য পুষ্পদান করেছিলে বলে দেবাদিদেব এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মা তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। হে, পুষ্পবাহন তুমি পুষ্করতীর্থ ছেড়ে সেই অবিমুক্ত পুরীতে গমন কর। এক রাত্রি সেই তীর্থবাসের ফলে তোমার এত সমৃদ্ধি। সেই পবিত্র নগরীতে সমস্ত জীবন যাপন করলে তুমি মহা সৌভাগ্যের অধিকারী হবে।' —মহর্ষি রাজাকে এই কথা বললে রাজা আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে বললেন, 'হে ব্রহ্মকুলবর্দ্ধন। আপনি কি অনায়াসে আমার পূর্বজন্মের কথা ব্যক্ত করলেন। আপনার মতো সাধুর সঙ্গ মহাভাগ্যে লাভ হয়। আমি নিশ্চয়ই অবিমুক্ত বা বারাণসী তীর্থে গমন করব। পুণ্যতোয়া বরুণা, অসি ও গঙ্গার সঙ্গ মে এই পুণ্যতীর্থ বারাণসী। আমি নিশ্চয়ই সেখানে যাব।'— এই ভেবে প্রচেত মুনিকে তুষ্ট করে পুষ্পবাহন সস্ত্রীক বারাণসীতে বাস করার উদ্দ্যোগ করলেন।

অতি সুন্দর বারাণসী ধামে রুদ্রাবাস নামে এক মনোহর তপস্যা স্থল ছিল। পুষ্পবাহন সস্ত্রীক সেই রুদ্রাবাসে উপস্থিত হলেন। রুদ্রাবাস নামক সরোবরের তীরে পঞ্চায়তনদেশে মহাদেবের দক্ষিণামুর্ত্তি স্থাপন করলেন। এই দেবহ্রদের জলে স্নান করে যে পঞ্চায়তন শিবকে পূজা করবে, তাঁর আর পূর্ণজন্ম হবে না। সেইস্থানে গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, অপ্সরা, সিদ্ধপুরুষ এবং গণপতিরা অলক্ষ্যে থেকে মহাদেবকে তিনি দর্শন করলেন। বারাণসী তীর্থে এটি একটি নতুন জাগ্রত স্থানে পরিণত হল।

BanglaBook.org

এই পঞ্চায়তন বাসী শিবের পূজা যে সাধু বৈশাখী চতুর্দ্দশী তিথিতে পালন করবেন তিনি কৃত কৃতার্থ হবেন। এই মহাদেব ওঁকারেশ্বর নামেও খ্যাত। ওঁকারেশ্বরের চারিদিকে দেবতারা, ঋষিরা, রুদ্রগণ ও পাশুপত গণ বিরাজ করেন। ঐ ক্ষেত্রের আদিদেব কেশব ও স্বয়ম্ভু পূর্ব্বদিকে বিরাজ করছেন। দক্ষিণদিকে রয়েছেন কোটি রুদ্রগণ। বামদেব, সাবর্ণি, অঘোর, কপিলদেব ও দেহলাখ্যা দেবতা উত্তরদিকে রয়েছেন। এরা সকলেই ওঁকারের ধ্যানে মগ্ন।

গিরিসুতা পার্বতী মহাদেবের পত্নী রূপে কালী নামে খ্যাত হয়েছিলেন। তিনি স্বভাব ও চরিত্রগুণে পতির অতি প্রিয় হন; পুরশ্রেষ্ঠ অবিমুক্ত দেশে মহাদেব তাঁর সঙ্গে আনন্দ করেন। এইরূপে পঞ্চায়তনে শিব-কালীর মহাসুখে দিন কাটতে লাগল। একদিন কালীকে সঙ্গে নিয়ে শিব হরের আরাধনা করতে মন্দিরে উপস্থিত হলেন। শিবকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেখে গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও বিদ্যাধর গণ তাঁকে বেষ্টন করে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর মহাদেবও তাঁদের সঙ্গে নাচতে লাগলেন। লক্ষবর্ষ পরে মহাদেব নৃত্যরত হলেন। তাঁর শরীর থেকে তাই ঘাম ঝরতে লাগল। আর ঘর্মবিন্দু থেকে সৃষ্টি হতে লাগল অজস্র ভূত প্রেত প্রমথগণ। তারাও আবির্ভূত হয়ে মহাদেবের সঙ্গে নৃত্য করতে লাগল। প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁরা বিবস্ত্র হল। তাঁদের রূপ ও নৃত্য দেখে, তাঁদের সঙ্গে শিবের এই তাণ্ডব দেখে মহাকালী অবাক হলেন। তিনি শিবকে বললেন, হে বিরূপাক্ষ, আপনার এ কি রকম নৃত্য। এই নাচ দেখে আমি খুব অবাক হচ্ছি। আগে অনেক বার আপনার নৃত্য দেখেছি, কিন্তু এরকম অদ্ভুত নৃত্য কখনও দেখিনি। আপনি যখন মন্দার পর্বতে নৃত্য করেছিলেন বা কৈলাসে নৃত্যে মগ্ন হয়েছিলেন তখনও আপনার এই রূপ আমি দেখিনি। এই স্থানে ব্যতিক্রমের কারণ কি আমাকে বলুন।' পরমেশ্বর শিব মহাদেবীর কাছে এই প্রশ্ন শুনে একটু হাসলেন, তাঁর হাসিতে ফুটে উঠল মমতার চিহ্ন। তিনি দেবীর মুখপদ্ম দুই হাতের তালুতে ধরে বলে উঠলেন, হে গিরিসুতে, এই স্থানে অদ্ভুত নৃত্যের কারণ আছে। হে সুব্রতে, স্বয়ং নাদব্রহ্ম লিঙ্গরূপে এই স্থানে বিরাজ করছেন। হে গিরিরাজ পুত্রী, বসুন্ধরাগর্ভে যত তীর্থ আছে তার মধ্যে এই পঞ্চায়তন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। তাই আমার এই তীর্থের প্রতি পৃথক দৃষ্টি আছে। পূর্বে মানুষ এই তীর্থে সহজেই আমাকে দেখতে আরাধনা করেছে, কেবল তারাই জানতে পারে যে, অবিমুক্তক্ষেত্রে পরম স্থান।' এইভাবে স্বয়ং মহাদেব নিজ মুখে বারানসীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

বারাণসীক্ষেত্রের মহিমা বর্ণনা করে স্বয়ং সনৎকুমার ব্যাসদেবকে বলেছিলেন, হে ব্যাস বিশাল, এই ওঁঙ্কারেশ্বরের স্তবমন্ত্র তোমাকে বলছি, এই স্তব উচ্চারণ করলে মানব মহাভয় থেকে রক্ষা পায়। ঋষি সনৎ কুমার উচ্চারিত

BanglaBook.org

স্তবমালাটি কি? সনৎকুমার বললেন, —'অবিমুক্ত-ক্ষেত্রস্থ মৃত্যুঞ্জয় পরম-যোগস্বরূপ, ওঁঙ্কারেশ্বর, শিবপদ, অনাদি, অনুৎপন্ন ও অক্ষয়। ইনি নিজেই সৃষ্টি হয়েছেন, এর স্বরূপনির্দ্দেশ করা যায় না। ইনি সকলের কারণ, ভাব ও অভাবের স্বরূপ। সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য যাঁর স্বভাব, যাঁকে চিন্তা করা দুষ্কর, যিনি মুক্তিস্বরূপ; যাঁর ভয় ও পাপ নেই। যিনি নিরপেক্ষ অনাশ্রয়। যাঁর স্তুতি নেই, নমস্কার নেই, সঙ্গ নেই, উপদ্রব নেই, বিকাশ নেই, উদ্ভব নেই, অবলম্বন নেই, মালিন্য নেই উপমা নেই। যিনি অপবর্গ স্বরূপ। যাঁর অপেক্ষা নিত্য বস্তু নেই, যিনি পবিত্র, জ্ঞানী নির্মল। যিনি সকলের আত্মস্বরূপ, অনাদি মঙ্গলময় ও ওঁঙ্কারস্বরূপ। যিনি শঙ্কাভয় রহিত এবং জ্ঞানব্যাপী ও মোচনকর্ত্তা। যিনি দশ ইন্দ্রিয়, মন অহঙ্কারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। যিনি সকল জ্ঞানের আশ্রয়, তাঁকে প্রণাম। যিনি সকল বর্ণের অতীত। যাঁর শব্দ নেই, স্পন্দন নেই, শরীর নেই, যিনি সুন্দর পরাৎপর তাঁকে নমস্কার। এই পঞ্চবক্ত্র, বৃষারূঢ়, সকলের আশ্রয়, সর্ব্বদা মঙ্গলদাতা বিরূপলোচন শূল ও জটাধারী অবিমুক্ত-ক্ষেত্রস্থিত ওঙ্কারেশ্বর মহাদেবকে নমস্কার।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শিবের সহচর ঃ নন্দী

পুরাকালে শিলাদ নামে এক বীর্য্যবান ঋষি ছিলেন ধর্মাত্মা এই ঋষির শিলবৃত্তি করে দিনযাপিত হত। একদা এই শিলাদ ঋষি শিবলোকে গমন করেছিলেন। শিবলোকে যাওয়ার সময় নিজের পিতৃলোককে নরকের উপর লম্বা হয়ে ঝুলতে দেখলেন। তাঁরা শিলাদকে দেখে বললেন, দেখ সন্ততি না থাকলে বংশলোপ হয়। তুমি পুত্রলাভের জন্য মহাদেবের আরাধনা কর। যিনি আমাদের সকলের উদ্ধারকর্ত্তা তিনিই তোমায় পুত্র দেবেন।' পিতৃপুরুষের এই কথা শুনে শিলাদ মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। দিব্য সহস্র বছর ধরে তপস্যা করলেন শিলাদ। মহাদেব তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেখা দিলে মহামুনি প্রথমেই সুন্দর স্তবে আহ্বান করলেন দেবাদিদেবকে। তিনি বললেন, হে পরমদেব মহাত্মন মহেশ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকল সুরগণের স্রষ্টা এবং ব্রহ্মার ও পতি। তুমি কামাঙ্গ নাশক এবং যোগের মূল কারণ তোমাকে নমস্কার। তুমি পর্বতবাসী, ধ্যানগম্য এবং বিধাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি ঋষিও দেবতাদের পতি; তুমি বেদ সকলের পতি; তুমি যোগীদের পতি, তুমি প্রধান এবং পরম তত্ত্ব; তোমাকে নমস্কার। তুমি ঈশ্বর এবং যোগগম্য। তোমাকে নমস্কার। তুমি মৃত্যু ও উৎপত্তির বিনাশক এবং অভীষ্টদাতা, তোমাকে নমস্কার। ভস্মতোমার অঙ্গাভরণ, তুমি তেজঃপতি ও যোগস্বরূপ। সূর্য্য, চন্দ্র, ও অগ্নি তোমার চক্ষু। অর্দ্ধচন্দ্র তোমার ললাটে বিরাজমান, তুমিই কেবল নিত্যরূপে জগতে বিরাজ করছ, তুমিই ত্রিলোকের বিধাতা, তোমাকে নমস্কার। এই জগতের স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ বলে তুমি ভক্তের, যারা তোমার স্তব করে তাদের জীবনের বিশ্রাম। হে দেব, আমরা তোমার শরণার্থী, হে বিশ্বকর্তা, তুমি প্রসন্ন হও এবং বরদান কর।

শিলাদ মুনি এই স্তবে বন্দনা করলে মহাদেব বললেন, হে ঋষিবর, তোমাকে প্রথমেই বলি, আমি তোমার স্তবে তুষ্ট হয়েছি। তাই যে ভক্ত আমাকে এই স্তবে বন্দনা করবে সে সব রকম ভয় থেকে মুক্ত হয়। রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, পন্নগ, কোন অপদেবতাই তার অনিষ্ট করতে পারবে না। এখন তুমি আমার কাছে কি বর আশা কর ঋষিবর?—মহাদেব এই কথা বললে শিলাদ ঋষি বললেন, হে ভগবন্, যদি আপনি তুষ্ট হয়ে আমাকে বর দিতে চান, তবে আপনার মতো এক অযোনিজ পুত্র

BanglaBook.org

আমাকে দান করুন।' তপস্যায় তুষ্ট মহাদেব 'তাই হোক' বলে আশীর্ব্বাদ করলেন।

তপস্যা শেষ হল শিলাদের। বর লাভ করে ফিরে এলেন নিজের আশ্রমে। অন্যান্য ঋষিদের জানালেন বরলাভের কথা। অন্যান্য ঋষিরা তাঁকে সাধুবাদ জানালেন। শিলাদ এবার আশ্রমের যজ্ঞক্ষেত্রের দিকে চললেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বহু দিন কর্ষিত হয়নি যজ্ঞভূমি। শিলাদ সেই ভূমি কর্ষণ করতে লাগলেন। ভূমিতে লাঙ্গলের ফাল প্রবেশ করতেই মাটি থেকে সূর্য্যের মতো তেজদীপ্ত এক কুমার নির্গত হলেন। উদ্ভূত কুমারের প্রদীপ্ত তেজ দেখে শিলাদ ভয় পেলেন, তিনি লাঙ্গলের ফলা থেকে রাক্ষস নির্গত হল, এই ভেবে দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। কুমার তাঁর পিছনে পিছনে 'তাত' 'তাত' করে বিনীতভাবে অগ্রসর হলেন। কুমার এই কথা বললেও শিলাদ তাকে অভিনন্দন করলেন না। ভাবলেন, এই কুমার আমাকে 'তাত' সম্বোধন করে কেন? এদিকে বায়ু সেই স্থান দিয়ে বয়ে যেতে যেতে ভাবলেন, ঋষির হল কি? তিনি নিশ্চয় শিববাণী ভুলে গিয়েছেন। বায়ু তৎক্ষণাৎ শিলাদের কানে কানে বললেন, 'ঋষিবর, দেবাদিদেবের কাছে আপনি যে অযোনিজ সন্তানের বর লাভ করেছেন এই সেই পুত্র। আপনি একে গ্রহণ করুন। বায়ুর কথা শুনে শিলাদের সম্বিৎ ফিরল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কুমারকে আলিঙ্গন করলেন। বায়ু বললেন, হে ঋষিবর, এই পুত্র আপনাকে আনন্দ দান করেছে বলে আজ থেকে এর নাম হবে 'নন্দী'। বায়ুর দেওয়া নাম অনুসারে শিলাদ পুত্রের নাম হল নন্দী।

শিলাদ নন্দীকে আশ্রমে নিয়ে গিয়ে যথাবিহিত তাঁর চূড়াকরণ করলেন নন্দীর উপনয়ন কার্য ও সুচারু রূপে সম্পন্ন হল। ঋষি শিলাদ নন্দীকে চতুর্ব্বেদের সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্বশাস্ত্র, শিল্পবিদ্যা, শকুন শাস্ত্র, প্রাণি চিকিৎসা, মাতৃচরিত, ভুজঙ্গচরিত, সমস্ত ধর্মশাস্ত্র, আট প্রকার ব্যাকরণ, পুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চযজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মাতৃতত্ত্ব, মহামন্ত্র এবং যোগশাস্ত্র—এই সমস্ত শিক্ষা দিলেন। কুমার ঋষি শিলাদের শিক্ষায় ধীরে ধীরে কার্যদক্ষ, পবিত্রাত্মা, প্রসন্নচিত্ত, প্রিয়বাদী, অহিংসক এবং চিত্ত নয়নের আনন্দদায়ক হয়ে উঠলেন।

নন্দীর যখন সাত বছর বয়স তখন ঋষি শিলাদের আশ্রমে উপস্থিত হলেন অন্য দুই ঋষির বেশধারী দেবতা। শিলাদ সেই অতি খ্যাত মিত্রাবরুণ দেবতা দ্বয়কে সমাদর করে বসালেন। মিত্রাবরুণ শিলাদ মুনিকে বললেন, 'হে, ঋষিবর, তোমার পুত্র তোমার পছন্দ হয়েছে তো? ধার্মিক ও সংযতবাক্য হয়েছে নিশ্চয়।' দেবতাদের কথার উত্তরে শিলাদ বললেন, দেবাদিদেবের দেওয়া এই পুত্র আমার বংশের গৌরব। দেবতাদ্বয়ের আশীর্ব্বাদ নেওয়ার জন্য নন্দী উপস্থিত হতেই

BanglaBook.org

মিত্রাবরুণ তাকে আশীর্ব্বাদ করে সেই স্থান ত্যাগ করতেই ঋষি শিলাদ দেবতাদ্বয়কে বললেন, হে তপঃসিদ্ধ সত্যবাদী, আপনি সকল প্রাণির গতি সম্বন্ধে অবহিত আছেন। আপনারা আমার পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন না কেন? এর পিছনে কি কোন উদ্দেশ্য আছে। দয়া করে আমার এই কৌতুহলের নিষ্পত্তি করুন।' ঋষির কথা শুনে দেবতাদ্বয় বললেন, ঋষিবর তোমার পুত্রের মাত্র আট বছর আয়ু। এখনই সে সপ্তম বর্ষের বালক, সুতরাং আর এক বছরের মধ্যে তার দেহান্ত হবে। আমরা তার দীর্ঘায়ু কামনা করি কিভাবে?—এই নিদারুণ দুঃসংবাদ দিয়ে দেবতাদ্বয় চলে গেলেন। সহস্র বছর তপস্যা করে যে পুত্র লাভ করলেন সেই পুত্রের আয়ু নেই। এক বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে তার প্রাণ। এ সংবাদ সহ্য করতে পারলেন না শিলাদ। নির্জন একাকী চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

নন্দী পিতাকে এভাবে করুণস্বরে বিলাপ করতে দেখে অবাক হলেন। তিনি ঋষির কাছে গিয়ে বললেন, হে তাত আপনি এভাবে দুঃখ করছেন কি কারণে? শিলাদ বললেন, হে পুত্র, এই দুই দেবতা আজ আমাকে বলে গেলেন, তুমি একবছরের মধ্যে প্রাণত্যাগ করবে। এই ভয়ানক দুঃখের কথা চিন্তা করে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি।' পিতার কথা শুনে নন্দী বললেন, 'পিতা, আপনি দুঃখ করবেন না। চিন্তাও করবেন না। কি দেবতা, কি দানব, কি যম, কেউ আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' নন্দীর কথা শুনে শিলাদ বললেন, হে পুত্র, তুমি কি তপস্যা, কি যোগ, কি বিদ্যা লাভ করেছ। কাকে আশ্রয় করেছ যে দারুণ মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে? নন্দী বললেন, হে, পিতা মৃত্যুকে কোন বিদ্যা দিয়ে নিবৃত্ত করা যায় না। মহাদেবের অনুগ্রহে আমার জন্ম, মহাদেবের অনুগ্রহে আমি মৃত্যুকে জয় করব। এক্ষেত্রে মহাদেব ব্যতিত কেউ রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না। আমি পিনাকী মহাদেবকে দর্শন করব, তিনি আমার মৃত্যুকে জয় করবেন।' নন্দীর কথা শুনে ঋষি শিলাদ কাতরভাবে বললেন, পুত্র তুমি এ কি বললে। আমি সহস্র বছর তপস্যা করে তবেই মহাদেবের দর্শন লাভ করেছি। তুমি এই এক বছরে কি করবে? তিনি সাধন লভ্য, এমনিতে তাকে কি লাভ করা যায়।' নন্দী শিলাদ মুনির এই কথার উত্তরে বললেন, পিতা, দেবাদিদেবকে তপস্যা দিয়ে তুষ্ট করা যায় না। ভক্তি ও ভালবাসা দিয়েই তাঁকে লাভ করতে হয়। তাঁকে কি উপায়ে লাভ করতে হয় তা আমি জানি। আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এখুনিই তপস্যার জন্য নির্গত হব। আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন। দেখবেন কিছুদিনের মধ্যেই আমি সফল হয়ে ফিরব, পিতা আপনার কোন চিন্তা নেই। মহাদেবের কৃপায় আমার আর জন্মও হবে না, মৃত্যুও হবে না। হে পিতা, মৃত্যু কাউকে অপেক্ষা করে না। কি শায়িত, কি ধাবিত,

BanglaBook.org

কি পতিত যে কোন অবস্থাতে সে মানবের জীবন ছিনিয়ে নিতে পারে। কিন্তু মৃত্যু আমার কিছুই করতে পারবে না। যদি সে শতকোটি যম দণ্ড ও পাশ দিয়ে আমার পিছনে ধাবিত হয় তবুও সে আমার কিছু করতে পারবে না। কারণ, আমি জলে মগ্ন হয়ে শতরুদ্রীয় অধ্যায় জপ করব। আপনি আমায় তপস্যার জন্য অনুমতি দিন।' নন্দীর কথা শুনে শিলাদ চোখের জলে বিদায় দিলেন। নন্দী চললেন তপস্যার উদ্দেশে।

পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নন্দী উপস্থিত হলেন ভুবনা নদীর তীরে। ভুবনা নদীতে অবগাহন করে, নদীর জলে দাঁড়িয়ে একাগ্রচিত্তে পরমকারণ রুদ্রের ধ্যান করতে লাগলেন। এইভাবে জলমগ্ন হয়ে নন্দী এককোটি জপ সম্পন্ন করলেন। মহাদেব তার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভুবনা নদীর তীরে অবির্ভূত হলেন, কি বর চাই? নন্দী তাঁকে প্রণাম করে বললেন, হে দেব আমাকে আরও এক কোটি জপ করার শক্তি দান করুন।' মহাদেব তাতে সন্তুষ্ট হয়ে এক কোটি জপের বর দান দিলেন। কি বর চাও?

—কিছু না, কেবল আরও এক কোটি জপের বর চাই!—শিব বললেন, তথাস্তু। নন্দী আবার জপে মগ্ন হলেন। শিব আবার বর দান করতে উপস্থিত হলেন। নন্দী আবার একই বর চাইলেন। এইভাবে তিন তিন বার একই বর চেয়ে নন্দী তিন কোটি জপ সম্পন্ন করে কোটি সূর্যের মতো দীপ্তিমান হয়ে উঠলেন। মহাদেব তখন পার্বতী ও ভূতগণের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে নন্দীকে তাঁর দক্ষিণ হাতের স্পর্শে আশীর্ব্বাদ করলেন। তারপর বললেন, হে শিলাদ পুত্র, তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি, তুমি উত্তম সংখ্যক জপ উচ্চারণ করেছ? আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।' নন্দী বললেন, হে প্রভু! আপনি যদি আমার উপর একান্তই তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে এই বরদান করুন আমি যেন আরও এককোটি সংখ্যক জপ করতে পারি।' শিব বললেন, তার কি প্রয়োজন! আমি একান্তই তোমার উপর তুষ্ট হয়েছি, তুমি যা ইচ্ছা কর আমি তাই তোমাকে দেব। বল, তোমার কি প্রয়োজন, ব্রহ্মলোক অথবা বিষ্ণুলোক কোনটি তুমি চাও? আদিত্য বা রুদ্র হতে কি ইচ্ছা কর, বা মোক্ষ ইচ্ছা কর তুমি যা চাও তাই তোমাকে দান করব।' মহাদেব এই কথা বললেন নন্দী সেই জরা শোক হন্তা পরমেশ্বরের স্তব করে এক বিখ্যাত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন;

তুষ্টাব পরমেশানাং জরাশোকবিনাশনম।।
'নমো দেবাদিদেবায় মহাদেবায় বৈ নমঃ।
নমঃ কামাজ্ঞ নাশায় ত্রৈলোক্যহননায় চ
নমঃ কালোগ্রদণ্ডায় উগ্রদণ্ডায় বৈ নমঃ।

BanglaBook.org

নমো নীলাশিখণ্ডায় সহস্রশিরসে নমঃ
সহস্রপাণয়ে চৈব সহস্রচরণায় চ।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদায় সর্ব্বতোহক্ষিমুখায় চ
সর্ব্বতঃ শ্রুতয়ে চৈব সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতে।'

(শিব পুরানম্, সনৎকুমার সংহিতা), ৬৪/১৮-২২)

অর্থাৎ, হে দেবাদিদেব মহাদেব! তোমাকে নমস্কার। হে ত্রৈলোক্যনাশক! তুমি কামের শরীর ধ্বংস করেছে। তোমাকে নমস্কার। হে উগ্রদণ্ডধারিন্! তুমি কালেরও দণ্ডকারী, তোমাকে নমস্কার। তোমার সহস্র মস্তক, সহস্র হস্ত ও সহস্র চরণঃ তোমার সকলদিকেই হস্ত, সকলদিকেই পদ, সকলদিকেই চক্ষু, সকল দিকেই মুখ। সকল দিকেই কর্ণ; তুমি সকল কিছু ব্যাপিয়া রয়েছ। তোমাকে নমস্কার।

নন্দীর স্তব সম্পূর্ণ করে সনৎকুমার বললেন, নন্দীর কৃত এই স্তব যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠে পাঠ করে, বিশেষতঃ যে ব্রাহ্মণচতুর্দ্দশীতে পাঠ করে, সেই ব্যক্তি নন্দীশ্বরতুল্য হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি নিত্য এই শ্রেষ্ঠ স্তব পাঠ করে সংযতাত্মা হয়ে সর্ব্বদা সে মহাদেবের অর্চনা করে। তার আর বিবিধ যজ্ঞের কি প্রয়োজন? সনৎ কুমার আবার নন্দীর কাহিনি শুরু করলেন। নন্দী মহাদেবকে স্তবে তুষ্ট করলে, মহাদেব তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, হে পুত্র ভয় নেই। তোমার কোন ভয় নেই। আমার প্রসাদে আজ থেকে তোমার জন্ম জরা মৃত্যু হবে না। তুমি তোমার পিতা বন্ধু—বান্ধবের সঙ্গে শিবলোকে গমন করবে। তুমি আমার তুল্য বল বীর্য্য পরক্রম-সম্পন্ন হয়ে এবং আমার প্রধান গণপতিরূপে সর্বদা আমার পার্শ্বচর হয়ে বিরাজ করবে। নন্দীর তীব্র তপস্যায় সে এইভাবে দেবাদিদেবের প্রধান গণপতি হয়ে উঠলেন। মহাদেব তাঁকে ক্ষীরোদ সমুদ্র উপহার দিয়েছিলেন। নন্দী সেখানেই বাস করতে লাগলেন।

দেবাদিদেব মহাদেবের প্রধান গণপতি নন্দীর চেহারায় বিশেষ কতগুলি ক্ষেত্র ছিল। মহাদেব তাঁকে এক বিরল প্রজাতির পুষ্প হার প্রদান করেছিলেন। সেই পুষ্পহার পরিধান করে পরম রূপবান হয়ে উঠলেন। মালাটি কণ্ঠে ধারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তিন চক্ষু ও দশটি হাত হল। এছাড়াও মহাদেব স্বর্ণনির্মিত মুকুট এবং অমৃতকুণ্ডল দান করেছিলেন। নন্দীকে পুত্ররূপে আলিঙ্গন করে মহাদেব বলেছিলেন, হে পুত্র, যে ক্ষেত্রে তুমি উৎকট তপস্যা করলে সেই ক্ষেত্রে জপ্যেশ্বর নামে পরম বিখ্যাত হবে। এই স্থানে সিদ্ধ, চরণ ও অপ্সরাগণ থাকবে। এই ক্ষেত্রে হবে অতি গোপনীয়। এইস্থানে যে ব্যক্তি জপ করে সে রুদ্রের মতো সমতা প্রাপ্ত

BanglaBook.org

হয়। এই স্থানে মৃত হলে শিবলোকে গতি হয়। নন্দীকে আশীর্ব্বাদকালে দুটি নদীর সৃষ্টি হল। একটি নদীর নাম হল যজ্ঞোদকা এবং সুবর্ণদোকা। ভুবনা, যজ্ঞোদকা ও সুবর্ণদোকা এই তিন নদীর বহমান ধারা ত্রিস্রোতা নামে বিখ্যাত হল।

এইভাবে দেবাদিদেব মহাদেবের গণপতি হলেন নন্দী। মহাদেব ও পার্বতী তাকে স্বীকার করলেও তাঁকে সামাজিক সম্মান দিতে হবে তো! পার্বতী মহাদেবকে বললেন, প্রভু আপনি আপনার সমস্ত গণধরদের আহ্বান করুন। নন্দী এখন আমার পুত্র! একে সপ্তলোকের গাণপত্য প্রদান করুন। এবং তার সঙ্গে আপনার যত গণ রয়েছে তাদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন। গণাধ্যক্ষ রূপে নন্দীর অভিষেক এখনই প্রয়োজন। পার্বতীর কথা শুনে মহাদেব পূর্ব্বমুখ হয়ে তাঁর দিগ্বাসী অনুচরদের আহ্বান করলেন। দেবাদিদেবের আহ্বানে দলে দলে তাঁর অনুচরেরা অগ্রসর হলেন। তাদের চেহারা অদ্ভুত! কারো বর্ণ নীল, কেউ বা কৃষ্ণবর্ণের, কোন কোন গণধর শঙ্খ বা চন্দ্রের মতো শুভ্র বর্ণের। কোন কোন গণধর উপস্থিত হয়েছিলেন? প্রথমে এলেন 'ভারভূতি', তারপর 'অম্বাশিব', এই শিবপার্ষদের চেহারা বহ্নি শিখার মতো। অম্বাশিবের চার হাত, মাথায় অর্দ্ধচন্দ্র, রক্তবর্ণ শরীর, তিনি একপদ। অম্বাশিবের পর এলেন 'হর' নামে গণধর। তার বিস্তৃত উদর, সহস্র বাহু মুণ্ডমালায় শোভিত দেহ। তার সঙ্গে একই রকম দেখতে কোটিসংখ্যক সহচর। হরের পর সোম নামে মহাবলশালী এক বরদাতা গণপতি দেবদেবের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তার চারটি মুখ। সোমের পর এলেন 'মহাদেবোর্দ্ধবাহন'। এর সহস্র বাহু, একশোটি পা বিদ্যুতের মতো কেশকলাপ। এর পরে এলেন 'অজৈকপাদ' ইনি সামনে ও পিছনে দুই দিকেই হাটতে পারেন। এর পর ধীরে ধীরে এলেন, অপাদ, চন্দ্রমৌলী, শুক্ল বর্ণ নিকুম্ভ, সূর্য্যাপ্যায়ন, মহাতেজা, চন্দ্রায়ুধ, চক্রধারী। এছাড়াও এলেন ধুম্রকেশ, নন্দিক, বিশ্ববল, মনু, মহীধর, ককুদ, মেঘ, ভূতিক। একপাদ ও সপ্তশিরা দশকোটি ভূতের সঙ্গে উপস্থিত হলেন। এলেন বীরভদ্র, সৌদামিনী, মৃত্যু, যম, কাল, শতমার, মহামার, একশৃঙ্গ , পর্ব্বতাভরণ। মুখ বাদ্য বাজাতে বাজাতে কেউ বা রথে, কেউ বা নাগবাহনে উপস্থিত হলেন। কারও বাহন ভল্লুক, কারো বাঘ। কেউ সিংবাহনা। কেউ বিমান বা হাতীতে করে মুখবাদ্য বাজাতে বাজাতে উপস্থিত হলেন মহাদেবের কাছে। শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ভেরী, ডমরু, ডিণ্ডিম, বেণু, বীণা, করতাল ইত্যাদি বাদ্য বাজাতে লাগল। দেবাদিদেব কি করছেন? কি মহৎ ক্ষণ উপস্থিত হল তা দেখতে সিদ্ধ মুনিগণ উপস্থিত হলেন। তাঁরা চারিদিকে দাঁড়ালে চতুর্বেদ গণও উপস্থিত হলেন। দক্ষিণভাগে দিব্য কুণ্ডলধারী ঋগ্বেদ। পশ্চিমদিকে নানারূপধারী সামবেদ, উত্তরদিকে বহ্নিবৎ প্রদীপ্তমূর্ত্তি অথর্ব্ববেদ, পূর্ব্বদিকে বিদ্যুৎসদৃশ রূপধারী যজুর্ব্বেদ

BanglaBook.org

উপস্থিত হলেন। এর সঙ্গে এলেন বিবিধ রূপধারী পুরাণ, ইতিহাস সকল সর্বশেষে এলেন জগৎপালক নারায়ণ। মহাদেব তখন নারায়ণকে উদ্দেশ করে বললেন, হে বিভো! আপনি এই মহৎ উৎসবে যোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করলেন।' প্রমথগণ মহাদেবকে প্রণাম করে বললেন, হে দেব আজ কি বিশেষ কারণে আপনি আমাদের স্মরণ করলেন?—মহাদেব বললেন হে জগতের হিতকারীগণ, তোমাদের যে বিশেষ কারণে এখানে আমন্ত্রণ করেছি তা শোন, এই নন্দী আমার পুত্র। আজ থেকে একে গণাগ্রণীরূপে নিযুক্ত করলাম। আজ থেকে তোমাদের সেনাপতি হবেন নন্দীশ্বর।। তোমরা এখন এর অভিষেক সম্পন্ন কর।' দেবাদিদেব শঙ্কর একথা বললে গণপতিরা সুবর্ণময় সুমেরু সদৃশ দিব্য আসন তৈরি করলেন। মণিমুক্তা দিয়ে সজ্জিত হল সেই আসন। চতুরঙ্গ—শোভিত দিব্য সুবর্ণ-গঠিত মণ্ডপ তৈরী হল। সেই আসনে নন্দীকে বসিয়ে স্বয়ং মহাদেব দিব্য বস্ত্র, দিবগন্ধ দ্রব্য, মুকুট, হার, কেয়ূর, কুণ্ডল, শূল, বজ্র, ছত্র ও চামর অর্পণ করলেন। দেবতারা মহাদেব পুত্র নন্দীর গুণ-মহিমা স্তব করবে সে ভূতাদি ভয় থেকে মুক্তি লাভ করবে। যে ব্যক্তি নন্দীশ্বরকে নিত্য প্রণাম করে, সে ইন্দ্রীয় জয়ী হয় ও মন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণী হয়ে ওঠে।

এই অভিষেক অনুষ্ঠানে নন্দী কেবল সেনাপতি পদ লাভ করলেন না। মহাদেব মরুৎ—কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ ও সম্পন্ন করলেন। আনন্দিত মহাদেব নন্দীকে বললেন, পুত্র, যে স্থানে তুমি, সেই স্থানে আমি আর যে স্থানে আমি সেই স্থানেই তুমি। তোমাকে আবি বৈভ্রাজ নামক পর্বত দান করছি। ঐ পর্বত সর্ব অভীষ্ট পূরণ করে, ইচ্ছাগামী এবং দিব্য বন্যবৃক্ষে পূর্ণ। সুন্দর জলাশয়ে শোভিত। পুত্র, এই সুন্দর দিনে তুমি আমার কাছে কি বর চাও বল! তুমি যা চাইবে আজ তাই তোমাকে দেব!' নন্দী মহাদেবকে প্রণাম করে বললেন, প্রভু, যদি আমাকে আজ আপনি বর দিতেই চান তবে এই বর দিন, যাতে সর্বদা আপনার ও মা পার্বতীর উপর একান্ত ভক্তি এবং নির্ভরতা থাকে। মহাদেব বাংরবার অন্য কিছু বর রূপে গ্রহণের কথা বললেও নন্দী একই কথা বললেন, হে দেব আপনাদের উপর আমার ভক্তি থাকুক, আপনাদের বাক্যে আমার অক্ষয় ঐশ্বর্য হোক। আপনারা আমার প্রিয় হোন। আমি আপনাদের প্রিয় হই। আপনাদের সঙ্গে সর্বদা একত্রে সুখে বসবাস করতে পারি। কোনদিনও যেন আপনাদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হই।

শিব-মহিমা খ্যাপনে আমরা বারংবার দেখেছি তিনি ভক্তের অধীন। নন্দীর কাহিনিতেও সেই একই সুর ধ্বনিত হয়। নন্দী বহুবার বহু বর লাভ করতে পারতেন কিন্তু তিনি মহাদেবের কাছে কেবল তারই সান্নিধ্য কামনা করেছেন। এর

BanglaBook.org

ফলেই তিনি হয়েছেন শিবের একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার পার্শ্বচর। নন্দী কর্তৃক কৃত শিবস্তব যেমন বিখ্যাত, ঠিক তেমনি শিবের পার্শ্বগণের কৃত নন্দীর স্তবমালাও সুন্দর। নন্দীকে অভিষিক্ত করে পার্শ্বচরগণ বললেন, হে, দেব আপনি শূলী কর্ত্তৃক সন্মানিত ও সমাদৃত হয়ে আমাদের গণাধ্যক্ষ হয়েছেন। আমরাও আপনাকে অভিষিক্ত করেছি, আপনি আমাদের নায়ক ও মোক্ষদাতা। আপনি বালক হয়েও নম্র, গুণবান ও নির্গুণ। ক্ষমা, শৌচ ও দম এরকম নানা সুন্দর গুণে বিভূষিত। ভূত গণ এভাবে নন্দীকে বন্দনা করলে নন্দী ও তাদের বন্দনা করে বললেন, হে ভূতগণ! তোমরা মহাযোগী, তোমাদের নমস্কার। তোমরা বল্কল ও চর্মবস্ত্র পরিধান কর। তোমরা বহুরূপী ও দেবতেশ্বর তোমাদের নমস্কার। তোমরা মুনি, মৌনী ও বিপ্রস্বরূপ, তোমাদের নমস্কার। তোমরা শতসহস্র রূপ ধারণ করঃ তোমাদের নমস্কার। তোমরা সংযতরূপী, বায়ুরূপী, মার্জ্জাররূপী ও কালরূপী তোমাদের নমস্কার। হে জগতের মঙ্গলবিধায়ক গণ! তোমরা জলস্বরূপ, সর্ব্বদেবতাদের মধ্যে তোমরা সর্ব্বত্রগামী গ্রহের স্বরূপ তোমাদের নমস্কার।', তোমাদের দেব শরীর এবং তোমরা অগ্নি বায়ু, বরুণ, আদিত্য ও ঊনপঞ্চাশৎ-বায়ু স্বরূপ। তোমাদের নমস্কার। তোমরা বামনরূপী ও কামরূপী-নন্দীকৃত এই স্তব যে ব্যক্তি নিত্যপাঠ করে সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হয়। নন্দীকেশ্বরের অভিষেক ও মহাদেবের পার্শ্বচর হওয়ার কাহিনি শিবপুরাণে সনৎকুমার ব্যাসদেবকে এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ত্র্যম্বকেশ্বর

নৈমিষারণ্যে ঋষিদের সভা বসেছে, কাহিনিকার সূত বর্ণনা করে চলেছেন নানা শৈব প্রসঙ্গ। ঋষিরা একের পর এক শুনে চলেছেন! মহাক্ষেত্র কাশীর মাহাত্ম বর্ণনা করে সূত বললেন, হে ঋষিগণ, আমি এখন আমনাদের পাপনাশিনী-ত্র্যম্বকের উৎপত্তির কথা বর্ণনা করছি। এই ক্ষেত্র দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। পুরাকালে মহর্ষি গৌতম দক্ষিণ দিকের ব্রহ্মপর্বতে পতিব্রতা পত্নী অহল্যার সঙ্গে দশ হাজার বছর কঠিন তপস্যা করেন। ঋষি গৌতম যখন তপস্যা করছেন তখন এক দুঃখদায়ক অনাবৃষ্টির কাল এসেছিল। একশ বছর ধরে অনাবৃষ্টির ফলে, জীব জগতে প্রচণ্ড কষ্ট দেখা দিল। সামান্য তৃণও জন্মগ্রহণ করল না। কত প্রাণী যে মারা গেল তার ঠিক নেই। যারা জীবিত থাকলেন তারাও প্রায় মৃতপ্রায় হয়ে রইলেন। এই অবস্থায় মহামুনি গৌতম বরুণদেবকে তুষ্ট করার জন্য দীর্ঘ প্রাণায়াম শুরু করলেন। বরুণদেবই বৃষ্টির দেবতা, তাঁকে তুষ্ট করতে পারলেই বৃষ্টি হওয়া সম্ভব। একদিন গেল, দুদিন গেল, দেখতে ছয়মাস কেটে গেল। বরুণদেব এবার ঋষি গৌতমের তপস্যায় তুষ্ট হলেন। ঋষিকে বরদানের জন্য বৃষ্টির দেবতা বরুণ নেমে এলেন মর্ত্যে! গৌতমকে উদ্দেশ করে বললেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! কি বর প্রার্থনা কর?' গৌতম তাঁর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করলে বরুণদেব বললেন, দেখ ঋষিবর, এই অনাবৃষ্টি যে দেবতা সৃষ্টি করেছেন তাঁর আজ্ঞা ব্রহ্মারও অলঙ্ঘনীয়। আমি তা কি করে লঙ্ঘন করব?' বরুণদেবের কথা শুনে গৌতম বললেন, 'হে প্রভু, যদি আমার উপর আপনি প্রসন্ন থাকেন, তবে আমি যা প্রার্থনা করব তাই দান করুন। কারণ দেব, পরের দুঃখ দূর করাই সজ্জনের স্বভাব। মহতেরাই দুঃখের স্বরূপ বুঝতে পারে, অন্যেরা পারে না। সজ্জন সেবায় মন্দব্যক্তি ও নানা ফল লাভ করে। অন্ধকার সূর্যকে দেখলে যেমন বিনষ্ট হয়, ঠিক সেইরকম মন্দ লোক যদি সজ্জন সেবা করে তারও দারিদ্র্য দূর হয়ে যায়। যে যেরকম লোকসেবা করে, সেই কর্ম অনুসারেই তাঁর শোক দুঃখের লাঘব হয়। কথায় বলে, সিংহের মন্দিরে সেবা করলে মুক্তাফল মেলে, আর শৃগালের মন্দিরে পূজা করলে অস্থি ফল লাভ হয়— অর্থাৎ কোন শুভফলই লাভ করা যায় না। হে জলাধিপতে! সজ্জন আর কল্পবৃক্ষ উভয়েই এক প্রকৃতিসম্পন্ন। পৃথিবীতে বৃক্ষ, সুবর্ণ, চন্দন ও ইক্ষু এদেরও পরের

BanglaBook.org

প্রয়োজনে কাজ করতে দেখা যায়। তখন কোন উত্তম ব্যক্তি কি পরোপকারী হবে না? হে মহারাজ! যদি আপনার কৃপা হয়ে থাকে, তবে আমি প্রার্থনা করি আপনি শষ্যাদির উৎপত্তির জন্য মেঘজল প্রদান করুন।' ঋষি গৌতম একথা বললে বরুণদেব তাঁর উপর খুব তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, হে ঋষিবর, আপনি একটি গর্ত্ত খনন করুন। এই গর্ত্ত যখৰ জলে পূর্ণ হয়ে যাবে তখন এই ছোট্ট জলাশয়কে পূজা করে তীর্থবোধে জপ যজ্ঞ দান ধ্যান করুন। এই তীর্থে দান, হোম, জপ ও শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফল প্রসব করবে।' এই কথা বলে বরুণদেব অন্তর্হিত হলেন। তখন মহাত্মা গৌতম সেই স্থানে এক নতুন তীর্থের স্থাপন করলেন। সেখানে তিনি যজ্ঞের জন্য নতুন বৃক্ষ, পুষ্প, ধান্য, ফল, যব, ইত্যাদি রোপন করলেন। পৃথিবীতে এই তপোবনই পরম সৌন্দর্য্য ধারণ করল। বহু সৎকর্মপরায়ণ ঋষিপুত্র শিষ্য সমেত সেখানে বাস করতে লাগলেন। এইভাবে মহাঋষি গৌতমের প্রভাবে তপোবন আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠল। ঠিক এই সময়ে এক কাণ্ড ঘটল।

গৌতম একদিন কয়েকজন ঋষিকে বললেন, তোমরা জলাশয় থেকে জল নিয়ে এস। গৌতমের শিষ্য ঋষিরা জলাশয়ের কাছে আসামাত্রই সেখানে কয়েকজন ঋষিপত্নী উপস্থিত হলেন। তাঁরা বললেন, আমরা আগে জল গ্রহণ করব। আমাদের জল নেওয়া হলে তোমরা জল গ্রহণ করবে।' ঋষিপত্নীদের এই কথা শুনে ঋষিরা তাঁদের ভয়ানক ভর্ৎসনা করে উঠলেন। ঋষিপত্নীরা তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে গৌতম পত্নী অহল্যার কাছে অভিযোগ করল। অহল্যা ঋষি ও ঋষি পত্নীদের নিরস্ত করে নিজেই গৌতম ঋষির জন্য জল এনে দিলেন। এইভাবে প্রতিদিনই অহল্যা স্বামীর জন্য জল দিতেন, গৌতম সেই জলে নিত্যকর্ম সম্পাদন করতেন। অহল্যা ঋষিদের কিছু না বলায় ঋষিপত্নীরা মনে মনে খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁরা নিজেদের স্বামীর কাছে অহল্যার নামে মিথ্যা অভিযোগ করল, 'দেখ, ঋষিপত্নী অহল্যা খুবই অহঙ্কারী। সে আমাদের সঙ্গে এত দুর্ব্যবহার করে তা বলার কথা নয়। একথা সত্য যে মানুষের মধ্যে স্ত্রী লোকই মিথ্যা কটু ব্যবহারে পারদর্শী। কিন্তু ঋষিপত্নী অহল্যার এই ব্যবহারে আমরা তোমাদের আশ্রয়ে থেকেও নিরাশ্রয়। আমাদের তপস্যা কি জন্য? কেনই বা আমরা এত কষ্ট সহ্য করি? আমাদের জীবন ধিক্!' ঋষিপত্নীদের কথা শুনে ঋষিরা গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, ঋষিপত্নী অহল্যা কখনই এরকম ব্যবহার করতে পারেন না। যদিও তিনি কটু ব্যবহার করে থাকেন তবু তাঁর সম্বন্ধে কোন বিরূপভাব পোষণ করা উচিত নয়। কারণ, মহামতি গৌতমই আমাদের আশ্রয় প্রদান করেছেন। স্বামীদের নীরব দেখে ঋষিপত্নীরা আরও রেগে ওঠেন, নিত্যদিন তাঁরা ঋষিদের কাছে অহল্যার নামে নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করতে থাকে। কেবল তাই নয় অহল্যার

BanglaBook.org

সঙ্গেও তাঁরা সম্মিলিতভাবে দুর্ব্যবহার করে। অহল্যা কিন্তু স্থির, তিনি মধুর বাক্যে তুষ্ট করতে থাকেন ঋষিপত্নীদের। কিন্তু তাতে তোন ফল হয় না। স্ত্রীদের ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে একদিন ঋষিরা উপস্থিত হন গৌতমের আশ্রমে। একে একে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের পত্নীর কাছে শোনা অহল্যার প্রতি অভিযোগগুলি বর্ণনা করেন। ঋষিদের মুখে এই কথা শুনে সকলেই খুব দুঃখিত হলেন। ঋষি ও ঋষিপত্নীরা আশ্রমে ফিরে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

একদল ঋষি অন্য দলকে বললেন, দেখুন আপনারা আমাদের থেকে সাধন ভজনে উন্নত, আমরা আপনাদের উপরেই নির্ভর করি। আপনার এমন কিছু অনুষ্ঠান করুন যাতে ঋষি গৌতমের মনে তপোবিঘ্ন না ঘটে অথচ তাঁর ত্রুটিকে নির্দেশ করেই তাকে বহু ভর্ৎসনা করে তপোবন ত্যাগে বাধ্য করা যাবে। এই ছলের জন্য বিঘ্নরাজ গণপতির পূজা করা উচিত। এই আলোচনা করে ঋষিরা বিঘ্ননাশের জন্য দুর্ব্বা, চাল, ধূপ, দীপ, অসংখ্য শতদল, সিন্দুর, চন্দন, মিষ্টি নিয়ে গণপতির পূজা করলেন। তখন ভগবান পণপতি প্রসন্ন হয়ে তাঁদের বর দেওয়ার জন্য উপস্থিত হলেন। গণপতি ঋষিদের বর দিতে চাইলে ঋষিগণ বললেন, হে দেবপতে! যদি আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকেন, তবে আমরা যাতে গৌতম মুনিকে আশ্রম থেকে বিদূরিত করতে পারি সেই বর প্রদান করুন।' ঋষিরা এই বর প্রার্থনা করলে বিঘ্নরাজ হেসে বললেন, ঋষিগণ মহামুনি গৌতম নিরাপরাধ। তাঁর উপর ক্রোধ করা উচিত হচ্ছে না। এতে তোমাদেরই হানি হবে। উপকারীকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। যাঁরা উপকারীকে দুঃখ দেয় তাঁদের মহা সর্ব্বনাশ ঘটে। তোমরা যে কঠোর তপস্যা করেছ, তাতে তোমরা ভাল ফল না চেয়ে মন্দ ফল চাইছ। কাঞ্চনের বিনিময়ে কাচ গ্রহণ করছ। আমি তোমাদের ভাল কথা বললাম এবার তোমরা তোমাদের কর্তব্য নির্ণয় কর।' ঋষিরা এই কথা শুনে মোটেই নিবৃত্ত হলেন না। তাঁরা বললেন, প্রভু আমরা অন্য কিছু প্রার্থনা করি না, আমাদের এই বরই চাই।' এই কথা শুনে বিঘ্নরাজ বললেন, অসাধু কখনই সাধু হয় না। আবার সাধু কখনই অসাধু হন না। অসাধু লোক দুষ্টসংসর্গে সাধুকে দুঃখ দিয়ে থাকে। কিন্তু সাধুজন সেই দুঃখকে সুখবোধ করে দুঃখদাতাকেই সুখ প্রদান করেন। তোমরা দুষ্টপত্নীদের সংসর্গে হিতকারীর অহিত চিন্তা করছ। তোমাদের প্রার্থনা মতোই কাজ করব, এর যা হওয়ার তা হবে।' অনিচ্ছা সহকারে বর দান করে বিঘ্নরাজ চলে গেলেন। ঋষিরা বর লাভ করে আনন্দিত হয়ে উঠলেন।

এদিকে যাঁর ক্ষতি করার জন্য ঋষিরা বিঘ্নরাজের তপস্যা পর্যন্ত করলেন, সেই গৌতম মুনি কিন্তু এই দুরভিসন্ধির কিছুই জানতে সক্ষম হলেন না। তিনি মনের আনন্দে নিত্যকর্ম সম্পাদন করতে লাগলেন। মহামুনি ঋষির ক্ষেত্রে প্রচুর

BanglaBook.org

ধান ও যব উৎপন্ন হত। বিঘ্নরাজ একদিন এক শীর্ণকায় গোরূপ ধারণ করে ঋষি গৌতমের ধান্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন, এবং শস্য খেতে লাগলেন। এদিকে গরুকে শস্য ভক্ষন করতে দেখে ঋষি গৌতম তাকে ক্ষেত থেকে একগুচ্ছ তৃণ নিয়ে তাড়না করলেন, গরুর গায়ে তৃণগুচ্ছ স্পর্শ করা মাত্রই গরুটি তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করল। এই কাণ্ড দেখে অন্যান্য ঋষিরা ও ঋষিপত্নীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন, হে ঋষি গৌতম তুমি একি করলেন? গোহত্যা করলেন? ঋষি গৌতম ও অহল্যা দুজনেই তখন অবাক হলেন ভাবলেন, হায়, ভগবান মধুসূদন আমাদের উপর এত রুষ্ট হলেন কেন? আমরা কি অপরাধ করলাম যা ফলে ঋষির হাতে এ জঘন্য কাজ সম্ভব হল? এখন গোহত্যা হয়েছে এখন আমরা কোথায় যাব, কি করব! একদিকে ঋষিরা গৌতমকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, অন্যদিকে ঋষিপত্নীরা অহল্যাকে ভর্ৎসনা করলেন নানা ভাবে। কেবল তাই নয়, ঋষিপত্নীরা গৌতমকে বললেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম, তোমার জ্ঞানে ধিক, তপস্যায় ধিক, বহুদর্শিতায় ধিক, তোমার ত্রিকালীন হোমে ধিক, তোমার চাতুর্য্যে ধিক ও জ্ঞানরাশিকে ধিক, কেবল তাই নয় তোমার সমস্ত গুণরাশিকে ধিক।' তারপর নিজেরা বলাবলি করতে লাগলেন, চল এই ঋষির মুখ দর্শন করাও পাপ। এই ঋষি এই তপোবন থেকে চলে যাক। দুরাত্মা এখানে থাকলে আমাদের তপস্যার বিঘ্ন উৎপন্ন হবে'। দুষ্টু ঋষিদের কটুবাক্য শুনে গৌতম একটুও তাদের প্রতি অপ্রসন্ন হলেন না। বরঞ্চ বিনীতভাবে বললেন, আপনারা ঠিক কথাই বলেছেন, এই পবিত্র তপোবনে বাস করবার যোগ্যতা আমার নেই। আমি আমার পত্নী অহল্যাকে নিয়ে এখুনিই স্থান ত্যাগ করব।' এই বলে গৌতম এক ক্রোশ দূরে আশ্রম স্থাপন করে বাস করতে লাগলেন। তাঁর অনুগৃহীত ঋষিরা একেবারে জন্যও সেই আশ্রমে পদার্পণ করলেন না। উপরন্তু কখনও ঋষি বা ঋষি পত্নী অহল্যা তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলে তারা পাপ দর্শনের ভয়ে মুখ বস্ত্রাঞ্চলদিয়ে ঢাকা দিতেন। এইভাবে বেশকিছুদিন গেল কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটনার স্রোত অন্যদিকে ঘুরে গেল।

নিজের আশ্রম ত্যাগ করে একপক্ষ মহাদুঃখে অবস্থান করলেন ঋষি গৌতম। তারপর অন্যান্য ঋষিদের বললেন, 'হে, তপস্বীগণ, আপনার অনুকম্পা করে বলুন কিভাবে আমি এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব!' গৌতমের কথায় ঋষিরা প্রথমে মোটেই কর্ণপাত করলেন না। তারে বিদ্বেষভাব মনে মনে পোষণ করে বললেন, 'প্রায়শ্চিত্ত করাই এই পাপের থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায়। হে ঋষি গৌতম, দেহশুদ্ধির জন্য প্রথমে তোমায় সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ

BanglaBook.org

করতে হবে। কেবল প্রদক্ষিণ নয়, তার সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীতে নিজের দোষ খ্যাপন করা প্রয়োজন। তারপরে ঠিক এইস্থানে এনে কোটি পার্থিব লিঙ্গে পূজা সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু গঙ্গা আনয়ন করলেও একাদশবার ব্রহ্মগিরি পর্বত প্রদক্ষিণ করতে হবেই, তার সঙ্গে চাই দেহশুদ্ধির জন্য একশত কলসে স্নান।'

ঋষিরা যথা সম্ভব কঠিন নিয়ম প্রয়োগ করলেন, যাতে ঋষি গৌতম তা পালন করতে অসুবিধায় পড়েন। কিন্তু গৌতম ঋষি অন্য ঋষিদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। তিনি এই ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ মেনে নিলেন। তারপর শুরু হল তাঁর প্রায়শ্চিত্তের অধ্যায়। গৌতম ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করে পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করলেন। বৃষবাহন শিব তাঁর পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী পার্বতী ও তাঁর প্রমথগণের সঙ্গে উপস্থিত হলেন, ঋষি গৌতমের কাছে। ঋষি বৃষবাহন মহাদেবের সুন্দর রূপ দর্শন করে মুগ্ধ হলেন ঋষি! তাঁর কণ্ঠে পরম ভক্তিতে ফুটে উঠল স্তবগাথা, 'হে দেব হে শঙ্কর। তুমি নির্গুণ, তুমি প্রকৃতি, তুমি পুরুষ, তুমি বিষ্ণু ও ব্রহ্মস্বরূপ। তোমায় নমস্কার। হে রুদ্র! তুমি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পূজ্য, তুমি ভক্তদের সংশয় ছেদন কর। তুমি সর্বব্যাপক, হে নির্গুণ! তুমি অকার থেকে ক্ষকার পর্যন্ত বীজাক্ষর স্বরূপ। তুমি গুণস্বরূপ, তোমায় নমস্কার। হে দেব! আমায় নিষ্পাপ কর।'—এই স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ভবানিপাত মহাদেব বললেন, হে মহামুনে, তুমি ধন্য! তুমি তোমার কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করেছ। তুমি চিরকালই নিষ্পাপ ছিলে। কেবল স্ত্রীপরায়ণ এই ঋষিরা তোমার সঙ্গে ছলনা করেছে। এদের পাপ প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমেও স্খালন করা যাবে না, তুমি এত পবিত্র যে তোমাকে দেখলে লোকে পবিত্র হয়ে থাকে। তবে জানবে, যদি তোমার মনে কোন পাপের আশঙ্কা থাকে তবে আমার দর্শন মাত্রেই দূর হয়ে যাবে।' এই বলে মহাদেব সত্য ঘটনা ঋষি গৌতমকে জানালেন। দেবাদিদেবের কথা শুনে ঋষি গৌতম কিন্তু মোটেই রাগ করলেন না। কেবল বললেন, 'হে বৃষবাহন, যা আমার ভাগ্যে ছিল তাই হয়েছে। ঋষিরা আমার ক্ষতি করতে গিয়ে আমার উপকারই করেছেন। তাঁরা কৃপায় আমি আপনার দর্শন লাভ করলাম।'

ঋষি গৌতমের তপস্যায় তুষ্ট ছিলেন শিব, তাঁর উদারতায় আরো সন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন, 'হে ঋষি, যথার্থ সাধু ব্যবহার তোমার, তুমি আমার কাছে কি বর চাও বল!' দেবাদিদেবের কথায় গৌতম মনে মনে ভাবলেন, আমার পাপকর্ম আমি নিজেই পৃথিবীতে খ্যাপন করেছি। এখন এমন কিছু করে যেতে হবে যা সকলের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয়।' এই ভেবে বৃষবাহন শিবকে বললেন, 'হে, ভবানীপতি, আপনি আমাকে গঙ্গা প্রদান করুন।' ঋষি গৌতমের কথা শুনে পৃথিবীর পবিত্রতার জন্য গঙ্গাকে দান করেও যেটুকু গঙ্গা অবশিষ্ট ছিল সেই গঙ্গাকে ঋষি

BanglaBook.org

গৌতমের হাতে দান করলেন। গৌতম ঋষির হাতে গঙ্গাজল প্রদান করা মাত্রই জল এক নারীর রূপ ধরে আবির্ভূত হল। গৌতম তৎক্ষণাৎ গঙ্গাকে প্রণাম করে বললেন, হে গঙ্গে! তুমি ধন্য, তুমিই সার্থক। তুমিই জগৎ পবিত্র করলে। তুমি এখন পৃথিবীতে এসে এই পাপীকে উদ্ধার কর।' দেব শঙ্করও বললেন, গঙ্গে তুমি জগতের কল্যাণের জন্য ঋষি গৌতমকে পবিত্র করো।' গঙ্গা উত্তর দিলেন, হে শঙ্কর, আমি সপরিবারে ঋষিকে পবিত্র করবো। কিন্তু ঋষিকে পবিত্র করার পর আপনার দেহে বিলীন হয়ে যাব। ঋষি গৌতমকে পবিত্র করে এখানে আর অবস্থান করব না।' মহাদেব গঙ্গাকে বললেন, দেবী, ঋষি কঠিন তপস্যার পর আমার দর্শন লাভ করেছে। আমি এই তীর্থে বিরাজ করতে পারি, যদি সকল তীর্থের থেকে এই তীর্থের মাহাত্ম্য বেশী হয় এবং আমার সম্মুখে আপনি দেবী গৌরী ও আপনার প্রমথগণ সহ বিরাজ করেন, তবেই আমি এখানে বিরাজ করব। কিন্তু সত্যি বলছি, জগতের সকলকে পবিত্র করলেও সেই মিথ্যাবাদী অন্যায়কারী ঋষিদের পবিত্র করতে পারব না।' গঙ্গার কথা শুনে দেবাদিদেব বললেন, 'গঙ্গা, আমি তোমাকে ছাড়া নই তবু তোমাকে বলছি, যতদিন তুমি এখানে বিরাজ করবে ততদিন আমি তোমার সঙ্গে এইস্থানে বিরাজ করব। তুমি লোক কল্যাণের জন্য এইখানে অবস্থান কর।' মহাদেব এই কথা বললে গঙ্গা 'তথাস্তু' বলে বিরাজ করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে দেবতারা, পুরাণ, ঋষিরা তার সঙ্গে পুষ্করাদি পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হলেন তাঁরা গঙ্গা, গিরিশ, ও গৌতমকে সাদরে পূজা করলেন। গঙ্গাদেবী ও ভগবান শঙ্কর প্রসন্ন হয়ে তাঁদের বর দিলেন পবিত্র তীর্থাদি, পবিত্র নদীরা বললেন, 'হে গঙ্গে একাদশ বছর পরপর আমরা মানবের পাপ ধারণ করে করে মলিন হয়ে যাই। আপনি আমাদের এই মলিনতা নাশের জন্য এস্থানে অবস্থান করুন। দেবগুরু বৃহস্পতি যতদিন সিংহরাশিতে থাকবেন, ততদিন আমরা আপনাতে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করে ও ভগবানকে দর্শন করে পাপ মোচন করব।' গঙ্গাদেবী তীর্থসমুহের এই কথা স্বীকার করলেন। ফলে বৃহস্পতি যখন সিংহরাশিতে গমন করে তখন সমস্ত তীর্থ ও নদী গৌতমী তটে উপস্থিত হয়। ঋষি গৌতমের পুণ্যফলে এই তীর্থের জন্ম হয়েছিল বলে সেই তট 'গৌতমীতট' নামে খ্যাত হল। এখানে দেবাদিদেব মহাপাতকনাশী এ্যম্বক নামে জ্যোর্তিময়লিঙ্গে পূজিত হতে থাকলেন।

সরিদ্বরাগঙ্গা দেবাদিদেবের কাছে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে ব্রহ্মগিরি পর্বত থেকে আবির্ভূত হলেন। তাঁর প্রবাহ উদুম্বর বৃক্ষের শাখা থেকে নিচে পড়ল। ঋষি গৌতম মহা আনন্দ সহকারে স্নান করলেন। অন্যান্য ঋষিরা যেই সেই পবিত্র জলে স্নান করতে গেলেন, গঙ্গা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলেন। গৌতম বললেন দেবী,

BanglaBook.org

আপনি অন্তর্হিত হলেন কেন? দেবী গঙ্গা উত্তর দিলেন, 'হে, মুনিবর! এরা অতি দুর্বৃত্ত, বৃথা তাপস বেশধারী, ক্ষুদ্র ও অভিমানী। আমি এদের মুখ দর্শন করব না।' আকাশবাণী শুনে গৌতম বললেন, 'মাত, আমার কথা শুনুন, অপকারীর উপকার করাই মহতের রীতি। ভগবান দেব মহাদেব আপনাকে যে বললেন এই স্থানে থেকে মানবের পাপকে স্খালন করতে, আপনি সেই আদেশ থেকে বিচ্যুত হতে পারেন না।' গঙ্গা উত্তর দিলেন, তুমি ঠিক কথাই বলেছ, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত বিনা এদের উদ্ধার হওয়ার কোন পথ নেই। এরা একশত একবার ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ না করলে আমি এদের পাপভার লাঘব করতে সক্ষম হব না।

দেবী গঙ্গার প্রত্যাখাত হয়ে ঋষিকুলের মনে দুর্জয় ভয়ে সৃষ্টি হল। তাঁরা কি করলেন! স্ত্রীদের কথা শুনে মুনি গৌতমের প্রতি অন্যায় করলেন! নিজেদের পাপ মুক্তির জন্য তাঁরা প্রায়শ্চিত্ত করতে আগ্রহী হলেন। গঙ্গা তখন তাঁদের ক্ষমা করলেন। মহাদেব ত্র্যম্বকেশ্বর নামে সেই স্থানে চিরকাল বিরাজিত থাকলেন। সেই থেকে জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে গৌতম পুজিত ও প্রতিষ্ঠিত স্থানটিতে মহাদেব বিরাজ করতে লাগলেন।

শিবমহিমা প্রসঙ্গে অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, দেবাদিদেব মহাদেবের, স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ও জ্যোতির্লিঙ্গ এই দুই ভিন্ন প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য কি? স্বয়ম্ভু লিঙ্গ হল সেই লিঙ্গ যেখানে আপনাআপনি লিঙ্গরূপে মহাদেব আবির্ভূত হয়েছেন। আর জ্যোতির্লিঙ্গ হল সেই লিঙ্গ যেখানে কোন ঘটনার মাধ্যমে কোটি সংখ্যক লিঙ্গরূপের বা অতি নিষ্ঠাভরে দেবাদিদেবের তপস্যা করা হয়েছে। যে তার মধ্যে দিয়ে বিশেষরূপে মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রতিটি জ্যোতির্লিঙ্গের পিছনে বিবৃত হয়েছে তপস্যার কাহিনি।

স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ ও পার্থিব শিবলিঙ্গ ব্যতিত আরেক ভাবে শিবপূজা সম্পন্ন করা যায়, এইভাবে শিবপূজা সম্পন্ন করেছিলেন পঞ্চপাণ্ডবের শ্রেষ্ঠ ও মধ্যমণি অর্জুন। এই শিবপূজাকে, 'পার্থিব লিঙ্গের পূজা বলে চিহ্নিত করা হয়। পার্থিব লিঙ্গের পূজা পদ্ধতিতে পূজক নিজে মূর্তি তৈরি করে পূজা করে। পার্থিব লিঙ্গের পূজা সম্পন্ন করে অর্জুন মহাদেবের কাছ থেকে পাশুপত নামে মহাস্ত্র লাভ করেছিলেন। যা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বৈদ্যনাথ ধাম

কাকে না কৃপা করেছেন মহাদেব, দেবতা ও অসুর কোন বিভেদই তিনি রাখেন নি, যেখানেই দেখেছেন নিষ্ঠা ভালবাসা সেখানেই তিনি তাঁর কৃপাহস্ত প্রসারিত করেছেন। লঙ্কার রাজা রাবণের কথাই ধরা যাক না কেন! যাকে বধ করার জন্য স্বয়ং নারায়ণকে রামরূপে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, সেই লঙ্কার রাজা রাবণ ছিলেন শিবের মহাভক্ত। তাঁকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে জ্যোতির্লিঙ্গের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শৈবতীর্থ, এই তীর্থের নাম বৈদ্যনাথ ধাম।

রাবণ অসুর রাজ হলেও পিতা বিশ্রবা ছিলেন, মুনি কুলের অন্যতম সেই মুনির পুত্র রাবণ কৈলাস পর্বতে বহুদিন শিবের তপস্যা পালন করলেন, কিন্তু মহাদেব তাতে সন্তুষ্ট হলেন না দেখে রাজা রাবণ নতুনভাবে তপস্যা করতে শুরু করলেন। এবার তিনি বৃক্ষখণ্ডক নামে হিমালয়েরই দক্ষিণ অঞ্চলে ভুতল খনন করে নতুন আগুনের শিখা প্রজ্জলিত করলেন, তার সামনে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে হোম শুরু করলেন। ভগবান তবুও সন্তুষ্ট হলেন না। রাবণ তখন নিজের মাথা অগ্নিতে আহুতিতে দিয়ে হোম শুরু করলেন। দশমুণ্ড রাবণ ধীরে ধীরে তাঁর নয়টি মাথা অগ্নিতে আহুতি দিলেন। যখন কেবল একটি মাত্র মাথা অবশিষ্ট আছে, তখন শিব কৃপা করে তাঁকে দেখা দিলেন। মহাদেব বললেন, 'হে রাক্ষসরাজ, তোমার কি অভীষ্ট সিদ্ধ করতে হবে বল? তখন রাক্ষসরাজ রাবণ বললেন, হে দেবতা যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন তবে আমায় অতুল বল দান করুন, আর আমার যে মস্তকগুলি হোমস্বরূপ আপনার হোমে আহুতি দিয়েছি সেগুলি যেন পূর্বমত আমারই হয়!' ভক্তবৎসল ভগবান শঙ্কর এই কথা শুনে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি তোমাকে অতুল বল দান করছি, এবং, তোমার মাথায় আবার দশমুণ্ড হোক তার জন্য আশীর্ব্বাদ করছি!

রাবণের মাথায় আবার দশটি মুণ্ড স্থাপিত হল দেখে দেব মুনিগণ দুঃখিত হলেন। হায়, দুষ্ট রাবণ আরও অত্যাচারী হয়ে উঠবেন, কেউ তাঁকে আর বিনাস করার সাহস করবে না। তবে আমাদের কি হবে, রাবণের আর অসাধ্য কিছুই রইল না। দেবকুল তখন চিন্তিত হয়ে দেবর্ষি নারদের কাছে উপস্থিত হল, দেবর্ষি কি করে দুষ্ট রাবণকে বিনাশ করা যায়? নারদ দেবতাদের কথা শুনে বললেন,

BanglaBook.org

দেবগণ, তোমরা চিন্তা করো না। আমি কোন না কোন উপায় বের করছি।' দেবতাদের সন্তুষ্ট করে দেবর্ষি নারদ তাঁর বীণা বাজাতে বাজাতে চললেন সেই পথে। যে পথে দুর্দান্ত রাবণরাজ শিবের কাছে বর লাভ করে লঙ্কায় ফিরে চলেছে। নারদ তাঁর সামনে বীণা বাজাতে বাজাতে উপস্থিত হলেন। যেন খুব আনন্দিত হয়েছেন, এই রকমভঅবে বললেন, 'হে, রাক্ষসরাজ তুমি ধন্য। তুমি কৃত কৃতার্থ। তোমাকে দেখে আমার মন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠছে! কেন এ রকম হচ্ছে বল তো! তোমাকে দেখে আনন্দ হচ্ছে কেন? আর তুমিই বা কেন আজ আনন্দিত! বলি চললে কোথায়?' নারদের কথা শুনে রাবণ রাজ বললেন, হে দেবর্ষি ভালই হল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! জান, আজ আমি পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি। বহুদিনের আরাধনা আমার সফল হয়েছে, আমি দেব দেব শঙ্করের আশীর্ব্বাদ লাভ করেছি। তিনি আমাকে বরদান করেছেন।' নারদ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'রাজা রাবণ কিভাবে তুমি দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট করলে!' রাবণ বললেন, 'দেবর্ষি, সে ভয়ানক তপস্যা, তোমাদের দেবকুলের, মুনিকুলের সাধ্য নেই যে তপস্যা করার; আমি সেই তপস্যা করলাম। কিন্তু শঙ্কর তাতে প্রসন্ন হলেন না। শেষে বৃক্ষখণ্ডে বসে দুশ্চর তপস্যা করে লাভ করেছি তাঁর বর। তিনি স্নিগ্ধ হেসে আমার মাথায় সেই মুণ্ডগুলি আবার প্রতিস্থাপন করেছেন, যে মুণ্ডগুলি চন্দনে চর্চিত করে তাঁর হোমে আহুতি স্বরূপ দান করেছিলাম। আমি আজ অতুল বলের অধিকারী হয়ে ত্রিভুবন জয় করতে নির্গত হয়েছি। আর আর কেউ আমাকে পরাজিত করতে পারবে না।'

রাবণের কথা শুনে নারদ মৃদু হেসে বললেন, 'রাজা রাবণ, তুমি দেখছি খুব সরল! তুমি কি জান না শিব কখন কি বলেন তার ঠিক নেই। তুমি আমাকে বলছ মহাদেব তোমার হিতসাধন করেছেন। তুমি জান হিতসাধন কি! তুমি একথা কখনও সত্য বলে মনে করো না। কারণ শিব একেবারেই উন্মত্ত, উন্মত্তে কখন কি বলে তার ঠিক নেই। তুমি আমার প্রিয় পাত্র। তাই তোমাকে বলছি, আমার কথায় বিশ্বাস করো। এখুনি তুমি এখান থেকে ফিরে গিয়ে কৈলাস পর্বত উত্তোলনের জন্য চেষ্টা করো। যদি তুমি কৈলাস পর্বতকে তুলতে পার তবেই তোমার সব কামনার সিদ্ধি হবে। আমার কথা শোনো, প্রথমে তুমি কৈলাস পর্বতকে উত্তোলিত করবে, তারপর আবার তাকে সঠিক স্থানে রেখে দেবে! আর দেরি কোরা না। যাও, দেখবে এতে তোমার মঙ্গল হবে!

নারদের কথা শুনে বলদর্পী রাবণ ভাবলেন, সত্যদর্শী মুনি নারদ কি মিথ্যা বলবেন! কৈলাস পর্বত উত্তোলন করলে নিশ্চয় আমার ভাল হবে। নেশাগ্রস্ত

BanglaBook.org

মহাদেব কি কখন বলেন সত্যিই হয়তো তাতে নির্ভর করা যায় না! সুতরাং রাবণ চললেন কৈলাস পর্বত তুলতে।

এক সুন্দর সকালে বসে আছেন শিব ও পার্বতী হঠাৎ দুজনের কথায় ছেদ পড়ল। মহাদেব দেখলেন, কৈলাস পর্বত কেঁপে কেঁপে উঠছে। কি হল! তাঁর আবাস স্থলকে স্থানচ্যুত করার সাহস কোন দেবতা লাভ করলেন! কার দুর্মতি হল! একথা ভাবতে ভাবতেই কৈলাস পর্বত ভীষণভাবে নড়ে উঠল। পর্বতের সব বস্তু এদিক ওদিক হয়ে গেল, পার্বতী উপহাস করে বললেন, ভালই হয়েছে প্রভু এতদিনে আপনি শিষ্য লাভ করলেন বটে। শিষ্যই আপনাকে বিরক্ত করার সাহস করে! আপনার বরের কৃপায় অসীম বলযুক্ত রাজা রাবণ কৈলাস পর্বতে স্থানচ্যুত করতে উপস্থিত! পার্বতীর কথায় মহাদেব যারপরনাই ক্রুদ্ধ হলেন, পর্বতের উপর থেকে রাবণকে দেখে বলে উঠলেন, 'হে অহঙ্কারী তোমার বলকে খর্ব করার জন্য শীঘ্রই একজন জন্মগ্রহণ করবেন!' রাবণ মহাদেবের কথা শুনতে পেলেন না। মহাদেবের অভিশাপ কেবল নারদ শুনলেন।

নিজের বলে বিমোহিত রাবণ কৈলাস পর্বত উত্তোলন করে ত্রৈলোক্য জয় করতে চললেন। নারদের কথায় বিশ্বাস করে রাবণ মহাদেবের অভিশাপের ভাগী হলেন। তিনি জানতেও পারলেন না, দেবাদিদেব তাঁকে অমিত বলশালী হওয়ার বরদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার অভিশাপও প্রদান করেছেন।

বৈদ্যনাথধাম নিয়ে আরেকটি কাহিনি আমার পুরাণে দেখতে পাই। এই কাহিনি অনুসারে অসুর রাজ রাবণ ত্রৈলোক্য বিজয়ের জন্য মহাদেবের সাধনা করেছিলেন। মহাদেব তাঁর সাধনায় তুষ্ট হলে রাবণ জানালেন, তাঁর সাধের লঙ্কাপুরীতে শিবের অধিষ্ঠান যাতে হয়, দেবাদিদেব সেখানে যদি অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন তবে কারো সাধ্য নেই অসুরদের পরাজিত করার। রাজা রূপে রাবণ তাই মহাদেবের কাছে বর চাইলেন, 'হে, দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্কর, আপনি জ্যোতির্লিঙ্গরূপে আমার স্বর্ণলঙ্কায় অধিষ্ঠান করুন। মহাদেব ভক্তবৎসল, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। রাবণরাজ জ্যোর্তিলিঙ্গরূপে যখন তাঁকে ধারণ করে আনছেন তখন দেবাদিদেব তাঁকে বললেন, 'দেখ রাবণ, তোমাকে বলি। তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ বটে কিন্তু মনে রাখবে কৈলাস থেকে লঙ্কা দীর্ঘ পথ। তুমি কিন্তু পথে কোন স্থানে আমাকে নামাবে না।' রাবণ বললেন, না, কোন বিঘ্নের কারণেই আমি আপনাকে নামাব না।' মহাদেব বললেন, 'তবে তুমি আচমন করে আস আমি তোমাকে জ্যোতির্লিঙ্গ দান করছি।' রাবণ মহাদেবের কথায় চললেন

BanglaBook.org

আচমন করতে। দেবী পার্বতী যখনই তাঁকে আচমনের জন্য জল দিলেন, তখনই বরুণদেব সেই জলের মধ্য দিয়ে রাবণের উদরে প্রবেশ করলেন। রাবণ জানতেও পারলেন না। এরপর রাবণ মহানন্দে চললেন লঙ্কার দিকে আর দেবতারা চললেন নারায়ণের সন্নিধানে।

প্রভু, রাজা রাবণ মহাদেবের জ্যোতির্লিঙ্গ ধারণ করে লঙ্কায় চলেছে। সে যদি মহাদেবকে লঙ্কায় নিয়ে যেতে সফল হয় তবে দেবকুলের সমূহ বিপদ! রাবণ অত্যাচারী তাঁকে আর কেউ বধ করতে পারবে না। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।'—দেবতাদের কথা শুনে নারায়ণ বললেন, 'দেখ, দেবতাগণ তোমরা কিছু চিন্তা করো না। রাবণ কখনই দেবাদিদেবকে কৈলাসে নিয়ে যেতে পারবে না। আমি তার সমস্ত ব্যবস্থা করছি।' দেবগণকে স্বান্ত্বনা দিয়ে নারায়ণ এক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে চললেন সেই পথের উদ্দেশ্যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন রাজা রাবণ, মহাদবেকে নিয়ে চলছেন অসুর রাজ, মনে মনে ভাবছেন যত দ্রুত হোক আমাকে পৌছাতে হবে। কিন্তু গতি বারংবার মন্থর হয়ে যায়, আচমন করার পর থেকে বারে বারে মন্থর হচ্ছে গতি। বারংবার শৌচে যাচ্ছেন রাবণ রাজা। মহাদেব বলেছেন তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ লিঙ্গ কোথাও নামিয়ে রাখা যাবে না। তাই পথে কোন ব্রাহ্মণ দেখলেই তাঁর হাতে লিঙ্গ দিয়ে শৌচে যাচ্ছেন রাবণ। মনে মনে নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠছেন তিনি। কিন্তু কিছু করার নেই!

এইভাবে যেতে যেতে পথের মধ্যে যথারীতি এক ব্রাহ্মণকে পেলেন রাবণ, দেখে মনে হয় খুব আচারী, ব্রাহ্মণকে দেখে ভাল লগাল রাবণের। তিনি ব্রাহ্মণের হাতে জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপন করে বললেন রাবণ, 'হে ব্রাহ্মণ তুমি কিন্তু লিঙ্গটিকে মাটিতে রেখ না। কিছুক্ষণের জন্য হাতে ধরে রাখ। আমি যাব আর আসব।' রাবণের কথায় রাজী হয়ে যান ব্রাহ্মণ। রাবণ তাঁর হাতে লিঙ্গ স্থাপন করে শৌচে চললেন। অসুর রাজ ভেবেছিলেন তাড়াতাড়ি ফিরবেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় তা আর হলো না। প্রসাবের বন্যা বয়ে গেল তবু তার বেগের নিবৃত্তি হয় না। অবশেষে দীর্ঘক্ষণ পরে যখন রাবণ ফিরলেন তখন ব্রাহ্মণ লিঙ্গকে মাটিতে স্থাপন করে কোথায় চলে গিয়েছেন। লঙ্কায় আর জ্যোতির্লিঙ্গকে নিয়ে যাওয়া হল না। মহাদেব ওইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সৃষ্টি হল নতুন তীর্থের, এই তীর্থের নাম বৈদ্যনাথ

মহাদেবের এই তীর্থ কেন বৈদ্যনাথ নামে খ্যাত হলেন, তার পিছনে ভিন্ন গল্প আছে। শোনা যায় ব্রাহ্মণরূপী নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেবের স্থানিটি বহুদিন অবহেলায় পড়েছিল। যে ব্রাহ্মণপরিবারের উপর দেবতার পূজা সেবার ভার দেওয়া হয়েছিল তিনি সঠিকভাবে দেখাশোনা করতেন না। তখন ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে উপজাতি শ্রেণির মানুষেরা তিতিবিরক্ত ছিলেন। তাঁরা সব সময়

BanglaBook.org

ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলতেন। বৈদ্যনাথ নামে এক ভীল শ্রেণির মানুষ প্রতিদিন ব্রাহ্মণদের প্রতি ক্রোধবশতঃ কিছু উচ্ছিষ্ট জল শিবলিঙ্গের গায়ে অশ্রদ্ধাভরে ফেলে যেতেন। একদিন সেই ভীল কোন কারণে শিবলিঙ্গের গায়ে উচ্ছিষ্ট জল দিতে ভুলে গেলেন। খেতে বসে হঠাৎ যখন মনে পড়ল তখন অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। ভীল খাওয়া ছেড়ে শিবের উদ্দেশ্যে চললেন। মন্দিরের কাছে এসে শুনতে পেলেন কে যেন বলছে, 'দেখ ভীল ছেলেটি বিদ্বেষবশতঃ হলেও প্রতিদিন আমাকে মনে করে জল দিয়ে যায়। আর আমার পূজারী দিনে একবারের জন্য আমাকে মনে করে না।' কথাটি শোনামাত্র স্তব্ধ হয়ে গেলেন ভীল ছেলেটি, কিন্তু তিনি কি করেছিলেন! মানুষের উপর রাগ করে দেবতাকে অবমাননা করছিলেন। দুঃখিত হন ভীল যুবক। ক্ষমা করবেন কি দেবতা! আজ উচ্ছিষ্ট জল নিয়ে যান না, তার পরিবর্তে তুলে নেন নানা পূজার উপকরণ। আজ তিনি পূজা করবেন মহাদেবের, দেখবেন ব্রাহ্মণের হাতে যিনি পূজা গ্রহণ করেন, তিনি ভীলের হাতে পূজা নেন কি না।

পূজা করে দাঁড়ালেন ভীল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলেন মহাদেব, 'বল পুত্র তুমি কি চাও? চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে ভীল যুবকের, এত ক্ষমা! কত অপমানই না করছেন দেবতাকে। দিনের পর দিন উচ্ছিষ্ট জল দিয়ে পূজা করার পরিবর্তে অপমান করেছেন তাঁর কিন্তু দেবাদিদেবের মুখে নেই কোন অসন্তোষের চিহ্ন। মহাদেবের পদতলে লুটিয়ে পড়েন ভীল। প্রসন্ন দেবতা বলেন, 'কি চাও পুত্র? কি প্রয়োজন তোমার? আমার কাছে বর গ্রহণ করো। 'ভীল যুবক বলেন দেবতা যদি সত্যিই প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে আজ থেকে এই স্থানে বিরাজ করুন। আপনার এই ক্ষমা সুন্দর রূপটি যেন আমরাও পূজার অধিকারী হই। আর আজ থেকে আপনি যদি আমার নামে পরিচিত হন, তবে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব।

ভক্তের কথা রাখলেন মহাদেব। সেস্থানে বিরাজিত হলেন চিরদিনের মতো। আর তাঁর নাম হল বৈদ্যনাথ বা বৈজুনাথ। আজও বৈদ্যনাথ ধামে সব বর্ণের মানুষ পূজার অধিকারী। মহাদেব সকলের জন্য নিজের দুয়ার উন্মুক্ত করেছেন। মহাদেবের সঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতির যে মেলবন্ধন আমরা দেখতে পাই, সেই মেলবন্ধনের আরেকটি নিদর্শন হল বৈদ্যনাথ ধাম। আজ বিহারের দেওঘরে বৈদ্যনাথ বিরাজ করছেন। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম।

আমরা আলোচনার মধ্যে পার্থিব শিবলিঙ্গের কথা বলেছিলাম, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা করেছিলেন। তিনি গভীর অরণ্যে কেবল মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে পার্থিব শিবলিঙ্গের আরাধনা করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ

BanglaBook.org

আমরা, আমরা তো বনে যেতে পারব না, আমাদের জন্য দ্বাদশ শিব লিঙ্গের জন্য দূরদূরান্তরে গমন করতে হয়। বাড়িতে বসে আমরা কিভাবে পার্থিব লিঙ্গের পূজা করলে সব রকমের অভীষ্ট লাভ করা যায়। পার্থিব লিঙ্গপূজা করা সর্ব দুঃখ বিনাশক। এই পূজা করতে গেলে প্রথমে নদী, পুকুর, বা কূপের মধ্যে থেকে মাটি সংগ্রহ করতে হবে। তারপর সেই মাটিকে ভাল করে কাঁকড় শূন্য করতে হবে, সেই মৃত্তিকাতে ভাল করে গন্ধদ্রব্য মেলাতে হবে, দিতে হবে নানা সুগন্ধির সঙ্গে দুধ, ঘি, তারপর সেই মৃত্তিকা দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে ছোটো ছোটো শিবলিঙ্গ, কিংবা সেই মৃত্তিকা দিয়ে প্রস্তুত করতে শিবের মূর্তি। মূর্তি কেমন হবে? দেবতা শিব হবেন, চতুর্ভূজ, তিনি পদ্মাসনে আসীন। তাঁর হাতে থাকবে নানা অস্ত্রশস্ত্র। এইভাবে তৈরি হবে শিবের প্রতিমা, যে ব্রাহ্মণ সঠিকভাবে আচার পালন করবে, সে অবশ্যই শিবের প্রতিমা, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু ও দুর্গা পূজা করবে। বিস্তারে দ্বাদশ আঙ্গুল, দৈর্ঘ্যে পঁচিশ আঙুল, উর্দ্ধে পনেরো আঙুল কাঠের বা লোহার নির্মিত যে কোন পাত্রকে বলা হয় 'শিব'।

শিব পরিমাণ পাত্রের মধ্যে নৈবেদ্য সাজিয়ে শিবের মূর্তিতে পূজা সম্পন্ন করবে। শিবপূজার এই বিধি শিবপুরাণে বর্ণিত আছে। জ্যোতির্লিঙ্গ ও স্বয়ম্ভুলিঙ্গের পরিবর্তে সকলেই পার্থিব লিঙ্গের আরাধনা করতে পারে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নাগেশ্বর লিঙ্গ

দেবী পার্বতী সর্বদাই শিবের সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকেন। তিনি কেবল মহাদেবের সঙ্গে এক হয়ে থাকেন না, মহাদেব তাঁকে ব্যতীত অসম্পূর্ণ, সেই দেবী পার্বতীর দারুকা নামে এক ভক্ত রাক্ষসী ছিল। দারুকা নানা উপাচারে দেবী আরাধনা করতেন। দারুকার স্বামীর নাম ছিল দারুক। দারুকা যেমন বলদর্পী ছিল, তাঁর স্বামী দারুকও ছিলেন তেমনিই বলদর্পী। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কাউকেই তাঁরা ভয় পেতেন না।

পশ্চিম দিকে সাগরের তীরে দারুকের ষোড়শ যোজন জায়গা জুড়ে দারুকা রাজত্ব করতেন। এই বন ছিল সর্বসমৃদ্ধিপূর্ণ। দেবী পার্বতী দারুকা অসুরীকে বর দিয়েছিলেন, 'দারুকে, ভূমি, বৃক্ষরাজি সমস্ত উপকরণের সঙ্গে এই বন তোমার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করবে। তুমি যেখানে যেখানে যাবে, তোমার বনও সেখানে সেখানে গমন করবে। এই আশ্চর্য বন ও বিভূতির জন্য তোমার খ্যাতি দূর দূরান্তরে বিস্তৃত হয়ে যাবে।' দেবীর বরে বলীয়ান হয়ে বলদর্পী দারুকা যেখানে যেখানে যেত, সেখানে সেখানে বনও যেতে লাগল। দারুকা পার্বতীর বরে বলীয়ান হওয়ার ফলে দারুক হয়ে উঠল খুবই অত্যাচারী। সে বহু রাক্ষস নিয়ে যজ্ঞ ও ধর্ম ধ্বংস করতে লাগল। লোকেরা দারুকের নিপীড়নে অতিষ্ট হয়ে উঠল। তাঁরা ঔর্ব ঋষির কাছে গিয়ে বলল, 'হে মহর্ষি আপনি আমাদের রক্ষা করুন। নয়ত দুষ্ট রাক্ষস আমাদের মেরে ফেলবে। আপনি অতি তেজে দীপ্ত, আপনি তাঁকে বধ করতে পারবেন। আপনাকে দেখেই দানবেরা পলায়ন করে। সুতরাং আপনি আমাদের পালন করুন, রক্ষা করুন। আপনার মধ্যে শৈবতেজ অগ্নির মতো প্রজ্জ্বলিত, আর প্রিয় ব্যক্তির কাছে আপনি চন্দ্রস্বরূপ। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।'

নিপীড়িত মানুষের আবেদনে সাড়া দিল মুনির হৃদয়, তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের নিশ্চয়ই রক্ষা করব।' এই কথা বলে ঋষি অসুরদের অভিশাপ দিলেন, 'আজ থেকে যাঁরা ধর্ম ও যজ্ঞ ধ্বংস করবে, তাঁরা ভগবানের বরে বলীয়ান হলেও নিজেদের বল হারিয়ে ফেলবে। তাঁদের আর কোন ক্ষমতাই থাকবে না। যদি তাঁরা যজ্ঞ ধ্বংস করে তবে তাঁদের প্রাণনাশ হওয়ারও সম্ভবনা আছে। আমার বাক্য কখনই অন্যথা হবে না।' ঔর্ব রাক্ষসদের এই কথা বললে দেবগণ অসুরদের নিয়ে কোথায় যাই! তারপর ভাবলেন, মা ভবানীর বর আমার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বনভূমি গমন করে, সুতরাং আমি রাক্ষসদের নিরাপত্তার জন্য জলে গমন করি! তাহলে অসুরকুল নিরাপদে থাকতে পারবে। এই ভেবে দারুকা বনকে সঙ্গে করে

BanglaBook.org

চললেন সাগরে। দারুকার সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসকুল আনন্দে নাচতে নাচতে সমুদ্রে প্রবেশ করলেন। তাঁরা পরস্পর বলতে লাগলেন, আমাদের রাজ্ঞী ধন্যা, কৃতার্থ। ওই তো আমাদের মেরেই ফেলেছিলেন। আমাদের রাজ্ঞী আমাদের রক্ষা করেছেন।' দারুকা রাক্ষসী ভবানীর বলে সমস্ত বন সহ চললেন সাগরে, জলের মধ্যেখানে গিয়ে বনকে স্থাপন করলে চারিদিকে জল পরিবেষ্টিত বন দারুন শোভা পেতে লাগল। অসুরেরা মহাসুখে বাস করতে লাগল।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা আবার অত্যাচার শুরু করল। যে সব মানুষ বা দেবাতারা সাগরের মধ্যে দিয়ে যেত তাঁরা বনের কাছাকাছি এলেই অসুরেরা তাকে ধরে মেরে ফেলত। অত্যাচার বৃদ্ধি পেতেই লাগল, নৌকারোহী ব্যক্তিদের ধরে এনে কারাগারে ফেলে রাখত বা কখনও মেরে ফেলত। এইরকম স্থলের মতো জলেও অত্যাচার বৃদ্ধি পেল। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারলেন না।

একদিন রাক্ষসেরা নৌকা নিয়ে জলে ভ্রমণ করতে বের হল, সেদিন তাঁরা দেখল বহু বানুষ একসঙ্গে জলের চারিদিকে চলেছে। নৌকাশুদ্ধ অসুরেরা মানুষগুলিকে বন্দী করে ফেলল। বন্দী মানুষগুলিকে নিয়ে এল কারাগারে। যে মানুষগুলি বন্দী হল, তাঁদের মধ্যে এক বৈশ্য ছিল, যে বৈশ্য ছিলেন শিবের ভক্ত। এই শিবভক্ত কখনই শিবপূজা ছাড়া অন্নগ্রহণ করতেন না। বৈশ্য কারাগারে থেকে প্রত্যেককে শিবপূজা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করতেন। বৈশ্যের কাছে শিবমন্ত্র ও শিবপূজা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করে কারগারে সকলে শিবপূজা করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ পদ্মাসনে বসে শিবের ধ্যান করতেন, কেউ আবার মানসপূজার মাধ্যমে শিবকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করতেন। আর বৈশ্য মানসপূজার মাধ্যমেই কেবল নয়, তিনি পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করে মহাদেবকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করতে লাগলেন।। সমস্ত কারাগার, 'নয়ঃ শিবায়' ধ্বনীতে মুখরিত হয়ে উঠল। সুপ্রিয় নামে সেই বৈশ্য শিবপূজার মাধ্যমে মহাদেবকে তুষ্ট করতে সক্ষম হলেন। শিব তাঁর পূজার সময় উপস্থিত হয়ে স্বয়ং পূজা গ্রহণ করতে লাগলেন। কারাগার এক মন্দিরে পরিণত হল। এইভাবে দীর্ঘ ছয় মাস কেটে গেল। একদিন সুপ্রিয় বৈশ্যের সামনে স্বয়ং শঙ্করকে দেখে ফেললেন এক অসুর, তিনি রাক্ষসরাজ দারুককে জানালেন, 'স্বয়ং দেবতা সুপ্রিয় বৈশ্যের পূজা গ্রহণ করছেন। আমরা নিজের চোখে তা দেখেছি।' রাক্ষসরাজ সুপ্রিয়ের কাছে এসে বললে, 'বৈশ্য তুমি সত্য করে বল, আজ তুমি কার ধ্যান করছ? বৈশ্য সুপ্রিয় তখন গম্ভীরভাবে বললেন, 'রাক্ষস রাজ, তুমি তো জান আমি কার পূজা করছি। আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন?' বৈশ্যের উত্তরে রাক্ষস খুবই রেগে গেল, চীৎকার করে অনুচরদের বলে উঠল, 'তোমরা একে আর এর সহচরদের হত্যা কর।' দারুক

BanglaBook.org

আদেশ করতেই অন্যান্য রাক্ষসেরা হই হই করতে করতে কারাগারে নিক্ষিপ্ত সমস্ত মানুষগুলিকে বধ করতে উদ্যত হল বৈশ্য তখন নিরূপায় হয়ে শিবের কাছে প্রর্থনা করতে লাগল, 'হে মহাদেব, হে শঙ্কর, আমাকে রক্ষা কর। আমি এই মানুষগুলিকে তোমার আরাধনা করতে শিখিয়েছি, আজ এরা যদি মৃত্যু কবলিত হয় তবে তোমরা ভক্তের মুখ রক্ষা হয় কি করে? তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে শিব, হে শিব, হে দেবসত্তম, তুমি আমার সর্বস্ব। তুমি আমাকে রক্ষা কর। বৈশ্য সুপ্রিয়ের কাতর প্রর্থনায় কারাগারের দেওয়াল ভেঙে আবির্ভূত হলেন মহাদেব। সেই কারাগার তখন চতুর্দ্বার যুক্ত মন্দিরে পরিণত হল। শিব হলেন জ্যোতির্ময়। তাঁর জ্যোতির্ময়রূপ নাগেশ্বর রূপে পূজিত হল!

বৈশ্য সুপ্রিয় শিবকে জাগ্রত করলেন বলে, মহাদেব তাঁকে 'পাশুপত অস্ত্র' প্রদান করলেন। সেই পাশুপত অস্ত্র দিয়ে সুপ্রিয় বৈশ্য সমস্ত অসুরদের বধ করলেন। এই বনে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি চতুর্বণের লোকদের যাতে যথাযথ ধর্মরক্ষিত হয় তা স্থির করে দিলেন। মহাদেব বললেন, এখানে অনেক ঋষিরা বাস করবেন, তারা কেউ কোনদিন তামস ভাবাপন্ন হবেন না। আমার কৃপা এদের উপর সর্বদা থাকবে।'

মহাদেব একথা বললে, দারুকা রাক্ষসী খুব দুঃখিতা হলেন। তিনি দেবীর আশ্রয়ে রয়েছেন, কিন্তু মহাদেব তাঁর কথা একবারও ভাবলেন না। দারুকা এবার ভগবতীর স্তব করতে লাগলেন। দেবী গৌরী দারুকার স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'দারুকা, তুমি আমার কাছে কি চাও? আমি একবার তো তোমায় তুষ্ট করেছি, কিন্তু তুমি তা ঠিকভাবে রক্ষা করতে সক্ষম হলে না। এখন তোমার জন্য আমি কি করতে পারি বল?' দারুকা বললেন, 'দেবী, আমার বংশ যাতে রক্ষা হয় তার জন্য অভয় প্রদান করুন। মহাদেব দেব ও মানবকুলকে আশীর্ব্বাদ করে বর দান করেছেন। তাঁরা এখন অজেয়, আমার স্বামীর প্রাণ গ্রহণে সকলেই উদ্যত। এই অবস্থায় শরণাগতকে রক্ষা করুন মাতা, আমি আপনার ভক্ত, আমাকে বিফল করনে না।' মহাদেব তাঁর শিষ্যের বিপক্ষে রায় দিয়েছেন শুনে গৌরীরবরণ আরক্ত হয়ে উঠল, তিনি বললেন, 'দারুকা, তোমার বংশ আমি নিশ্চয়ই রক্ষা করব। তোমায় আমি কথা দিচ্ছি।'

ভক্তকে আশ্বাস দিয়ে ঘরে ফিরে এলেন গৌরী, তারপর মহাদবের সঙ্গে বিস্তর কলহ করলেন! 'স্বামী হয়ে আপনি আমার ভক্তকে বংশহীন করার বরদান করলেন কি করে? মহাদেব গৌরীর কথায় খুবই হাসলেন, তিনি ভোলনাথ, এতকথা কি তাঁর মনে থাকে! গৌরী তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হচ্ছেন, কিন্তু তিনি জানেন না জগৎ কল্যাণের জন্যই তাঁর এই বরদান। জগতে তামসিকতার নাশ করতে চান তিনি। কিন্তু দেবী জানেন না। গৌরী তাঁর কথা মোটেই শুনলেন না। তখন শিব

BanglaBook.org

রেগে বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা হয়, তুমি তাই কর!' দেবী বললেন, 'হে স্বামী, আপনি যা বলেছেন যুগের শেষে সবই সেই রকম হবে। কিন্তু তার আগে রাক্ষসী দারুকা তামস সৃষ্টি করতে থাকুক। না হলে সার্থকভাবে প্রলয় হবে না। দারুকা এই বনে রাক্ষসীশক্তি রূপে জগৎ পালন করবে। অন্যান্য রাক্ষস পত্নীগণ রাক্ষসকুলের জন্মদান করবে, এই বন হবে তাঁদের আবাসস্থল। এই আমার অভিপ্রায়।' দেবীর কথা শুনে মহাদেব বুঝলেন, ভগবতীর কৃপালব্ধ দারুক কে বধ করা দেবকুলের অসাধ্য। তাই দেবীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, 'দেবী, তোমার ইচ্ছায় বনে দারুকা রাজ্ঞীরূপে রাজত্ব করবে। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে তুমি জানবে, যেখানে তুমি সেখানেই আমি বিরাজ করি। সুতরাং আমিও তোমার সঙ্গে এই বনে বিরাজ করব। আমি এখানে বিরাজ করব ভক্তপালনের জন্য। যদি কোন বর্ণাশ্রম আচার নিষ্ঠ মানব এই বনে প্রবেশ করে, তবে তাকে আমি অবশ্যই রক্ষা করব। গভীর অরণ্যের মধ্যে যে আমার মূর্তি দেখার সৌভাগ্য লাভ করবে, সে হবে চক্রবর্তীরাজ। শোন দেবী আমি তোমায় বলি, কলিযুগের শেষে রাজা মহাসেনের পুত্র বীরসেন আমার দর্শন লাভ করবেন। তিনিই এই রাক্ষসকুলের ধ্বংসসাধন করবেন।' হরপার্বতী পরস্পর এই কথা বলে সহাস্যে সেই বনে বিরাজ করতে লাগলেন। এই বিরাজস্থলে দেবাদিদেবের নাম হল, নাগেশ। তিনি নাগেশ্বর নামে বিখ্যাত হলেন।

মহাদেব ও দেবী ভগবতীকে রাক্ষসকুলের প্রতি কৃপাপূর্ণ দেখে ঋষিগণ বললেন, 'হে মহাদেব, আপনি তো আমাদের জন্য নাগেশ্বর লিঙ্গ রূপে বিরাজ করবেন কিন্তু বীরসেন আপনার দর্শন লাভ করাবেন কি করে? কি করে তিনি তামসিকতার বিনাশ ঘটিয়ে নতুন যুগের বার্তাবহ হবেন?' ঋষিদের কথা শুনে শিব শম্ভু বললেন, 'হে ঋষিগণ যথাসময়ে আমার বর ফলবতী হবে।'

বহুদিন পরে সুরম্য নিষাদ দেশে ক্ষত্রিয় বংশে মহাসেনের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করলেন বীরসেন। ছোট থেকেই তিনি ছিলেন শিবভক্ত। প্রতিদিন সকালে শিবপূজা ব্যতীত জলগ্রহণ করতেন না। বীরসেন, 'হে রাজা, তোমার প্রতি আমি পূর্ব থেকেই প্রীত হয়ে আছি। আজ আমি তোমায় একটি ধাতু নির্মিত মাছ প্রদান করব। তুমি এই মৎসী সাক্ষাৎ যোগমায়া। তুমি এই মৎসীটুকু নিয়ে সমুদ্রযাত্রা কর। সমুদ্রপথ ধরে তুমি সেই বনে পৌঁছাবে যেখানে দারুকা রাক্ষসী রাক্ষসকুলসহ বিরাজ করছে। তুমি সেই মাছের মধ্যে লুকিয়ে থেকে নাগেশ্বর লিঙ্গ রূপী আমাকে পূজা করবে। আমাকে সেই রূপে পূজা করে পাশুপত অস্ত্রলাভ করবে, যে অস্ত্রের মাধ্যমে রাক্ষসকুলকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। এই ভাবে ভক্তকুলের রক্ষার্থে মহাদেব জ্যোতির্লিঙ্গরূপে বিরাজ করতে থাকলেন।

BanglaBook.org

শিব মহিমা ও শৈবধর্ম

একসময়ে ভারতবর্ষে এত দৃঢ়ভাবে প্রথিত ছিল, যে ভাবনা একটি পৃথক ধর্মের মতো প্রভাব বিস্তার করেছিল। কি ছিল সেই শৈবধর্ম এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ, শৈবভাবনার প্রচারকালেই ভারতে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের পূজা জনপ্রিয় হয়েছিল বলে মনে হয়। শৈব তীর্থগুলিকে পৃথক মাত্রাদানের জন্যই এই ব্যবস্থা। শিবপুরাণে এই শৈবধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

কোন এক সময় ইন্দুশেখর শিব উমাকে কোলে ধারণ করে মন্দার পর্বতের দিব্যোদানে বসেছিলেন। সেই সময়ে শুভাবতী নামে পার্বতীর এক সখী উদ্যান থেকে সুন্দর ফুল আরোহন করে শিবের হাতে দিলেন। শিব সেই মনোজ্ঞ ফুলগুলি দিয়ে দেবীকে সাজিয়ে তুললেন, ফুলশয্যায় দেবী হলেন অপরূপা। তিনি নিজের আশ্রিত ও জগতের মঙ্গল কামনায় দেবতা শিবের কতই না সেবা করলে, তাঁর সেবায় তুষ্ট হলে মহেশ্বরী আরাধ্য স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকনাথ! এই যে বিরাট জগৎ, এই জগতে সব রকম জীবের বাস। কেউ উন্নত স্বভাবের কেউ বা মন্দবুদ্ধি। আপনি এই অল্পশক্তি বুদ্ধিহীন মানুষের বশীভূত কি করে হন! আপনার কৃপায় সকলেই আশ্রয় লাভ করে, এই কারণেই আমার মনে এই প্রশ্ন জেগেছে। আপনি আমার জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করুণ।

পার্বতীর এই প্রশ্ন শুনে শিব বললেন, 'হে প্রিয়ে, তুমি শোন, জেনে রাখ, আমি কেবলমাত্র শ্রদ্ধার বশ। আমি শ্রদ্ধা ছাড়া কি কর্ম, কি তপস্যা, কি জপ, কি সমাধি, কি জ্ঞান কিংবা অন্য কোন উপায়েই বশীভূত নই। সুতরাং আমাকে যে তুষ্ট করতে চায় তাদের শ্রদ্ধা লাভ করা একান্ত প্রয়োজন।' মহাদেবের এই কথা শুনে পার্বতী বললেন, 'হে দেবেশ, কি করলে মানবের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়? আপনার প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টির জন্য কোন শর্ত আছে কি? মহাদেব উত্তর দিলেন, 'যে মানব নিজের আশ্রম ধর্মকে সঠিকভাবে পালন করে সেই মানবই আমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়।' শিবপুরাণে উক্ত এই কথা শুনে মনে হয়, এই পুরান যখন লিখিত হয়েছিল, তখন সমাজে আশ্রমধর্ম পালনের প্রতি একটি অনিহা দেখা দিয়েছিল, পুরাণে শিবের মুখ দিয়ে তাই আবার আশ্রম ধর্ম পালনের কথা উচ্চারিত হল। কিন্তু তারপরই দেখা গেল ভিন্ন একটি স্রোতে বক্তব্যটি বইয়ে দেওয়া হয়েছে। আশ্রম ধর্ম পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রহ্মার সৃষ্ট আশ্রম ধর্মকে পৈতামহ ধর্মরূপে চিহ্নিত করা হয়, এই পৈতামহ ধর্ম এত কঠিন ও কষ্ট সাধ্য যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা পালন করা সম্ভব নয়, তবে কোন ধর্মকে

BanglaBook.org

আশ্রয় ধর্ম বলে চিহ্নিত করা যাবে? শিব বলেছেন, আমার প্রতিষ্ঠিত ধর্মই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যে এই ধর্ম পালন করবে সে শৈব বলে চিহ্নিত হবে। ফল নিরপেক্ষী হয়ে কায়মনবাক্যে, অনুরাগ সহকারে যে ক্রিয়া করে সেই আমার ধর্মে একান্ত নির্ভরশীল থাকে। যারা ফল আকাঙ্খা করে তাদের ভক্তি সকাম বলে আমার কাছে তা তত সুখকর হয় না। হে শিবে, যাঁরা শিব ভক্ত হবেন তাঁরা তিন বেলা স্নান করবেন, কপালে ভস্মধারণ করবেন, শিখাধারণ করবেন আবার উপবীত ধারণ করবেন। এছাড়াও রুদ্রাক্ষ ধারণ, প্রতি পর্বতে বিশেষ করে চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস, পঞ্চগব্যের মাধ্যমে লিঙ্গার্চনা শৈবদের অবশ্য কর্তব্য। এছাড়াও সকল জন্তুতে অহিংসা প্রকাশ, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ, আস্তিক্য বুদ্ধি, সকল সময় সকলের প্রতি দয়াপ্রকাশ শৈবধর্মের প্রতি অবশ্য কর্তব্য।' শৈবধর্ম রূপে স্বয়ং মহাদেব ভারতের সনাতন ঋষিদের ভাগ করা চারটি আশ্রমের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের কথা ব্যক্ত করছেন, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, শিব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভস্মসেবন, সর্বপ্রকার আসক্তি পরিত্যাগ, এই ব্রাহ্মণের ধর্ম। অধ্যাপন, যজন, যাজন, প্রতিগ্রহ, এই কয়টি ক্ষত্রিয়দের ধর্ম বলে জানবে। সকল বর্ণকে রক্ষার জন্য শত্রু বধ করা হল নৃপতির কর্তব্য। বৈশ্যগণ গোরক্ষণ, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম, এই কয়টিই ধর্ম। উদ্যান প্রস্তুত, ইতর বর্ণের শুশ্রুষা করা, এই তিনটি হল শূদ্রদের কর্ম। স্বামীর আদেশে আর সেবা করা স্ত্রীলোকের কর্ম। যে নারী স্বামী সেবা পরিত্যাগ করে অন্য ব্রত অনুষ্ঠানে তৎপরা হয় তবে সে নরকগামী হয়। ব্রত, দান, তপস্যা, শুচিতা, ভূমি শয়ন, ব্রহ্মচর্য, শান্তি অবলম্বন, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, একাদশী, বিশেষতঃ পৌর্ণমাসীতে অর্থাৎ পূর্ণিমায় যে বিধিমত উপবাস করে, আমার অর্চনা করে যে ঠিক ঠিক বৈধব্য ধর্ম পালন করে বলে জানবে।' শৈবপুরাণে উল্লিখিত স্বয়ং শিব মুখনিঃসৃত এই আশ্রম বর্ণ আমাদের চিরারিত আশ্রম বিভাজনের থেকে ভিন্ন। এই সব নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে আশ্রম ধর্ম।

শৈবধর্ম বলতে শিবপুরাণে যে ধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি প্রধানত, দক্ষিণ ভারতে বেশী পালিত হয়। বাংলায় দেখি শাক্ত ও শৈব ভাবনা মিলেমিশে গিয়েছে। শিবপুরাণে আমরা উপমুন্যু ঋষির কাহিনী পাই, যে কাহিনীর মধ্যে তপস্যাঘন শিবভাবনা অঙ্কিত হয়েছে। ঋষি ধৌম্যের অগ্রজ উপমন্যুকে তাঁর মাতা প্রতিদিন দুধ খেতে দিতেন। একবার উপমন্যু গেলেন তাঁর মামার বাড়ি। মাতুলালয়ে যখন তাঁকে দুধ দেওয়া হল, সেই দুধের স্বাদ পেয়ে তিনি বিস্মিত হলেন। মনে মনে ভাবলেন, বাড়িতে মা আমাকে যে দুধ খেতে দেন তা কেমন বিস্বাদ, এই দুধ যেন অমৃতের মতো। এরকম দুধ তো আমি কখনও পান করিনি। গৃহে ফিরেই উপমন্যু মাকে প্রশ্ন করলেন, 'মাতা আপনি যে দুগ্ধ প্রদান করেন তার

BanglaBook.org

স্বাদ মামাবাড়ির দুধের মত নয় কেন? আপনি নিশ্চয় আমাকে দুগ্ধের পরিবর্তে ভিন্ন কিছু প্রদান করে থাকেন।' পুত্রের কথা শুনে মা নীরব রইলেন। মায়ের নীরবতা ভিন্ন কিন্তু উপমন্যুকে শান্ত করতে পারল না। তিনি বারংবার 'দুধ দিন, আমাকে দুধ দিন' বলে কাঁদতে লাগলেন। পুত্রের আবদারে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হে পুত্র, তুমি কেবল 'আমাকে দুধ দাও বলে' বিরক্ত করছ, আমি তোমাকে কোথা থেকে দুধ এনে দেব। আমরা ভাল দুধ কোথা থেকে পাব? এই বনবাসে থেকে কোনরকমে দিন যাপন করি। কৃষির অভাবে আমরা দরিদ্র হয়েছি। আমি কি করে দুধ আনব। এতদিন তোমাকে জলে পিঠা গুলে মিথ্যা দুগ্ধ বলে দান করেছি। এখন তুমি অল্পমাত্র উত্তম দুগ্ধ খেয়ে আমাকে দুঃখ দান করেছ। একমাত্র মহাদেবের অনুগ্রহ ব্যতিত দুগ্ধ লাভ তোমার কপালে নেই। কৈলাসে নিজগণের দিয়ে পার্বতীকে কোলে ধারণ করে বিরাজ করছেন মহাদেব। তুমি তাঁর তপস্যা কর এবং তপস্যায় ফল লাভ করলে তোমার অভীষ্ট ভাল দুগ্ধ তুমি পাবে। শত্রুর পায়ে ভক্তিভাবে কিছু অর্পন করলে তিনি তা গ্রহণ করেন। শিবের প্রতি ভক্তিই সকল সম্পদের কারণ হয়, আমরা কখনও মহাদেবের আরাধনা করিনি বলেই আজ আমাদের এত দরিদ্র।' মায়ের কথা শুনে উপমন্যু বললেন, 'মা, যদি অম্বিকার সঙ্গে মহাদেব এখনও বিরাজ করেন তবে আর ভাবনার কিছু নেই, আমি নিশ্চয় তাঁর প্রসাদে দুগ্ধসমুদ্র লাভ করব।' পুত্রের এই কথা শুনে মা বললেন, 'সে কি পুত্র। তুমি কি বলছ? মহাদেব যদি থাকেন? তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করো না। তুমি যেন সকলেরই শ্রেষ্ঠ পরম কারণ মহাদেব নিশ্চয়ই আছেন। তিনিই এই সমুদয় জগতের সৃষ্টি করেছেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁর কিঙ্কর, তাঁর প্রসাদেই ঐশ্বর্যলাভ করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা সকলে সেই প্রভুর দাস।' মায়ের কথায় উপমন্যু আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'মা আপনি আমাকে কাম্যলাভের জন্য সঠিক দেবতার কথা বললেন, কিন্তু কি উপায়ে তাঁকে বন্দনা করব, কি মন্ত্রে তাঁকে ডাকব তা বলে দিন।' মাতা পুত্রকে বলে চলেন, 'দেখ পুত্র, অন্য সব দেবতার ভাবনা ত্যাগ করে একমাত্র মহাদেবের কথা চিন্তা করবে এবং তাঁকে 'নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রে আরাধনা করবে। পুত্র সপ্তকোটি মহামন্ত্র এই মন্ত্র থেকে উৎপন্ন হয় এবং এই মন্ত্রে বিলীন হয়ে যায়। মহাদেব যেমন কি নিকৃষ্ট, কি উৎকৃষ্ট সবপ্রকার জীবকেই রক্ষা করেন, ঠিক তেমনি এই মহামন্ত্রও সকল প্রকার সমস্যা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। এই মন্ত্র অন্য মন্ত্র থেকে প্রবল শক্তি সম্পন্ন। শাস্ত্রে বলে এই মন্ত্র জিহ্বার মধ্যে অবস্থিত হলে কোন বস্তুই দুর্লভ হয় না। শৈবদের রক্ষার জন্য যে সর্বোত্তম 'অঘোরাস্ত্র' তাও এই পঞ্চাক্ষর মহামন্ত্র থেকে সৃষ্ট। পুত্র তোমার পিতা আমাকে বিরজা হোম থেকে সংগৃহীত ভস্ম প্রদান করেছিলেন এই

BanglaBook.org

ভস্মের মহিমা এমন যে কোন উৎকট সমস্যা থেকে এর মাধ্যমে মুক্ত হওয়া যায়, আর দান করেছিলেন পঞ্চাক্ষর মহামন্ত্র। আমি তোমাকে এই দুই বস্তু প্রদান করলাম। তুমি শিব আরাধনার পথ বেছে নাও।' মায়ের কাছে মহামন্ত্র লাভ করলেন উপমন্যু, তারপর চললেন শিবের আরাধনা করতে। মাকে প্রণাম করে বললেন, 'মাতঃ, আপনার আদেশ অনুসারে আমি সাধনা সম্পন্ন করব।' মা গুরু হয়ে আরাধনার পথ দেখিয়েছেন, পুত্রকে তিনি আশীর্বাদ করলেন 'পুত্র, তোমার মঙ্গল হোক।' উপমন্যু কেবল দুধ চেয়েছিলেন মায়ের কাছে, মা তাঁর কাছে সাধনার পথকে উন্মুক্ত করে দিলেন।

মায়ের কাছে আশীর্ব্বাদ লাভ করে উপমন্যু তপস্যার জন্য হিমালয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে কেবলমাত্র আটটি ইঁট দিয়ে বাড়ি তৈরি করে মহাদেবের মৃন্ময় লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করলেন। এই মন্দিরে মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে বিরাজ করলে এই বলে তিনি দেবতাকে আহ্বান করলেন। এরপরে পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের সঙ্গে বনে উৎপন্ন ফল ও পুষ্পের দ্বারা মহাদেবের পূজা করতে লাগলেন। হিমালয়ের সেই অঞ্চলে ঋষি মরীচি কর্তৃক অভিশপ্ত কিছু অসুর ঋষিদের সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। এই অসুরেরা উপমন্যুকেও বিরক্ত করতে লাগল। বালক অসুরদের অত্যাচারে ভীত হয়ে চীৎকার করে নিরাশ্রয় বালকের মতো 'নমো শিবায়' মন্ত্র জপ করতে লাগল। মন্ত্র উচ্চারণের উচ্চধ্বনি এ পর্বত থেকে সে পর্বতে প্রতিধ্বনি করে ফিরতে লাগল। এই ধ্বনির প্রভাবে অসুরেরা ভয় না দেখিয়ে বালকে সেবা করতে লাগল। ক্রমে উপমন্যুর তপঃপ্রভাবে সমগ্র বিশ্ব সংসার তাপিত হয়ে উঠল। দেবতারা দেবলোকে বিষ্ণুকে প্রণাম করে এই তপস্যার বার্তা দান করলেন। বিষ্ণু দেবতাদের কথা শুনে নেমে এলেন হিমালয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শিব মহিমা

ভগবান বিষ্ণু মন্দার পর্বতে নেমে এসে বালক উপমন্যুকে দেখলেন। কিসের তপস্যা করছে এই বালক? ধ্যান যোগে জানতে পারলেন কেবল দুগ্ধ পানের কামনায় এই তপস্যা। বিষ্ণু মন্দার পর্বত ছেড়ে চললেন কৈলাসে, শিবের আলয়ে। মহাদেবকে বন্দনা করে বললেন, 'হে দেব দেব মহাদেব, ব্রাহ্মণ তনয় কেবল দুগ্ধের জন্য তপস্যার প্রভাবে চারিদিক প্রদীপ্ত করে তুলেছে, আপনি তাড়াতাড়ি তাঁকে তুষ্ট করুন।' মহাদেব খেয়ালী দেবতা! বালককে বরদানের জন্য মনে মনে উন্মুখ ছিলেন, কিন্তু নিজের রূপ ঢেকে পৌঁছালেন বালকের কাছে। মহাদেব সাজলেন দেবরাজ ইন্দ্র, আর তাঁর বাহন হল শ্বেত হস্তী। মন্দার পর্বতে যেমন চন্দ্র শোভা পায়, ঠিক সেইরকমই সৌন্দর্য্য নিয়ে ধীর গতিতে চললেন মহাদেব।

উপমন্যুর আশ্রমে দেবরাজ ইন্দ্রের বেশে উপস্থিত হলে, উপমন্যু তাঁকে দেখে আসন ছেড়ে উঠলেন। অতিথিকে আহ্বান করে বললেন, 'ভগবান, ইন্দ্র যখন আমার আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে তখন আমার আশ্রম নিশ্চয়ই পবিত্র ও সুন্দর হয়ে উঠবে। আমি নিশ্চয়ই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করব। আসুন দেবরাজ, আমার আশ্রমে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।'

দেবরাজ রূপী মহাদেব তখন বালক উপমন্যুকে বললেন, 'হে ধৌম্য মুনির অগ্রজ ভ্রাতা, আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।' উপমন্যু বললেন, ''আমি মহাদেবের চরণে ভক্তি প্রার্থনা করি।'' এই কথা বলে আর দেরী করেন না উপমন্যু, আবার শিবের ধ্যানে মগ্ন হন। মহাদেব এবার অন্যভাবে ভক্তকে পরীক্ষা করতে চললেন। তিনি উপমন্যুকে বললেন, 'এত কষ্ট করে তুমি সেই খেয়ালী, প্রায় নগ্ন, নীলকণ্ঠ শিবের তপস্যা করছ। তোমার মাথা কি খারাপ হয়েছে। সেই দেবতার জন্য এত কষ্ট করে কেউ তপস্যা করে নাকি? দেবরাজ রূপী ইন্দ্রের বাক্য শেষ হল না, উপমন্যু চরম ক্ষেদে বলে উঠলেন, 'হায়, হায়, শিব নিন্দা শুনলাম।'

কেবল দুঃখিত হলেন না উপমন্যু, দুধের কথা ভুলে নিয়ে ইন্দ্রবধের জন্য উদ্যত হল। হাতে তুলে নিল ধুনির প্রজ্জ্বলিত ভষ্ম। সেই ভষ্ম দিয়ে অঘোর অস্ত্র

BanglaBook.org

নির্মান করে ছুঁড়ে দিল দেবরাজের গায়ে, শিবনিন্দা যে শোনায় তাঁকে বধ করতে হবে, এই প্রতিজ্ঞা মনে। কেবল তাই নয়, শিবনিন্দা শুনে তীব্র ব্যাকুলতা দেখা দিল উপমন্যুর মনে, এ দেহ শিবের নিন্দা শুনেছে, এই দেহ আমি আর রাখব না।' যেই ভাবা অমনি আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণ করে নিজের উপরই প্রয়োগ করলেন উপমন্যু। এবার শিবের দয়া হল, শিব সহচর নন্দী উপমন্যুর তৈরী আগ্নেয়াস্ত্র আর অঘোরাস্ত্র, দুটিই নিবারণ করলেন। আর দেবাদিদেব মহাদেব স্বমূর্তিতে দেখা দিলেন উপমন্যুর কাছে।

উপমন্যুর সামনে দিব্য ত্রিশূল ধারী, পার্বতী সহ বৃষবাহন মহাদেব। চারিদিকে দেবতারা দুন্দুভি ধ্বনি করতে লাগলেন, আকাশ থেকে পুষ্প বৃষ্টি হতে শুরু করল। এই বালক কি অসাধ্য সাধন ই না করল। আর উপমন্যুর মনে যেন আনন্দের স্রোত বহমান। বালক আনত হয়ে মহাদেবকে প্রণাম করতে উদ্যত হলেন, মহাদেব, 'এস এস' বলে উপমন্যুর মস্তক আঘ্রাণ করে তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। তারপর উপমন্যুকে সমাদর করে পার্বতীর কোলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ তোমার আরেক পুত্র, একে কুমার কার্ত্তিকের পদ দান করবে।' মহাদেবের কথায় পার্বতী উপমন্যুকে কুমার পদে অভিযুক্ত করলেন। কিন্তু উপমন্যু যাঁর জন্য তপস্যা করেছিলেন তার কি হবে? সেই দুগ্ধ? মহাদেব তাঁর পুত্রকে কেবল দুগ্ধ নয়, দান করলেন ক্ষীর সমুদ্র। ধনের অধিপতি কুবেরও এলেন তাঁর কাছে, মহা সম্পদ ও শ্রী তে ভরিয়ে দিলেন উপমন্যুর জীবন।

কেবল সামান্য দুগ্ধের জন্য তপস্যা করে ঋষিপুত্র কুমার পদ লাভ করলেন, এর ফল কি হল? মহাদেব শৈব ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষাদান করলেন। দিলেন পাশুপত ব্রত, সেই ব্রতের জ্ঞান, ব্রতযোগের তত্ত্ব। এই ব্রত দান করে মহাদেব তা প্রচারের জন্য আদেশ করলেন, বালক উপমন্যু শৈবধর্মের প্রচারক হয়ে উঠলেন। উপমন্যুর কাহিনী থেকে আমাদের মনে হয়, শৈব ভাব ভারতে কেবল গড়ে ওঠেনি তা প্রচারক পদেও বহু ঋষি নিযুক্ত হয়েছিলেন। শিবপুরাণের কাহিনীকে অনুসরণ করলে দেখা যায় মহাদেবের কাছে জ্ঞান লাভ করে উপমন্যু যখন তা আয়ত্ত করলেন, তখন স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁর কাছ থেকে সেই জ্ঞান লাভ করতে আগ্রহী হয়েছেন।

উপমন্যু পাশুপত জ্ঞান লাভ করার পর একদিন কৃষ্ণ তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন উপমন্যু তাঁকে যথাযথ সম্মান দান করে আসন দান করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'হে ঋষিবর, বহুকাল আগে স্বয়ং পার্বতী শিবের কাছে পাশুপত বিদ্যা লাভ করেছিলেন। আপনি তপস্যা করে তা আবার আয়ত্ত করেছেন, এখন

BanglaBook.org

আমাকে এই ব্রত সম্বন্ধে কিছু বলুন। শিবের নাম পশুপতি কেন? পাশুপত ব্রতই বা কি? কারা ই বা পশু বলে কীর্ত্তিত হয়? কোন পাশে তাঁরা আবদ্ধ হয় তার বর্ণনা করুন।

কৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে উপমন্যু বললেন, 'জগতে যা সৃষ্ট জীব রয়েছে, তারাই শিবের পশু নামে চিহ্নিত হন। মহাদেব হলেন সমগ্র জগতের পশুদের প্রতি। তাই তিনি পশুপতি। পশুপতি রূপে তিনি সব জীবকে বিদ্যার পাশে বদ্ধ করেন, আবার তিনিই তাঁদের পাশ বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন। এই জগত তাঁর শাসনের অধীন, অগ্নি তাঁর শাসনে হব্য গ্রহণ করেন, জল তাঁরই আজ্ঞায় সকলের জীবন রক্ষা করেন। সেই বিশ্বম্ভরের শাসনে বিশ্বম্ভরা পৃথিবী বিশ্বকে ধারণ করেছেন, তাঁর শাসনেই সব দেবতা অলঙ্ঘনীয়; তাঁহারই শাসনে দেবেন্দ্র দেবতাদিগকে পালন, অসুরদের নিধন করেন, শিবের আজ্ঞায় ধর্মরাজ জীবিত অধার্মিককে রোগ দিয়ে ও মৃত অধার্মিককে নরক যন্ত্রণা দিয়ে কষ্ট দিচ্ছেন। ধনপতি কুবেরও সেই পরম পুরুষের আজ্ঞায় মানুষের পুণ্য ফল অনুসারে ধন দান করেছেন। সুতরাং দেবদেব মহাদেব সমস্ত জীব জগতকে অলক্ষ্যে পরিচালিত করেন বলে তিনিই সকলের কাম্য, তিনি পাশ দান করেন, তিনি পাশ মুক্ত করেনন, তিনি তাই সকলের গম্য, সকলের আরাধ্যদেবতা।'

উপমন্যু এই কথা বলে এক কাহিনীর অবতারণা করলেন, এই কাহিনী 'কেন উপনিষদে ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শিবপুরাণে সেই কাহিনীই মহেশ্বরের বন্দনায় কথিত হয়েছে। কাহিনীটি এই রকম, কোন এক সময় দেবতারা দৈত্যদের পরাজিত করে অহঙ্কারে মত্ত হয়েছিলেন, দেবকুলের আনন্দ উৎসবে দেব মহেশ্বর যক্ষের রূপ ধারণ করেন তাঁদের সামনে উপস্থিত হলেন। দেবতাদের আহ্বান করে বললেন, 'যে ভূতল স্থিত একটি তৃণ খণ্ডকে দগ্ধ করতে সক্ষম হবেন তিনিই ঠিকঠিক দৈত্য জয়ী রূপে বন্দিত হবেন।' যক্ষরূপী মহাদেব এই কথা বললে দেবতারা কেউ একটি তৃণকে সরাতে পারলেন না। এমনকি দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রও কুণ্ঠিত হয়ে গেল, বজ্রধর ইন্দ্র বজ্র ত্যাগ করলেন। দেবতারা তখন সেই তৃণ খণ্ডের উদ্দেশ্য শত শত অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন, চারিদিকে যেন দাবানল শুরু হল। দেবতারা কিন্তু কোন ভাবেই তৃণকে দগ্ধ করতে সক্ষম হলেন না। এত চেষ্টার পর তাঁদের মনে হল, এই যক্ষ পুরুষ কে? তাঁরা চীৎকার করে প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি?' সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ অন্তর্হিত হলেন তার পরিবর্তে গিরিজা নন্দিনী দেবী আকাশে আবির্ভূত হলেন। দেবতারা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, এই যক্ষ কে দেবী? দেবী বললেন, 'যাঁকে জানতে ইচ্ছা করেছ তিনি তোমাদের অগোচরে

BanglaBook.org

থাকেন। তিনিই তোমাদের সংসার সমুদ্রে চক্রাকারে ভ্রমণ করাচ্ছেন। তিনিই প্রথম এই বিশ্বের স্রষ্টা, আবার তিনিই সংহর্ত্তা। কোন নিয়মই তাঁর নিয়ামক নয়। তিনি মহাদেব, মহেশ্বর।' এই কথা বলে দেবী অন্তর্হিত হলেন, আর দেবতারা সেই দেবী বর্ণিত অদ্ভুত পুরুষের কথা ভাবতে ভাবতে যে যাঁর গৃহে ফিরে গেলেন।

কেউ উপনিষদের বর্ণিত কাহিনীতে দেবী স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপা। তিনি কে ব্রহ্ম—তার জ্ঞান দান করেছেন। শিবপুরাণের মধ্যেও দেবীর এই রূপের দেখা পাই, কেবল এখানে মহেশ্বর শিবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরাণ ও উপনিষদের এ এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শিব মহিমা শিব ও সতী ১

দক্ষকন্যা সতীর প্রসঙ্গ ব্যতীত শিবপ্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দক্ষকন্যার কাহিনী এক এক পুরাণে এক এক ভাবে চিত্রিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি পুরাণেই এই কাহিনীর উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। আজ আমরা শিবপুরাণের কাহিনীকে অনুসরণ করব। শিবপুরাণ অনুযায়ী বায়ু ঋষিদের এই কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। বায়ু বলেছিলেন, হে ঋষিগণ শ্রবণ করুন, 'কোন এক সময় নিখিল সুর অসুর, সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণ মহাদেবকে দেখবার জন্য হিমালয়ের শিখর দেশে উপস্থিত হলেন। মহাদেব ও দক্ষকন্যা সতী-উভয়েই দেবতাদের দর্শন দিয়েছিলেন। এই অবসরে দক্ষও অমরদেবতাদের সঙ্গে জামাতা মহাদেব ও কন্যা সতীকে দেখতে উপস্থিত হলেন। দেবী তখন মহাদেবের সঙ্গে বসেছিলেন। তিনি তখন দেবতাদের কাছে পরমাত্মাস্বরূপিনী। তাই কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করলেন না। এর ফলে অমর দেবতাদের সামনে প্রজাপতি দক্ষ কোন বিশেষ আদর পেলেন না। দক্ষ কিন্তু ভুল বুঝলেন, তিনি কন্যার কাছে বিশেষ সম্মান না পেয়ে মনে মনে খুবই দুঃখিত হয়ে উঠলেন। দুঃখ ক্রমেই ক্রোধে পরিণত হল। এই সময় দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করার সুযোগ পেলেন। সমস্ত দেবতারা সেই যজ্ঞে আমন্ত্রিত হলেন, একমাত্র কন্যা সতী আর জামাতা মহাদেব নিমন্ত্রণ পেলেন। কন্যার থেকেও জামাতার উপর বেশী আক্রোশসম্পন্ন হলেন দক্ষ, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল মহাদেবের জন্যই কন্যা তাঁকে ঠিকঠিক সম্মান দেখাতে পারেন নি। সুতরাং মহাদেব তাঁর যজ্ঞে ব্রাত্য হয়েই থাকলেন।

রুদ্রাণী নারদের মুখে পিতৃগৃহে এই যজ্ঞের বার্তা শুনতে পেলেন। তিনি রুদ্রের কাছে অনুমতি নিয়ে চললেন পিতৃগৃহে। মহাদেবের পত্নী তিনি, সাধারণ রমণীর মতো পিতৃগৃহে যেতে পারেন না। তিনি সুবর্ণ নির্মিত এক বিমানের উপর বসলেন, সেই বিমানের দীপ্তি তপ্ত কাঞ্চনের মতো, বিভিন্ন রত্ন সেই বিমানে খচিত হয়ে রয়েছি। বিমানে রয়েছে বিচিত্র রত্নাসন, মাথার উপরে মণিময় ছত্রধারণ করেছে। বিমানে অঙ্কিত আছে মহাবৃষভ চিহ্নযুক্ত মণিদণ্ড। মৃদঙ্গ, বীণা, বেণু, তাল, গান, বিশারদ বহু রমণী এই বিমানে আরোহণ করেছিলেন। তখন সেই চামরদ্বয় মধ্যগত দেবীবদন, পরস্পর হংসদ্বয়ের মধ্যে পদ্মের মতো সিংহাসন।

BanglaBook.org

সতীর সঙ্গে চললেন তাঁর দুই সখী সুমালিনী, তিনি দেবীর মাথায় ছত্র ধারণ করলেন। স্মিতমুখী সখী সুভাবতী অগ্রে বসে অক্ষক্রীড়ার মাধ্যমে দেবীর মনতুষ্টি করতে লাগলেন। সখী সুযশা দেবীর রত্নময় পাদুকা যুগল বুকের উপর রেখে তাঁর আনন্দ বিধান করতে লাগলেন। কাঞ্চণবর্ণা এক সহচরী দীপ্ত দর্পণ গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে পরমেশ্বরী নক্ষত্রমণ্ডলী মধ্যে শারদী শশিকলার মতো শোভা পেতে লাগলেন। আকাশে মধুর শব্দে দেব দুন্দুভি সব বেজে উঠল। সকল মুনিরা আনন্দে নাচতে লাগলেন। দেবী সতী চললেন পিতৃগৃহে।

এইভাবে দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে সতী দ্রুত বাপের বাড়িতে এসে পৌঁছালেন। তাঁকে দেখে দক্ষের রাগ আরোও বৃদ্ধি পেল। তিনি সতীকে অবহেলা করে অন্য কন্যাদের তুষ্ট করতে লাগলেন। তখন শশিমুখি দেবী অম্বিকা সভাস্থিত পিতা দক্ষকে আগ্রহভাবে বললেন, 'হে পিতা, ব্রহ্মা থেকে পিশাচ পর্যন্ত যে দেবের আজ্ঞাকারী, সেই দেবকে যথাবিধি পূজা না করে আপনি এই যজ্ঞ কিভাবে সম্পন্ন করছেন? ঠিক আছে, আমার স্বামী আপনার জামাতা। তার কথা নাই ভাবলেন। কিন্তু আমি তো আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা। আপনি আমায় ত্যাগ করে কনিষ্ঠাদের আদর করছেন কেন? আমার প্রতি এত অনাগ্রহ কেন?' দক্ষ কন্যার কথা শুনে উদ্ধত হয়ে বললেন, 'তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নীরা তোমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠা তাই তাদের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছি। এই কন্যাদের পতিরা সর্বদাই আমার প্রিয় ও আদরের। তোমার স্বামী ত্র্যম্বকের থেকে তারা অনেক বেশী গুণবান। শর্ব্ব তমোগুণযুক্ত এবং আমার শত্রু। তাঁকেই তুমি আশ্রয় করে রয়েছ। তাই তুমি আমার অবজ্ঞার পাত্র।'

পিতার এই কথা শুনে দেবী পিতা দক্ষকে বললেন, 'হে কৃষ্ণ। এ পর্য্যন্ত যাঁর কোনরূপ নিন্দা কেউ করেনি। সেই সাক্ষাৎ লোক মহেশ্বর আমার ভর্ত্তার প্রতি তুমি অকারণ দুষ্ট বাক্য প্রয়োগ করছ। বেদে বলা আছে, বিদ্যাচোর, গুরুদ্রোহী এবং দেবতা ও ঈশ্বরের নিন্দাকারী-এই তিন প্রকারের পাপী সর্বদাই দণ্ডার্হ। এই জন্য সেই দেব মহেশ্বর থেকে অচিরে তোমার মহান পাপ উৎপন্ন হবে। তুমি যেহেতু দেবদেব ত্র্যম্বকের পূজা করলে না। এ কারণেই তোমার এই দুষ্ট কুল নষ্ট হবে। এ স্থির জেনো।' এই বলে সতী দক্ষের দেওয়া দেহত্যাগ করে হিমালয়ে গমন করলেন। এই সময় হিমালয় পুত্রলাভের আকাঙ্খায় তপস্যা করেছিলেন। সতী তাঁর গৃহে পার্বতী রূপে আবির্ভূত হলেন।

সতী যখন দক্ষকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন, সেই সময়ে মন্ত্রেরা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে তিরোহিত হলেন। সুতরাং যজ্ঞ বিনষ্ট হল। ত্রিপুর মর্দন মহাদেব দক্ষালয় থেকে দেবীর দেহত্যাগ শুনে ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি দক্ষকে অভিশপ্ত করে

BanglaBook.org

বললেন, 'হে দক্ষ! যেহেতু তুমি আমার জন্য এই নিরাপরাধ সতীকে অপমানিত করেছ এবং অপরাপর দুহিতাদের সম্মানিত করেছ সেহেতু বৈবস্বত মন্বন্তরে তোমার জামাতারা ব্রহ্মযজ্ঞে সকলে একেবারে অযোনিজ হয়ে উৎপন্ন হবে এবং তুমিও চাক্ষুষ মনুর বংশে প্রাচীন বহির্ষের পৌত্র ও প্রচেতাদের পুত্র মনুষ্যরাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। হে দুর্মতে! সেই জন্মে আমি তোমার ধর্মযুক্ত কর্মে বারবার বিঘ্ন সৃষ্টি করব।'

মহাদেবের কাছে অভিশপ্ত হয়ে দক্ষ মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করলেন। এই জন্মে তিনি প্রচেতাদের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হল 'প্রাচেতস'। দক্ষের জামাতা ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ ও বৈবস্বত মনুর সময়ে দক্ষ ধর্মকার্যে প্রবৃত্ত হলে মহাদেব তাকে বারংবার বাধা দান করলেন।

দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে দক্ষকন্যা সতী পর্বত কন্যা পার্বতী হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। পার্বতীর সঙ্গে আবার বিবাহ হল মহাদেবেরই। শিব পার্বতী আনন্দে কৈলাসে বসবাস করতে লাগলেন। ঠিক এই সময় প্রাচেতস রূপী দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করার আয়োজন সম্পন্ন করতে লাগলেন। প্রাচেতস যজ্ঞ করবেন, কিন্তু যজ্ঞকার্য সম্পন্ন হবে কোথায়? তিনি ঋষি ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ নিষেবিত গঙ্গার উৎপত্তিভূমি হিমালয়ের শুভ পৃষ্ঠদেশে দক্ষ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই বিরাট যজ্ঞে দেবতা ও ঋষিগণ সকলেই সমবেত হওয়ার পর, সমগ্র আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরুদগণ, সোমগণ, পিতৃগণ, আজ্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অপরাপর মহর্ষি গণ বিষ্ণুর যজ্ঞের ভাগ নেওয়ার জন্য উপস্থিত হলেন। এই মহান আয়োজনে শেষে এলেন মহাঋষি দধিচী। তিনি প্রাচেতস রূপী দক্ষকে বলেন, 'যে মানুষ অপূজ্যদের পূজা করে এবং পূজ্যদের পূজা না করে, সে পাপকে গ্রহণ করে। যেখানে অসতের সম্মান ও সতের অবমাননা হয় সেখানে দৈবকৃত দারুণ দণ্ড পতিত হয়। হে, প্রাচেতস, এ জগতের প্রভু এবং পূজ্য পশুপতিকে কিসের জন্য পূজা করছ না? দধিচী মুনির এই প্রশ্নে প্রাচেতস উত্তর দিলেন, 'আমার জ্ঞান অনেক শূলধারী কপর্দ্দী আছেন। তাঁদেরকে ছাড়া অন্য কোন মহেশ্বরকে আমি জানি না। আমি রুদ্রের সেবা করি। মহেশ্বরের নয়! দধিচী মুনি অবাক হয়ে বললেন, 'হে রাজা, তুমি, তুমি রুদ্রদের আমন্ত্রণ করেছ। অথচ রুদ্রদের রাজা মহেশ্বরের নিমন্ত্রণ করনি? তিনিই তো সব যজ্ঞের পুরোধা পুরুষ?' প্রাচেতস বললেন, 'না, ঋষিবর, আমার যজ্ঞের অধিপতি অপ্রতিম বিষ্ণু, আমি বিধিমন্ত্রপূত সমস্ত আহবনীয় হবি সুবর্ণপাত্রে রক্ষা করে সেই প্রভুকেই শ্রেষ্ঠ ভাগ দান করব।!' দধিচী বললেন, 'হে দক্ষ, যেহেতু তুমি সর্বদেবের ঈশ্বর রুদ্রের আরাধনা করনি, তাই তোমার এই যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।' এই

BanglaBook.org

বলে মুনিসত্তম দধিচী আশ্রম ত্যাগ করলেন। দধিচীর আশ্রম ত্যাগে অবশ্যই অনিষ্ট হবে, এই কথা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েও দেবতারা প্রাচেতস রূপী দক্ষকে ত্যাগ করে গেলেন না। সকলেই, 'এরপর কি হবে?' এই আশঙ্কা করতে থাকলেন।

এদিকে দেবী পার্বতীর কানে দক্ষের যজ্ঞসংবাদ পৌঁছাল। তিনি দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করার জন্য মহাদেবকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। তখন মহাদেব দেবীকর্তৃক উত্তেজিত হয়ে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করার জন্য বীরভদ্র নামে প্রবল পরাক্রান্ত একটি গণধিপতির সৃষ্টি করলেন। এই বীরভদ্রের চেহারা বিরাট! শিবপুরাণে বর্ণিত হয়েছে, দিপ্তীশিল বীরভদ্রদের সহস্র চক্ষু, সহস্র হাত, সেই সহস্র হাতে সহস্র মুদ্গর, শূল, টঙ্ক, এবং গদা বর্তমান। মাথায় অর্ধচন্দ্রের শোভা, হাতে বজ্র ও চক্র। তাঁদের কেশ বিদ্যুতের মতো প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিল। এই বীরভদ্ররা মহাদেবের আজ্ঞায় দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করতে উদ্যত হলেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শিব ও সতী ২

শিবপুরাণে বীরভদ্রের চেহারার বর্ণনা আমরা পাই। দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করার জন্য যে বীরভদ্রের সৃষ্টি! সেই বীরভদ্রেরা যে অসাধারণ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের দেহের গঠনই যেন অন্যান্যদের থেকে আলাদা। দেবাদিদেবের সৃষ্ট এক বিচিত্র জীব তাঁরা। আমরা দেখি দেবী কালিকার কণ্ঠে মুন্ডমালা, কিন্তু পুরাণে বীরভদ্রের চেহারা অঙ্কনের সময়ে তাঁদের গলেও মুন্ডমালার কথা বলা হয়েছে। বীরভদ্রের জিহ্বা বিদ্যুতের মতো। ওষ্ঠ লম্ববান সাগর তুল্য। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। মহাতেজে দীপ্ত এই বীরভদ্র মহাদেবের মন থেকে সৃষ্টি হয়েই নিজের কর্মের সাক্ষী ও নিজের সঙ্গিনীরূপে নিজেরই ক্রোধ থেকে ভদ্রকালীর সৃষ্টি করলেন।

ভদ্রকালীর সঙ্গে বীরভদ্র উপস্থিত দেবী পার্বতী ও মহাদেবের কাছে। মহাদেব তাঁদের আশীর্ব্বাদ করে বললেন 'মঙ্গল হোক'। তারপর প্রণত হয়ে বীরভদ্র মহাদেবকে প্রশ্ন করলেন, 'হে মহাদেব! আমি কি কার্যের জন্য সৃষ্টি হয়েছি? এখন আমি আপনার কোন আদেশ পালন করব? ত্রিপুরহন্তা মহাদেব তৎক্ষণাৎ পার্বতীকে তুষ্ট করার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, 'হে বীরভদ্র দেবী ভদ্রকালীর সঙ্গে তুমি প্রাচেতস দক্ষের যজ্ঞ পন্ড কর। এই তোমার কার্য। আমি আর দেবী পার্বতী এই পর্বত আসনে বসে, এই রম্য আশ্রমে অবস্থান করে তোমার বিক্রম পরিদর্শন করব। হে গণেশ্বর, সুবর্ণশৃঙ্গ পর্বতে গঙ্গাদ্বারের কাছে কনখলে যে সব মেরুসদৃশ বৃক্ষ রয়েছে। সেই বৃক্ষের কাছে এই যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে। তুমি হঠাৎ সেই যজ্ঞের স্থানে প্রবেশ কর এবং যজ্ঞকে পন্ড কর।' মহাদেবের আদেশে বীরভদ্র প্রস্তুত হলে দেবী পার্বতী গণেশকে যেমনভাবে আদর করেন তেমন ভাবে বীরভদ্রের মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন, 'হে বৎস! মহাবল পরাক্রাম মহাভাগ রুদ্র! তুমি আমার দুঃখ দূর করবার জন্য উৎপন্ন হয়েছ। অতএব তুমি গণেশ্বরের সঙ্গে তার যজ্ঞভঙ্গ কর। হে বৎস ভদ্র! তুমি আমার আজ্ঞায় ভদ্রার সঙ্গে যজ্ঞভঙ্গ কর। হে বৎস ভদ্র! তুমি আমার আজ্ঞায় ভদ্রার সঙ্গে যজ্ঞলক্ষ্মীকে অলক্ষ্মী করে যজমানকে বধ কর।' বিচিত্রকর্মা বীরভদ্র শিব শিবার আজ্ঞা মালার মত গ্রহণ করলেন। তারপর দেবীর তুষ্টির জন্য নিজের দেহের রোম থেকে সৃষ্টি

BanglaBook.org

করলেন রোমজ নামে ভয়ানক সৈন্যের। তার দক্ষযজ্ঞ বিনাশের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। রোমজ সৈন্যের সঙ্গে বীরভদ্রের দেহ থেকে সৃষ্টি হলেন 'গণেশ্বর' গণ। এদের নাম হল ভদ্র। রোমজ আর ভদ্রদের নিয়ে বীরভদ্র ও ভদ্রকালী চললেন দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করতে। বীরভদ্র শিবের মতোই বাহন করলেন বৃষভকে আর ভদ্র ও রোমজ সৈন্যগণ সিংহকে বাহন করলেন। তাদেরকে দেখে মনে হল না তাঁরা যুদ্ধে চলেছেন। হাসতে, হাসতে, আনন্দে নৃত্য করতে করতে, উচ্চৈঃস্বরে গান করতে করতে তাঁরা পথ চলতে শুরু করলেন। এবং অনায়াসে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করলেন।

যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ করে বীরভদ্র ও তাঁর অনুচরেরা প্রথমেই দেবতা বেষ্টিত, নানাবর্ণে সজ্জিত যজ্ঞভূমিকে দর্শন করলেন। তখন যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞকর্ম পটু ঋষিগণ বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। চারিদিকে সুবর্ণনির্মিত পাত্র শোভাবর্দ্ধন করছিল। যজ্ঞস্থলে ঋষিদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সহস্র সহস্র দেবাঙ্গানারা, তাদের বীণাবেণুর সুরে চারিদিক ছিল আমোদিত। এর মধ্যে বীরভদ্রের দল বীভৎস 'কিলকিলা' শব্দে চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেললেন। ঋষিদের মন্ত্রের সুর ছিন্ন হল, দেবাঙ্গানাদের সুখস্বপ্ন কোন অজানা আশঙ্কায় খান খান হয়ে গেল। সকলেই সচকিত হয়ে উঠলেন। পবিত্র যজ্ঞভূমিতে এ কোন দুঃস্বপ্ন! সুমেরু পর্বত কি ভেঙে পড়ল? কিংবা পৃথিবী কম্পমান হল? গহন বনে যেমন গজেন্দ্রশব্দে ভীত মৃগীমৃগের বুকে আশ্রয়গ্রহণ করে, ঠিক তেমনভাবে দেবতারা পরস্পর পরস্পরের সন্নিকটে ঘন হয়ে দাঁড়ালেন। কেউ কেউ তখনই যজ্ঞস্থল ত্যাগ করলেন। যজ্ঞের অগ্নি ম্রিয়মান হল, বীরভদ্র দেবী ভদ্রাকে নিয়ে যজ্ঞের সম্মুখে উপস্থিত হলে প্রাচেতস দক্ষ মনে মনে ভীত হয়ে উঠলেওও মুখে দর্প প্রকাশ করে বললেন, 'কে হে তুমি, এখানে কি দেখতে এসেছ? মহাতেজা বীরভদ্র দুরাত্মা দক্ষের সেই কথা শুনে মেঘের মতো গম্ভীর স্বরে বললেন, 'রাজা, আমরা সব অমিততেজা মহাদেবের অনুচর, আমরা মহাদেবের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে এসেছি। আমাদের সেই যজ্ঞভাগ প্রদান কর। যদি এই যজ্ঞে আমাদের যজ্ঞভাগ না রেখে থাক তবে তা না রাখার উচিত কারণ নির্দ্দেশ কর। তুমি যদি উচিত কারণ দেখাতে না পার তবে তোমার সঙ্গে এবং দেবতাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ অনিবার্য।' বীরভদ্রের এই কথা শুনে দক্ষ তৎক্ষণাৎ মন্ত্রস্বরূপ দেবতাদের বললেন, 'হে মন্ত্রগণ! তোমরা এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা কর। আমরা এই শিবের অনুচরের কথার উত্তর দিতে অক্ষম!' দক্ষের কথা শুনে মন্ত্রগণ বললেন, 'হে দেবগণ! আমাদের কথা শোন, তোমাদের চিত্ত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, যেহেতু তোমরা যজ্ঞের প্রথমভাগ মহেশ্বরের অর্চনা করছ না। তোমরা অবশ্যই এই যজ্ঞভাগ প্রদান কর।' মন্ত্রগণ এই কথা বললেও দক্ষ ও অন্যান্য দেবতাগণ তাদের কথা শুনলেন না। তাঁরা বীরাভদ্রকেও

BanglaBook.org

যজ্ঞের ভাগ প্রদান করলেন না। মন্ত্রগণ তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে দেখে যজ্ঞস্থল ত্যাগ করে সনাতন ব্রহ্মালোকে গমন করলেন। এইবার বীরভদ্র উচ্চৈঃকণ্ঠে দক্ষকে বলে উঠলেন, 'তোমরা নিজেদের গর্বে গর্বিত হয়ে মন্ত্রগণের কথা পালন করলে না! হে দেবগণ! এই যজ্ঞে তোমরা আমাদের এইভাবে অসম্মানিত করলে? আজ আমরা তোমাদের এমন শিক্ষাদান করব যা চিরকালের জন্য তোমাদের মনে থাকবে তোমাদের সমস্ত অহঙ্কার আজ চূর্ণ করব।' এই বলে বীরভদ্র যজ্ঞস্থল ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। প্রথমে নিজের নয়নাগ্নি দিয়ে ধ্বংস করলেন সমস্ত যজ্ঞবাটী। তারপর নানা যজ্ঞপাত্র লন্ডভন্ড করলেন। কিছু ফেলে দেওয়া হল গঙ্গাগর্ভে। বীরভদ্রের সৈন্যদের হরণ কর 'প্রহার কর'' ''উৎপাটিত কর'' নানা শব্দে চারিদিক মুখর হয়ে উঠল।

বীরভদ্র সঞ্জাত সেনাদের এই তান্ডবে বিষ্ণু ইন্দ্রদেবতারা ভয়ে পলায়ন করতে লাগলেন দেবতাদের অদন্ডিত ও অরক্ষিত অবস্থায় পলায়ন করতে দেখে বীরভদ্র আক্রমণ করে বিনাশ করলেন দেবতাদের। তিনি সূর্য ও রুদ্রদের মাথায় বামপদ দিয়ে আঘাত করলেন। নখের অগ্রভাগ দিয়ে বেদমাতা এবং সরস্বতীর সুশোভননাসিকার অগ্রভাগ ছিন্ন করলেন। এরকমভাবে স্বাহাদেবীর দক্ষিণ নাসাপুট এবং বাম স্তনকে কর্তন করলেন। সব থেকে বেশী দন্ডিত হলেন পুষাদেব, বীরভদ্র তাঁর দন্তপংক্তী উৎপাটিত করলেন। সেই থেকে পুষাদেব অস্পষ্টবক্তা হলেন। আর ভগদেবের বিশাল নয়নদ্বয় দেহ থেকে ছিন্ন করে ভগদেবকে দৃষ্টিহীন করে দিলেন। সবথেকে শেষে আক্রমণ করলেন প্রাচেতস দক্ষকে। তাঁর যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য সুসজ্জিত দেহ থেকে সুন্দর মাথাটি কেটে নিলেন। এ সময়ে দক্ষপত্নীর কোন অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না বীরভদ্র। দেহ থেকে ছিন্ন মস্তকটি বীরভদ্র ভদ্রকালীকে উপহার দিলেন। ভদ্রকালী সেই মস্তক নিয়ে ধ্বংশপ্রাপ্ত যজ্ঞভূমিতে বল খেলতে লাগলেন। এইভাবে অরিষ্টনেমি সোম, ধর্ম প্রজাপতি, ভৃশাশ্ব ও কাশ্যপ-সকলকে বধ করলেন বীরভদ্র ও তাঁর অনুচরণগণ।

বীরভদ্রের এই পরাক্রম দেখে স্বয়ং যজ্ঞ এক হরিণের রূপ ধারণ করে পলায়ন করতে লাগলেন। বীরভদ্র তখন যজ্ঞভূমি ত্যাগ করে জ্যাযুক্ত ধনু নিয়ে হরিণ রূপী যজ্ঞের পিছন পিছন চললেন। বীরভদ্রের ধনুকের টঙ্কারের শব্দ ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকম্পিত করে তুলল। বীরভদ্র অর্দ্ধচন্দ্রের মতো বাণ ছুড়তে উদ্যত হলেন। মৃগরূপী যজ্ঞ সেই বাণের শব্দ শুনে, 'হায়, আমি হত হলাম!' এই বাক্যে বিলাপ করতে। বীরভদ্র সেই অর্দ্ধচন্দ্রের আকার বিশিষ্ট বাণে যজ্ঞপুরুষের মস্তক ছিন্ন হলেন।

সূর্যের মতো দীপ্তিবান যজ্ঞপুরুষকে হত হতে দেখে বিষ্ণুর মনে ভয়ানক ক্রোধের সৃষ্টি হল। তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। অবশেষে অবশিষ্ট হতশ্রী দেবতাদের নিয়ে দেবরাজকে সম্মুখে রেখে গড়ুরকে বাহন করে বিষ্ণু যুদ্ধের জন্য

BanglaBook.org

নির্গত হলেন। সিংহ যেমন শৃগাল পরিবৃত বাঘকে দেখে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন হয় না, ঠিক তেমনি দেবতা পরিবৃত বিষ্ণুকে দেখে বীরভদ্র অনুদ্বিগ্ন রইলেন। এইসময় আকাশে সুন্দর একটি রথ দেখা গেল। বীরভদ্র দেখলেন, স্বয়ং মহাদেব ত্রিপুরাসুর বধের সময় যে রথ ও সারথি ব্যবহার করেছিলেন, সেই রথ ও সেই সারথি আকাশপথে তারই কাছে উপস্থিত হচ্ছেন। ত্রিপুরাসুর বধের সময় মহাদেবের রথের সারথি ছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। সেই ব্রহ্মা রথ থেকে নেমে বীরভদ্রের কাছে এসে বসলেন, 'হে বীরভদ্র, তোমার পরিক্রম শিব ও শিবানী ঋষি রৈভ্যের আশ্রমে বসে পরিদর্শন করছেন। তিনি আপনাকে এই রথে আরোহণ করে যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন।' ব্রহ্মার কথা শুনে বীরভদ্র রথের উপর আরোহণ করলেন, এবং ভীষণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শিব ও সতী ৩

বীরভদ্র ও বিষ্ণুকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখে জগতের সমস্ত প্রাণী ভয়ে আকুল হল। এরপর কি হবে? বীরভদ্রকে স্বয়ং মহাদেব যখন যুদ্ধরথ প্রেরণ করেছেন তখন তাঁকে পরাজিত করা কঠিন। আর বিষ্ণু ও জগত পালক শক্তি তাকেই বা পরাজিত করবেন কি করে! কি ভয়ানক সংগ্রামের সূচনা হতে চলেছে! জগতের জীবকূল ভীত হলেও বীরভদ্র ছিলেন উদ্বেগহীন। মহাদেবের মতোই তেজে তাঁর সর্বাঙ্গ প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিল। অবশেষে শুরু হল ভীষণ যুদ্ধ। বীরভদ্র চন্দ্রের মতো শুভ্র শঙ্খ নিয়ে ফুৎকার দিলেন। জগতের সমস্ত সমুদ্র যেন ক্ষোভিত হয়ে উঠল। বীরভদ্র ও বিষ্ণুর যুদ্ধ দেখবার জন্য আকাশ জুড়ে যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধগণ সমবেত হল। বিষ্ণুকে যুদ্ধে অগ্রসর হতে দেখে বীরভদ্র তাঁর বিশাল ধনু তুলে নিলেন। সেই শরসংযোগের ফলে মহৎ শব্দের উৎপত্তি হল। বীরভদ্রের কাছে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন বিষ্ণু। জগৎ পালনের কাজ তাঁর উপর ন্যস্ত তিনি কিনা সামান্য শিবানুচরের হাতে বিদ্ধ হন। বিষ্ণুও তখন বারংবার বীরভদ্রকে বাণের মাধ্যমে বিদ্ধ করতে লাগলেন। এইভাবে তীব্র ও তুমুল যুদ্ধ সুরু হল। বীরভদ্রের আঘাতে বিষ্ণু অচেতন হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হলেন। কেবল তাই নয় বিষ্ণুর বাহন গরুরের পাখা ছিন্ন করলেন বীরভদ্র। এইভাবে তীব্র থেকে তীব্রতর হল যুদ্ধের পরিস্থিতি। বীরভদ্র নিজের রোমাবলী থেকে সৃষ্টি করলেন অযুত সংখ্যক সেনা। তীব্র যুদ্ধে জয়ী হলেন তিনি। দেবতারা হতভাগ্য, হতচ্ছিন্ন হয়ে পরাজিত হলেন। তখন বিষ্ণু বীরভদ্রকে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে গণেশ্বর, হে শিবাংসজাত মহা ধনুর্ধর, এখন দেবতার সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে, আমি আপনার ক্রোধ সংবরণ করুন। হে যজ্ঞসংহারকারিন, ত্রিশূলিন, রুদ্রভদ্র, রুদ্রদের অধীশ্বর, রুদ্রমূর্ত্তে শিব! আপনাকে নমস্কার! আপনি কালাগ্নিরুদ্রস্বরূপ এবং কাল ও কামের শরীর বিনাশক। আপনি দেবগণের এবং দুরাত্মা দক্ষের মস্তক ছেদন করেছেন আপনাকে নমস্কার।' বিষ্ণু এইস্তবে বীরভদ্রকে আপ্যায়িত করলে বীরভদ্র খুশী হলেন এবং দেবতাদের নিয়ে চললেন দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে। মহাদেব দেবতাদের এই অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে বললেন, 'হে দেবগণ তোমাদের কোন ভয় নেই। আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি।' মহাদেবের এই কথা

BanglaBook.org

শুনে দেবতাগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। মুখে তাঁদের এক কথা, 'হে প্রণতজনের আর্ত্তিভঞ্জন মহাদেব! আপনি জয়যুক্ত হন। এই অপরাধে আপনি ভিন্ন আর কে প্রসন্ন থাকে। আপনি প্রসন্ন হলে কে না সুখে থাকে। হে দেব আমাদের করুণা করুন। যুদ্ধে যে সব দেবতারা মৃত হয়েছে তাদের কে জীবনদান করুন।' দেবতাদের আকৃতিতে তুষ্ট হলেন মহাদেব। তিনি মৃত দেবতাদের পুনরায় জীবনদান করলেন। কেবল দক্ষের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাঁর ছিন্নমুন্ডের স্থলে বৃদ্ধ ছাগলের মুন্ডস্থাপন করলেন। সেই থেকে দক্ষ ছাগমুন্ডধারী হলেন। প্রাণলাভ করে দক্ষ ভয়চকিত দৃষ্টিতে দেবাদিদেবের গুণগান কীর্ত্তন করতে লাগলেন। মহাদেব তাঁকে 'মাভৈঃ' শব্দে আশ্বস্ত করলেন। চারিদিকে তখন খুশীর চিহ্ন। মহাদেব বীরভদ্রকে সন্তান স্নেহে কাছে বসালেন। দেবতাগণ স্তবমন্ত্রে সকলকে তুষ্ট করে যে যাঁর স্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। মহাদেব ও দেবী পার্বতীকে নিয়ে, বীরভদ্রকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন মন্দার পর্বতে। সেখানেই সুখে বাস করতে লাগলেন।

শিবপুরাণে উল্লিখিত দক্ষযজ্ঞের কাহিনীতে আমরা কিছুটা ভিন্নভাবনার দেখা পাই। প্রথমত, এই পুরাণে দক্ষকন্যা সতীর আত্মত্যাগের প্রতিক্রিয়ায় দক্ষযজ্ঞসাধিত হয়নি, এখানে দেবী পার্বতী পূর্বজন্মের অপমানের অবসান কল্পে এই দক্ষযজ্ঞের সৃষ্টি করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, পুরাণের বর্ণনায় শিবমাহাত্ম্যকে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে মহাদেবের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য অন্য দেবদেবীর মাহাত্ম্যকে লঘু করা হয়েছে। এই বর্ণনায় আমাদের চেনা মহাদেব কিছুটা যেন অপরিচিত। কিছুটা ক্ষমতা বা স্তাবকতায় তুষ্ট, তাঁর উদাসীন রূপটি সঠিকভাবে ফুটে উঠতে পারেনি। কিন্তু যে ব্যক্তিত্ব প্রাধান্য পেয়েছে সেই ব্যক্তিত্ব হল বীরভদ্র। নিপুণভাবে ও বিস্তারিতভাবে এই চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উপসংহার

'কুহেলী গেল, আকাশে আলো যে পরকাশি
ধুর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি!'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিবভাবনা আমাদের ইতিহাসকে, জীবনকে, নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে, কত আবেগ, কত কল্পনা এই ভাবনার সঙ্গে মিলে মিশে আছে তার তুলনা নেই। এই দেবতা কখনও হয়েছেন ধ্যান মগ্ন যোগী। কখনও হয়েছেন পত্নী প্রেমিক, স্ত্রীর বিয়োগে যিনি ভূমণ্ডলকে কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম। কখনও তিনি বেদ বেদান্তের পরম তত্ত্ব রূপে বিরাজিত আবার কখনও তিনি ভাঙ খেয়ে পড়ে থাকা, সংসারে উদাসীন শিব। দেব কল্পনা রূপ থেকে রূপান্তরে বয়ে চলে। কেবল তাই নয়, জৈন সাধনা, বৌদ্ধ চেতনা, নাথপন্থীদের সংস্কার সবই মিশেছে শিবের মধ্যে। আবার লোক সংস্কৃতির ধারায় গ্রামের বুড়োশিব, পঞ্চানন্দ, ধর্মঠাকুর, ভোলা মহেশ্বর, মহাকাল। সূর্যের সঙ্গেও তিনি বিভিন্ন রূপে মিলিত হয়েছেন, নীলের গাজনে, চৈত্রের চড়কে, পাঠ ঠাকুরের পুজোয়। বেদ উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ থেকে শুরু করে ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, লোকগাথায় সর্বত্র এই শিব। একাধারে তিনি গুরু আবার অন্যইদকে তিনিই হয়েছেন প্রেমিক। একনিষ্ঠ প্রেমকে পরিণত করেছেন গুরুশিষ্যের অপূর্ব সম্পর্কে। তিনি দান করছেন সুগভীর অধ্যাত্ম উপদেশ, সেই উপদেশ গ্রহণ করছেন স্বয়ং পার্বতী। শিব একাধারে তত্ত্ব, অন্যধারে তীর্থ। এই তীর্থভূমির কিছু অংশকে এই গ্রন্থে তুলে ধরা হল। তীর্থ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে তত্ত্ব আলোচনা। সব নিয়েই শিবমহিমা গাথা। শিব সম্বন্ধে গবেষকগণ তাঁকে উল্লেখ করেছেন, 'The Syncretic diety'বাস্তবিকই তিনি তাই। এই দেবভাবনার পদতলে সমস্ত শ্রেণি একত্রে নত হয়, দেবভাবনার এই বিশেষত্ব।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org